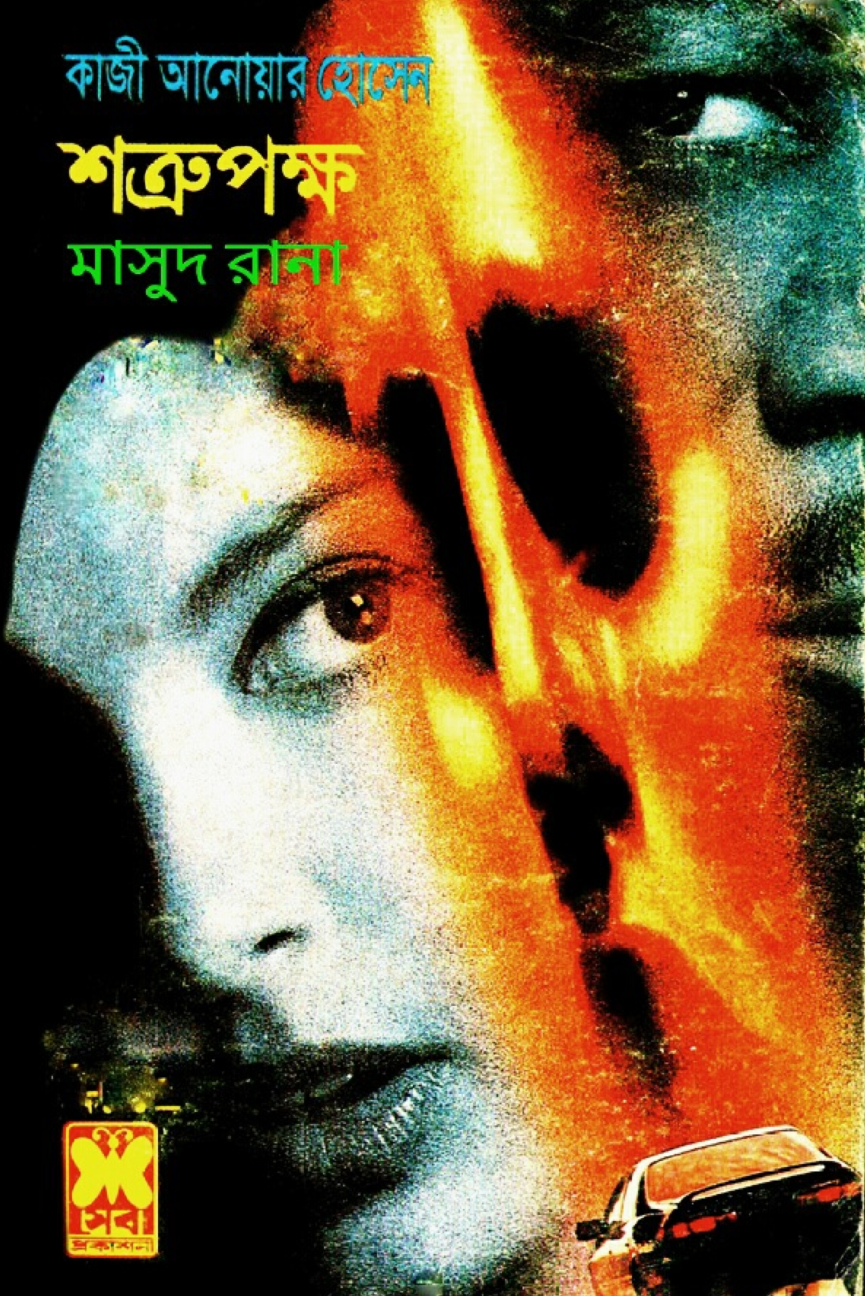

কাজী আনোয়ার হোসেন
শত্রুপক্ষ
মাসুদ রানা
সেবা
প্রকাশনী

কাজী আনোয়ার হোসেনের
# মাসুদ রানা

# শত্রুপক্ষ

দুরূহ, প্রায়-অসম্ভব এক কাজের দায়িত্ব চাপল মাসুদ রানার কাঁধে—লন্ডনের এক ব্যাঙ্ক থেকে লুঠ করে আনতে হবে একশো টন সৌদি সোনা। সমস্যা একটা নয়:
সেফটি ভল্টে নাহয় ঢোকা গেল, এত সোনা সরাবে কি করে সে ওখান থেকে? ওখান থেকে সরাতে পারলেও ইংল্যান্ড থেকে বের করবে কি করে?

মাসুদ রানা

# শত্রুপক্ষ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সাতচল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-7616-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০



প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৬
চতুর্থ প্রকাশ. ১৯৯৮

প্রচ্ছদ: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M—M)
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
SHOTRUPAKSHA

Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

# শত্রুপক্ষ

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৮৫

## এক

অক্টোবরের দুই তারিখ। বৃষ্টি হচ্ছে লন্ডনে।

ইস্ট এন্ড। রাস্তার দু'পাশে ক্লাব, রেস্তোরাঁ, হোটেল, বার আর ক্যাসিনো। বহুরঙা নিয়ন সাইন গায়ে লটকে আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিংগুলো দাঁড়িয়ে। প্রতিটি বিল্ডিঙের নিজস্ব পার্কিং ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সন্ধে লাগতে না লাগতে সবগুলো গ্যারেজ ভরে গেছে গাড়িতে। ইস্ট এন্ডে ঢোকার মুখেই ট্রাফিক পুলিসের একটা দল, গাড়ি নিয়ে কাউকে এলাকার ভেতর ঢুকতে দিচ্ছে না তারা। রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করা নিষেধ।

ট্রাফিক পুলিস হাত দেখালেও, সিলভার গ্রে রঙের থ্রী-হানড্রেড এস-এল মার্সিডিজটা থামল তো না-ই, স্পীডও কমাল না। আরও কাছে আসতে পুলিসের দলটা গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখতে পেল। শশব্যস্ত হয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল তারা। ইস্ট এন্ডে ঢুকে পড়ল মার্সিডিজ। চালকের পরনে সৌদি আরবের ঢোলা জাতীয়-পোশাক। তার নাম আবু সিনা আবদুল্লাহ খালেদ। মধ্য-প্রাচ্যের কোন শেখ, আমীর বা প্রিন্স নয়, একজন টেরোরিস্ট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর পশ্চিম ইউরোপের বড় শহরগুলোয় যেমন, লন্ডনেও তেমনি—আন্ডারগ্রাউন্ড জগৎটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে মাফিয়ারা। লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডে ধূমকেতুর মত আগমন ঘটেছে আবু সিনা আবদুল্লাহ খালেদের। রাতারাতি যেন জাদুর বলে নায়ক বনে গেছে সে। লম্বা একহারা চেহারা, সুদর্শন, মায়াভরা চোখ, দেখে মনে হয় নিরীহ এক রোমিও, কিংবা ধনীর আদুরে দুলাল—কিন্তু গায়ে যে দানবের শক্তি আছে তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া গেছে অল্প ক'দিনেই। যে সংগঠনের নাম শুনলে ইসরায়েলি কূটনীতিকদের বুক কাঁপে, সেই প্যালেস্টাইন লিবারেশন ব্রিগেড-এর একজন লীডার সে। এই সন্ত্রাসবাদী দলটি গোপনে কাজ করে, কাজের দায়িত্ব বা কৃতিত্ব দাবি করে বিবৃতি দেয় না। ফলে খুব কম লোকই এ দলের কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কে জানে। দুনিয়ার প্রায় সব বড় শহরে এই দল সম্পর্কে বিস্ময়কর সব গুজব ছড়িয়ে আছে। বিশাল কোন ধ্বংসযজ্ঞ বা রোমহর্ষক কোন পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটলে সবাই ধরে নেয় এটা ওদের কাজ।

কিন্তু শুধু বিস্ময়কর গুজব আর কুখ্যাতি সম্বল করে ইস্ট এন্ডের মত নরকে ঠাঁই পাওয়া সম্ভব নয়। এখানে চাই সত্যিকার দক্ষতা।

ইস্ট এন্ডে আবু সিনা পায়ের ধুলো ফেলার আগে থেকেই তার সম্পর্কে আশ্চর্য সব গুজব ছড়াতে শুরু করে। খালেদ আসছে, খালেদ আসছে, এই রকম একটা রব ওঠে চারদিকে। বেয়ারা, ওয়েটার, বারটেন্ডার আর ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছে

পাওয়া যেতে লাগল খালেদের ফটো। কোন কোন ফটোয় দেখা গেল ইসরায়েলি কূটনীতিকের গলায় ছুরি চালাচ্ছে খালেদ। কোনটায় দেখা গেল, ইসরায়েলের দূতাবাস লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুঁড়ছে সে, কাছেপিঠেই রয়েছে রাইফেলধারী পুলিস। প্রতিটি ছবিতেই দেখা গেল সৌদি আরবের সাদা জাতীয়-পোশাক পরে রয়েছে খালেদ। আন্ডারগ্রাউন্ডের মাস্তানরা চিন্তিত হয়ে উঠল। গুজব শোনা গেল, স্পেন থেকে আসছে খালেদ। তার নাকি ইচ্ছে, ইস্ট এন্ডে স্থায়ী আস্তানা গাড়বে। নতুন একটা দল গড়ার জন্যে অনেক লোকও নাকি লাগবে তার। শোনা গেল, আনআর্মড কমব্যাটে দুনিয়ার সেরা কয়েকজনের মধ্যে একজন নাকি খালেদ। রিভলভার আর রাইফেল, দুটোতেই সমান দক্ষ সে—গোটা মধ্যপ্রাচ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ। সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় পড়ল আন্ডারগ্রাউন্ডের লীডাররা। খালেদ না এসে পৌঁছুতেই ছোটখাট মাস্তান আর গুণ্ডারা তার ভক্ত হয়ে পড়ল। খালেদের ছবি বিক্রি হলো হাজার হাজার। গুজব আর ছবির উৎস খুঁজে বের করার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করল না লীডাররা, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে কিছুই জানা গেল না। খালেদের লন্ডনে পৌঁছুবার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই জটিল হয়ে উঠল পরিস্থিতি। অনেক মাস্তান আর ছোটখাট কিছু দলপতি প্রকাশ্যে আনুগত্য প্রকাশ করল, খালেদের দলে যোগ দেবে তারা। কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলল, এরই মধ্যে তারা নাকি খালেদের দলে যোগ দিয়েছে।

অতি-সাবধানী দু'একজন দলপতি ছুটি কাটানোর নাম করে ইংল্যান্ড ছেড়ে কিছুদিনের জন্যে বাইরে চলে গেল, দূর থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে তারা।

তারপর একদিন সত্যি সত্যি লন্ডনে পৌঁছুল আবদুল্লাহ খালেদ। ইস্ট এন্ডে পা দিয়েই ঘোষণা করল, দুটো রেস্তোরাঁ, দুটো জুয়ার আড্ডা, আর দুটো আবাসিক হোটেল কিনবে সে। প্রথম রাতেই ক্লিফটন হোটেলের জুয়ার আসরে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড হারল খালেদ, কিন্তু সকালবেলা মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে ওই একই টেবিল থেকে জিতল এক লাখ বিশ হাজার পাউন্ড। মাঝখানে, ভোর ছ'টায়, ওখানে একটা মারপিটের ঘটনা ঘটল।

পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড হারার পর ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে খালেদ বলল, 'আমাদের চারজনের মধ্যে দু'জন চোর। উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের অন্যায় স্বীকার করুক, তা না হলে আমি ওদেরকে মারব।'

খেলছিল চারজন। বড় দানের খেলা, দেখছিল প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক। এই রকম একটা গুরুতর অভিযোগ শুনে সবাই হতভম্ব। তিনজন জুয়াড়ীই প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, তাদেরকে অপমান করা হয়েছে।

ওই তিনজন তিনটে কুখ্যাত দলের প্রতিনিধি, তাদের বডিগার্ড আছে, আছে নেমক-খাওয়া লোকজন—আসরের প্রায় সব লোকই তাদের পক্ষে থাকবে। সবাই দেখল, খালেদ একা। ইস্ট এন্ডে প্রথম দিন এসেছে, অথচ সাথে এক-আধজন বডিগার্ডও নিয়ে আসেনি। গুজব শুনে তার কিছু ভক্ত তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের সাথে খালেদের পরিচয় নেই। বিপদের সময় খালেদের পক্ষ সমর্থন করবে না তারা। খালেদ যদি নিজের শক্তি প্রমাণ করতে পারে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তার আগে বোকার মত নিজেদের প্রাণের ওপর কেউ কোন ঝুঁকি নেবে

না।

তিনজনের মধ্যে একজন মেয়েমানুষ। বাকি দু'জনও মানুষ বটে, কিন্তু মানুষের চেয়ে গরিলার সাথেই তাদের চেহারার মিল বেশি। ঘরের ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা নেমে এল। দুই গরিলা, বিগ বেন আর স্মল ফিশ রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে খালেদের দিকে। দু'জনেই কুখ্যাত খুনী, এর চেয়েও নগণ্য কারণে মানুষ খুন করেছে তারা। মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে খালেদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মেয়েটাই প্রথম নড়ে উঠল। টেবিলের ওপর হাতব্যাগটা ছিল, সেটা কোলের কাছে টেনে এনে খুলল সে, ভেতরে তাকাল। সাথে সাথে তার চোখ জোড়া ছানাবড়া হয়ে উঠল। খালেদের দিকে তাকাল সে, একটা ঢোক গিলল, তারপর পাশে বসা স্মল ফিশের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার কানে কানে ফিসফিস করল। মেয়েটার কথা শেষ হতেই স্মল ফিশের হাত চলে গেল কোমরে গোঁজা হোলস্টারে। অবাক হয়ে ওদের আচরণ লক্ষ করছিল বিগ বেন, স্মল ফিশের দেখাদেখি সে-ও হাত ছোঁয়াল তার হোলস্টারে। 'আমার রিভলভার!' হুঙ্কার ছেড়েই সাত ফুট লম্বা আর তিন মণ ওজনের শরীর নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

'আমারটা?' তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল মেয়েটাও।

'আমি পকেটমার নই,' ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়েই বলল খালেদ। 'তোমাদের রিভলভারের খবর আমার জানা নেই। তবে, বেন আর ফিশের পকেটে দু'প্যাকেট তাস আছে, এটা জানি। ওগুলো বের করে টেবিলের ওপর রাখতে আদেশ দিচ্ছি আমি। মাফ চাওয়ার হুকুম করছি। তা না হলে, আগেই বলেছি, মারব। ভাল কথা, আমার পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডও আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

এরপর চোখের পলকে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা। বিদ্যুৎবেগে দুটো হাত বাড়িয়ে খালেদের জামার সামনেটা মুচড়ে ধরল বিগ বেন, হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে আস্ত তুলে আনল টেবিলের ওপর। খালেদের মাথার পিছনের চুল ধরে ঝুলে পড়ল মেয়েটা, আর স্মল ফিশ বেচারার মুখ লক্ষ্য করে দমাদম ঘুসি চালাল। খালেদ অসহায় অবস্থায় পড়ে মার খাচ্ছে, তার হাত দুটো শক্ত করে ধরে রেখেছে বিগ বেন।

ভিড়ের মধ্যে অস্বাভাবিক রোগা-পাতলা ছোটখাট এক লোককে দেখা গেল, প্রৌঢ়ই বলা চলে, চোখ দুটো শিশুর মত সরল, পরনে কালো স্যুট। একটা করে ঘুসি খাচ্ছে খালেদ, সেই সাথে যেন অসহ্য ব্যথায় চেহারা বদলে যাচ্ছে লোকটার। এক সময়, আর সহ্য করতে না পেরে, ভিড় ঠেলে এগোতে চেষ্টা করল সে। তার এই রোগা-পটকা, দুর্বল শরীর নিয়ে মারপিটে যোগ দেয়ার চিন্তা নেহাতই হাস্যকর। তার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুবেশ, সুদর্শন এক যুবক, সে-ই তাকে বাধা দিল।

দু'চার জন যাও বা খালেদের সমর্থক ছিল, তাকে এভাবে মার খেতে দেখে হতাশ হলো তারা। হঠাৎ একেবারে নেতিয়ে পড়ল খালেদ। টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ল সে। তার হাত দুটো এখনও ধরে আছে বিগ বেন, কিন্তু পা দুটো মুক্ত। একটা পা দিয়ে বেনের পেটে কষে একটা লাথি ঝাড়ল সে। শুয়ে থাকা একজন বেপরোয়া লোকের পা বা লাথি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। আত্মরক্ষার তাগিদেই সরে

নাগালের বাইরে চলে গেল ফিশ আর মেয়েটা। লাথি খেয়ে মেঝের ওপর নিতম্ব দিয়ে পড়ে গেছে বিগ বেন। ঢোলা, মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা সাদা আরবী পোশাক পরে আছে খালেদ, দ্রুত নড়াচড়ার জন্যে মস্ত একটা বাধা। কিন্তু শোয়া অবস্থা থেকে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াল, তারপর বিগ বেনের ওপর লাফ দিয়ে পড়া, এবং পরবর্তী নড়াচড়া কারও চোখেই পরিষ্কার ধরা পড়ল না—সবাই শুধু একটা সাদা ঝলক দেখতে পেল।

বেন চিৎ হয়ে পড়েছিল, খালেদ টেবিলের ওপর থেকে উড়ে এসে তার পেটের ওপর দু'পা দিয়ে নামল। কোঁৎ করে একটা আওয়াজ বেরুল বেনের গলা থেকে। তার পেটের ওপর নেমে, ওখানেই রয়ে গেল খালেদ, হাঁটু ভাঁজ করে গরিলার বুকে বসল। চারদিক থেকেই আক্রমণ আসতে পারে, বেশি সময় নেয়া যাবে না, কাজেই বেনের গলায় হাতের পাশ দিয়ে কারাতে কোপ মারল সে। সাথে সাথে জ্ঞান হারাল বেন।

পিছিয়ে গিয়ে হলঘরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে লোকজন।

'এবার!' গর্জে উঠল স্মল ফিশ। বেনের বুক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরল খালেদ। দেখল, হোলস্টারের রিভলভার হাতে নিয়েছে ফিশ।

মাঝখানে হাত দশেকের মত ব্যবধান, দু'জন তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে। ফিশও প্রায় সাত ফিট, ওজনে বেনের চেয়ে দশ পাউন্ড বেশি সে। তার তুলনায় খালেদ শুধু খুদে নয়, নিরস্ত্রও বটে।

কিন্তু চোখের পলকে আলখাল্লার ভেতর থেকে সরু, চকচকে একটা ছুরি বেরিয়ে এল খালেদের হাতে। রিভলভারের সামনে ছুরি, দর্শকরা হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। তাদের মধ্যে থেকে দু'জন লোক হেসে উঠল হো হো করে। এরা দু'জনেই কুৎসিত চেহারার নিগ্রো। সেই প্রৌঢ় রোগা-পটকা লোক আর সুদর্শন যুবক এদের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে।

'ইস্ট এন্ডে মাস্তানী করার শখ, অ্যাঁ, খালেদ?' বলল ফিশ। 'ইচ্ছে করলে চোখ বুজতে পারো, আমি তোমার ডান হাঁটু গুঁড়ো করে দিচ্ছি।'

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষায় থাকল সবাই। অপেক্ষার অবসান হতে মাত্র আধ সেকেন্ড লাগল। গুলি করল স্মল ফিশ। খালেদের ডান পায়ের হাঁটু লক্ষ্য করে।

তিন সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। পিছন ফিরে অচেতন বিগ বেনের সামনে এসে দাঁড়াল খালেদ। তার ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে বের করে আনল বাহান্নটা তাস। দর্শকদের তাসগুলো দেখিয়ে বলল, 'আমার কথা যে মিথ্যে নয়, এই দেখুন তার প্রমাণ।'

কদাকার চেহারার নিগ্রো দু'জন ঘরের মাঝখানে আসার জন্যে পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু সেই প্রৌঢ় লোকটা ওদের একজনের পিঠে পিস্তল ঠেকাল। ছোট, একটা লেডিস পিস্তল ওটা। সাথে সাথে কাঠের অচল পুতুল হয়ে গেল নিগ্রো। তার সঙ্গীরও একই অবস্থা হলো, সুদর্শন যুবক তার পিঠেও একটা রিভলভারের মাজল ঠেকিয়েছে।

স্মল ফিশের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে হাতের রিভলভারটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। ট্রিগার ঠিকই টিপেছিল, কিন্তু গুলি বের

হয়নি। এমনই বোকা বনে গেছে, খালেদ তার সামনে এসে দাঁড়াতেও হুঁশ ফিরল না। ঠাস করে একটা চড় কষল খালেদ। মাথা ঘুরে পড়ে গেল স্মল ফিশ। খালি রিভলভারটা খসে পড়ল হাত থেকে।

আঘাত খেয়ে খেপে উঠল দানবটা। ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত সিধে হলো সে, দু'হাত দিয়ে ধরেই উঁচু করল একটা মাঝারি আকারের ভারী টেবিল, খালেদের দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারল।

খালেদের হাতের ছুরি সাদা কাপড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। একপাশে সরে গিয়ে টেবিলটাকে এড়াবে, তার সময় পেল না সে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, মেঝেতে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। তার নাকের আধ হাত ওপর দিয়ে উড়ে গেল টেবিলটা। পরমুহূর্তে তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল ফিশ। শুধু হাঁটু ভাঁজ করে পা জোড়া উঁচু করল খালেদ। ডাইভ দিয়েছিল ফিশ, তার বুক পড়ল খালেদের পায়ের ওপর। পায়ে বুকের স্পর্শ পেতেই হাঁটু সোজা করল খালেদ। তার মাথার পিছনে মেঝেতে কপাল দিয়ে পড়ল ফিশ, শরীরের বাকি অংশ দড়াম করে আছাড় খেল শক্ত মেঝেতে।

দু'জনেই সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল। ফিরল পরস্পরের দিকে।

'এখনও বলছি, আমার টাকা আমাকে ফিরিয়ে দাও, অন্যায় স্বীকার করে মাফ চাও,' বলল খালেদ, 'তা না হলে কিন্তু সত্যি মারব।'

থো করে একদলা থুথু ছুঁড়ল ফিশ। 'তবে রে!' বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল খালেদ। আবার সেই দৃশ্যটা দেখার সুযোগ পেল উপস্থিত দর্শকরা। খালেদকে নয়, চোখে ধরা পড়ল শুধু সাদা একটা ঝলক। আর সেই সাথে দেখল, প্রতি মুহূর্তে দানবটার মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে। মাত্র পাঁচ সেকেন্ড কোন বাধা না পেয়ে মারল খালেদ, একেবারে ফাটিয়ে দিল ফিশের চেহারা। তার নাক গেল ভেঙে, ভুরুর কাছটা ফুলে উঠে ঢাকা পড়ে গেল একটা চোখ, অপর চোখ হয়ে উঠল রক্তের একটা ঝর্ণা। রক্ত আর থেঁতলানো মাংসের একটা পিণ্ডকে মারধর চলে না।

পিছিয়ে এসে উল্টে পড়া টেবিলটা খাড়া করে তাতে বসল খালেদ। একজন দু'জন করে এগিয়ে এল দর্শকরা। উল্টে পড়া চেয়ারগুলো টেনে নিয়ে এসে আবার জায়গা মত রাখা হলো। বেয়ারারা ছুটে এল হুইস্কি নিয়ে। মৃদু হেসে তাদেরকে বিদায় করে দিল খালেদ। বলল, 'আমি মুসলমান, ওসব খাই না।' ছুটে এল হোটেল ম্যানেজার। খালেদের হাত ধরে মাফ চাইল সে। দর্শকরাই ফিশের পকেট থেকে বের করে আনল এক প্যাকেট তাস। যাতে মার না খায়, মেয়েটাকে রাস্তায় বের করে দিয়ে এল হোটেল কর্মচারীরা। কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে খালেদ, আর মৃদু মৃদু হাসছে।

সেই প্রৌঢ় আর সুদর্শন যুবককে কিন্তু কোথাও দেখা গেল না। হঠাৎ করে তারা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

টেবিলের সমস্ত চিপস মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তুলে জড়ো করা হলো সব। হিসেব করে দেখা গেল, মোট দু'লাখ পাউন্ডের চিপস রয়েছে। খালেদের পুঁজি ছিল সত্তর হাজার, বাকি সব ওদের তিনজনের। পঞ্চাশ হাজার হারার পর খালেদের কাছে অবশিষ্ট ছিল বিশ হাজার। ওরা চুরি করায় হেরেছে খালেদ, কাজেই

ম্যানেজার ওকে ফিরিয়ে দিল ওর পঞ্চাশ হাজার। শুধু তাই নয়, ওদের তিনজনকে মাথাপিছু দশ হাজার পাউন্ড করে ফাইন করল ম্যানেজার, ফাইনের টাকা সবটাই পেল খালেদ। বেন আর ফিশকে হোটেল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারা আর কখনও এই হোটেলে জুয়া খেলতে বসতে পারবে না, তাদের অবশিষ্ট টাকাও হোটেল কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করল।

ভক্তরা ঘিরে আছে খালেদকে, তাদের সাথে ম্যানেজারও আছে। সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সবিনয়ে সবাইকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল খালেদ। বলল, 'আপনারা সবাই যদি আমার মেহমান হন, আমি কৃতার্থ বোধ করব।'

দুচারজন বাদে তার অনুরোধে সাড়া দিল সবাই। খালেদ বেয়ারাদের হুকুম করল, যে যা খেতে চায় তাকে তাই পরিবেশন করা হোক। তার উদারতা দেখে মুগ্ধ হলো সবাই। বিদায় নেবার সময় যা ঘটে গেছে তার জন্যে আরেকবার ক্ষমা চাইতে শুরু করেছে ম্যানেজার, তাকে থামিয়ে দিয়ে খালেদ বলল, 'দুঃখ এই যে খেলতে বসে খেলার মজাটা পেলাম না।'

'দেখি কি করতে পারি,' বলে চলে গেল ম্যানেজার।

এক ঘন্টা পর আন্ডারগ্রাউন্ডের তিন বাদশাকে সাথে নিয়ে আবার আসরে ঢুকল ম্যানেজার। পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর তারা জানাল, খানিক আগের ঘটনাটা সম্পর্কে তারা শুনেছে। আন্ডারগ্রাউন্ডের প্রতিনিধি হিসেবে তারা তিনজনই দুঃখ প্রকাশ করল। খালেদের সাথে পরিচিত হতে পেরে তারা গর্বিত, এ-কথা জানাতেও ভুলল না। বেন, ফিশ আর মেয়েটাকে যে এরাই পাঠিয়েছিল, শুধু সেই কথাটা চেপে গেল।

খালেদের সাথে খেলতে চাইল ওরা। আসলে এটা ওদের বন্ধুত্ব পাতাবার প্রস্তাব। সানন্দে রাজি হলো খালেদ।

পরবর্তী এক ঘন্টায় এক লাখ বিশ হাজার পাউন্ড জিতল খালেদ। খেলা শেষে খোশ-গল্প করার সময়, কথায় কথায় খালেদ জিজ্ঞেস করল, 'মাইকেল আমপালা সম্পর্কে স্পেনে থাকতেই শুনেছি। ইস্ট এন্ডে সে-ই নাকি সম্রাট। আশাকরি তার সাথে আমার পরিচয় হবে।'

খোশমেজাজী বাদশারা হঠাৎ করেই নিষ্প্রভ হয়ে গেল। অন্য প্রসঙ্গে কথা বলল, যেন খালেদের কথা শুনতেই পায়নি। খালেদ ভাবল, মাইকেল আমপালার সাথে এদের হয়তো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আছে। গল্পগুজব এরপর আর তেমন জমল না।

পরদিনও একটা মারপিটের ঘটনা ঘটল। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাল ছয়-সাতজনের একটা দল। সবাই যাতে এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে, তাই প্রস্তাব দিয়ে বসল খালেদ, 'দু'জন দু'জন করে এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি মজা।'

তিন দফা লড়তে হলো খালেদকে। কপালের মাঝখানটা গোল আলুর মত ফুলে উঠল, নাক ফেটে দরদর করে রক্ত বেরুল, মচকে গেল ডান হাতের দুটো আঙুলের হাড় আর বাঁ পায়ের গোড়ালি, পাঁজরের একটা হাড়ে মনে হয় চিড় ধরল, গলায় বসল পাঁচ আঙুলের গভীর দাগ। অন্য কেউ হলে হপ্তাখানেক হাসপাতালে কাটাতে হত, কিন্তু পরদিন আবার প্রায় সুস্থ অবস্থায় ইস্ট এন্ডে দেখা গেল খালেদকে। তার নতুন ভক্তরা যেচে পড়ে এসে জানিয়ে গেল, প্রতিপক্ষ ছয়জনের

মধ্যে তিনজনের এখনও জ্ঞানই ফেরেনি। একজন একটা পা চিরকালের জন্যে হারিয়েছে। আরেকজন খুইয়েছে একটা চোখ। শেষ লোকটার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই ধারণা করল, মারা গেছে, তার দলের লোকেরা পুলিসী ঝামেলা এড়াবার জন্যে গুম করে ফেলেছে লাশ। কিল খেয়ে কিল হজম করার ঘটনা ইস্ট এন্ডে অহরহই ঘটছে। সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থেই করা হয় এটা।

পরপর দু'দিন দুটো অ্যামবুশের ঘটনাও ঘটল। একটা ঘটনা সম্পর্কে আগেই খবর পেল খালেদ। সেই প্রৌঢ় রোগা-পাতলা লোকটা ইনফরমারের কাজ করল। ঘন্টাখানেক আগে এসে জানিয়ে গেল: অমুক জায়গার তমুক বিল্ডিঙে তেতলার পশ্চিম জানালার পাশে দুজন দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনার জন্যে রাইফেল হাতে নিয়ে। তিন তলায় উঠে স্নাইপার দু'জনকে নিরস্ত্র করল খালেদ, তারপর পিটিয়ে ছাতু বানিয়ে ফিরে এল। পরদিন একটা বার থেকে রাস্তায় বেরিয়েছে খালেদ, গাড়িতে উঠতে যাবে, এই সময় রাস্তার ওপারে দাঁড়ানো একটা গাড়ি থেকে কি যেন ছুটে এল। মাথা নিচু করে যদি আঘাত এড়াবার চেষ্টা করত খালেদ, নির্ঘাত মারা পড়ত সে। টেনিস বল আকৃতির একটা বস্তু, দেখেই গ্রেনেড বলে চিনতে পারল খালেদ। হাত উঁচু করে সেটা লুফে নিল সে। তারপর ছুঁড়ে দিল পাশের ফাঁকা একটা উঠানে। রাস্তার ওপারে, গাড়িটার দিকেও ছুঁড়তে পারত, কিন্তু গাড়ির আরোহীদের পরিচয় জানার ইচ্ছে ছিল ওর। আশাটা যদিও তার পূরণ হয়নি, পিছু নিয়েও তাদের আর ধরতে পারেনি খালেদ।

এরপর আর তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। ইতোমধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ডের প্রায় সব প্রভাবশালী লীডারের সাথে পরিচয় হয়েছে খালেদের। প্রকাশ্যে সবাই তারা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে। কিন্তু খালেদ খুব সাবধানী, প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকে সে।

হপ্তা শেষ হতে চলল স্পেন থেকে লন্ডনে এসেছে সে, অথচ আজও মাইকেল আমপালার সাথে তার পরিচয় হলো না। যার সাথেই আলাপ হয়েছে তাকেই আমপালার কথা জিজ্ঞেস করেছে সে, কিন্তু কেউই সঠিক কোন উত্তর দিতে পারেনি। দু'একজন শুধু আভাস দিয়েছে, আমপালাকে এখন লন্ডনে পাওয়া যাবে না। তবে তার খোঁজ পেতে হলে রোনাল্ড হার্ডিকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

খালেদ জেনেছে, রোনাল্ড আর জ্যাক হার্ডি দুই ভাই। ইস্ট এন্ডে সম্রাট মাফিয়া নেতা মাইকেল আমপালার সাথে এদের বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে। হার্ডিরা স্বাধীনভাবেই কাজ করে, তবে প্রতি কাজে খাজনা হিসেবে কিছু দিতে হয় মাইকেল আমপালাকে। অনেক চেষ্টা করেও আমপালার নিজের লোকদের সন্ধান পায়নি খালেদ, বা তার লোকেরা খালেদের কাছে নিজেদের পরিচয় গোপন করে গেছে। কারণটা পরিষ্কার না জানলেও, আন্দাজ করে নিয়েছে খালেদ। ওদের হয়তো ধারণা, স্পেন থেকে খালেদ এসেইছে আমপালাকে খুন করে ইস্ট এন্ডের সম্রাট হওয়ার জন্যে।

রোনাল্ড হার্ডির সাথে সে দেখা করতে চায়, এই খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে খালেদ। এক সূত্র থেকে তাকে জানানো হয়েছে, সুপারম্যান ক্লাবে আজ সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত রোনাল্ড হার্ডি এলেও আসতে পারে।

কিংসল্যান্ড রোড থেকে ডালসটন লেনে ঢুকল মার্সিডিজ। রেকর্ড প্লেয়ারটা চালু করে দিল, বেজে উঠল মাইকেল জ্যাকসনের একটা হিট গান। পাঁচ মিনিট পর লোয়ার ক্ল্যাপটন রোড ছাড়িয়ে এসে সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়ল গাড়ি। সুপারম্যান ক্লাবের সামনে থামল খালেদ। একজন ট্রাফিক পুলিস উত্তেজিত ভাবে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু নাম্বার প্লেট দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

ক্লাবের দরজা থেকে ধাপ বেয়ে নেমে এল একজন দারোয়ান। গাড়ির দরজা খুলে খালেদ বেরিয়ে এল, ওর মাথায় ছাতা ধরল লোকটা। ক্লাবে ঢুকে লোকটাকে এক পাউন্ড বকশিশ দিল খালেদ।

এর আগেও এই ক্লাবে এসেছে খালেদ। জানে, ইস্ট এন্ডের শুধু ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকগুলোই এখানে পোকার খেলতে আসে। এমন কোন দিন যায় না যেদিন এখানে মারপিট না হয়। সিভিল ড্রেস পরা পুলিস আর গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনও থাকে এখানে। মারামারি খুন পর্যন্ত না গড়ালে সাধারণত নাক গলায় না তারা। যাদের পয়সা খায় তারা যদি দু'একটা খুন করে বসে, আসামী করে ধরে নিয়ে যায় অন্য লোককে, যার পিছনে কোন সংগঠন নেই বা যার দল তাদেরকে মাসোহারা দেয় না। সে-কারণেই চালাক-চতুর চুনোপুঁটিরা এই ক্লাবের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে।

মেইন হলরুমে গান-বাজনার তালে তালে স্ট্রিপটিজ হচ্ছে। পাশের চারটে কামরায় অসংখ্য টেবিলে খেলা চলছে পোকার। প্রতিটি কামরায় নিজের চেহারা দেখিয়ে বার-এ চলে এল খালেদ। কাউন্টারের গায়ে কনুই রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও, কোল্ড ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। এই সময় বারে ঢুকল একজন লোক, সোজা এগিয়ে এল ওর দিকে।

স্যুট পরা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক। তার ট্রাউজারের পকেট দুটো বেঢপ ভাবে ফুলে আছে। খালেদের সামনে এসে দাঁড়াল সে, বলল, 'আপনার ইচ্ছে হলে একবার ম্যানেজারের কামরায় যেতে পারেন।'

কোন প্রশ্ন না করে গ্লাসে চুমুক দিল খালেদ। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে গেল যুবক। সময় নিয়ে গ্লাসটা শেষ করল সে, বিল মিটিয়ে দিয়ে বার থেকে বেরিয়ে এল। ক্লাবের ম্যানেজারের সাথে আগেই পরিচয় হয়েছে, বার থেকে বেরুতেই দেখা হলো তার সাথে। 'আপনি কি আমার কামরায় যাচ্ছেন, স্যার?' জানতে চাইল বিরাট বপু লোকটা। খালেদ শুধু মাথা ঝাঁকাল। লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ওকে। দরজা খুলে সরে দাঁড়াল একপাশে। ভেতরে একাই ঢুকল খালেদ, ঢুকে ভেতর থেকে ভিড়িয়ে দিল দরজা।

ম্যানেজারের রিভলভিং চেয়ারে একহারা চেহারার এক লোক বসে আছে। দাঁড়ালে এই লোক সাত ফিটের কম হবে না, আন্দাজ করল ও। সরু, লম্বাটে মুখ, কিন্তু হাড়গুলো উঁচু হয়ে থাকায় এখানে সেখানে খানা-খন্দ তৈরি হয়েছে। ডেস্কের ওপর পা তুলে দিয়ে বসেছিল সে, খালেদকে ঢুকতে দেখে পা নামিয়ে সিধে হয়ে বসল। কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠল না।

এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের সামনে থামল খালেদ। লোকটা তাকে বসতে বলল না। তার ঠোঁটের কোণে একটা জ্বলন্ত সিগারেট, কথা বলার সময় সেটা নড়তে লাগল,

'আমি রোনাল্ড হার্ডি। এখানে আড়িপাতা যন্ত্র নেই, তুমি মন খুলে কথা বলতে পারো।'

নিজের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না খালেদ। 'মাইকেল আমপালাকে খুঁজছি আমি।' আড়িপাতা যন্ত্র আছে, নিজের লোক পাঠিয়ে সে-সব অকেজো করিয়ে রেখেছে সে।

'মাইকেল ইংল্যান্ডে নেই,' বলল রোনাল্ড। 'কেন?'

'শুধু তাকেই বলা যাবে।'

'তাহলে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'কতদিন?' জানতে চাইল খালেদ।

'পনেরো দিন, একমাস,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল রোনাল্ড। 'কে বলতে পারে!'

'তাহলে চললাম,' বলল খালেদ। 'দু'এক দিনের মধ্যে আমপালার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে পারে এমন একজনকে দরকার আমার।' ঘুরে দাঁড়াল ও।

'এক মিনিট,' ব্যস্ত সুরে বলল রোনাল্ড।

ফিরল খালেদ।

'ইস্ট এন্ডে আমিই একমাত্র লোক যে তোমাকে আমপালার কাছে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে; কেন তুমি তার সাথে দেখা করতে চাইছ।'

'তাকে দিয়ে একটা কাজ করাব।'

'কাজের ধরন?' জানতে চাইল রোনাল্ড।

'কিডন্যাপিং,' বলল খালেদ। 'তারপর লুঠ।'

নিঃশব্দে হাসল রোনাল্ড, হলুদ রঙা কোদাল আকৃতির দাঁত বেরিয়ে পড়ল। 'কিডন্যাপিং? এ-কাজে তো ইস্ট এন্ডে আমরাই সবার সেরা।'

'আমরা?' রোনাল্ড ভাইদের সম্পর্কে বিস্তারিত অনেক তথ্যের সাথে এ-খবরটাও আগেই পেয়েছে খালেদ।

'আমি আর আমার ভাই জ্যাক, বিরাট একটা দল রয়েছে আমাদের।'

'কিন্তু দুটো কাজ আমি একই গ্রুপকে দিয়ে করাতে চাই,' বলল খালেদ।

'আমপালা গ্রুপের লোক না হলেও, আমপালার সাথে বাইরের দুনিয়ার যোগাযোগ বলতে আমাকেও বোঝায়। কোন কাজ যদি আমার মাপে বড় হয়, আমপালার সাহায্য নিই আমি। সেই রকম মাঝে মধ্যে আমপালাও আমার সাহায্য নিয়ে থাকে। সিগারেট?'

মাথা ঝাঁকাল খালেদ। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে টেবিলের কোণে উঠে বসল ও।

ডেস্কের গায়ে বসানো একটা বোতামে চাপ দিল রোনাল্ড।

ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে গেল।

'দু'একদিনের মধ্যে আমপালার সাথে কথা বলার দরকার হবে আমার,' কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল খালেদ।

'সম্ভব। কিন্তু লন্ডনে নয়।'

'কোথায়?'

'স্পেনে।'

'আমপালা স্পেনে?'

হাসল রোনাল্ড। 'তোমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে ওখানে গেছে সে।'

এটা একটা খবর। স্পেনে খোঁজ-খবর করলে আমপালা জানতে পারবে, আবু সিনা আবদুল্লাহ খালেদ লন্ডনে গেছে। এখান থেকে কেউ যদি তার ফটো আমপালাকে পাঠিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই পাঠিয়েছে, আর খালেদের দুষ্প্রাপ্য একটা ফটো যদি জোগাড় করতে পারে সে, মিলিয়ে দেখবে—কোন অমিল পাবে না। তবু, মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। 'আমার পরিচয় সম্পর্কে তার সন্দেহ কেন?'

'সন্দেহ হয়নি,' বলল রোনাল্ড। 'তবে, তোমার সম্পর্কে এত বেশি রটনা রটেছিল, একটু সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করে আমপালা। এই সতর্কতার জন্যেই আজ সে এতটা ওপরে উঠতে পেরেছে।' নতুন আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে হুইস্কির গ্লাসে শেষ চুমুক দিল সে। 'কাজের কথা হোক। কাকে?'

'লোকটা একজন ইসরায়েলি ইহুদি।'

'কোথায়?'

'তার আগে দরদাম হোক। পাঁচ হাজার পাউন্ড পাবে। পরের কাজটায় যদি সাহায্য চাই, তার পয়সা আলাদা।'

'কোত্থেকে কিডন্যাপ করতে হবে, ডেলিভারি দিতে হবে কোথায়?' জানতে চাইল রোনাল্ড।

'লন্ডন থেকে, লন্ডনেই,' বলল খালেদ। 'তাকে আমি জেরা করব। তারপর কিছুদিন তোমার কাছেই থাকবে সে। সব খরচ আমার।'

'উঁহুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রোনাল্ড। 'বিশ হাজার পাউন্ড কাজটার জন্যে, আর আটকে রাখার জন্যে সব খরচ ছাড়াও পাঁচ হাজার পাউন্ড ফি।'

'সব মিলিয়ে তোমাকে দেব দশ হাজার, তার বেশি এক শিলিংও না।'

খানিক চিন্তা করল রোনাল্ড। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। কিন্তু কাজের আগে পুরো টাকা।'

মাথা নাড়ল খালেদ। 'না। কাজের আগে অর্ধেক, বাকি টাকা কাজ শেষ হলে।'

আবার খানিক চিন্তা করল রোনাল্ড। উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেকের জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'রাজি।'

# দুই

মাত্র চল্লিশেই মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে ন্যাট ম্যানারের। ব্যায়ামপুষ্ট চওড়া ধড়, চ্যাপ্টা নিতম্ব, পা জোড়া বাঁকা, চোখে শকুনের দৃষ্টি। লন্ডনে ইসরায়েলি দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে সে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী ও

অস্ট্রেলিয়ায় দায়িত্ব পালন করেছে। লোকটা নিজে স্পাই না হলেও, এসপিওনাজ সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে। যেখানেই সে গেছে, শত্রুপক্ষের স্পাইদের ডাবল এজেন্টের টোপ গেলাবার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশেরও বেশ কয়েকজন এজেন্টকে দলে ভেড়াতে চেষ্টা করেছে লোকটা।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেষ করেছে ন্যাট ম্যানার, ষাটের দশকে তার বাবা ছিল ইসরায়েলি মন্ত্রীসভার একজন সদস্য। লন্ডনে চাকরি নিয়ে আসার পরপরই অ্যামব্যাসাডারের ডান হাত হয়ে উঠেছে লোকটা।

অক্টোবরের বারো তারিখে, রোনাল্ড হার্ডির সাথে খালেদের কথা হবার পরদিন সকালে, রোজকার অভ্যেস মত নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পাঁচশো গজ হেঁটে দূতাবাসে আসছে ম্যানার। উইলটন ক্রিসেন্ট থেকে আপার বেলগ্রেভ রোডের শেষ মাথায় পৌঁছুতে হবে তাকে। বাতাসে ধারাল একটা ঠাণ্ডা ভাব, পাতলা মেঘ ভেদ করে নিস্তেজ রোদ বেরিয়ে এসেছে। হাঁটাটা আজ উপভোগ করছে ম্যানার। চিরকেলে বাবু সে, আজ পরেছে ঢোলা, ভেলভেটের কালার লাগানো স্যাভিল রো ওভারকোট। তার হাতে একটা গুটানো ছাতা। মাথার কালো বোলার হ্যাটটা ইংরেজদের মত একটু বাঁকা করে পরেছে সে। তার দেহের প্রতি ইঙ্গিতে শহুরে ভদ্রলোকের ছাপ।

তুর্কী দূতাবাস ছাড়িয়ে এল ম্যানার, ঘাড় ফিরিয়ে ভবনের মাথায় পত পত উড়তে থাকা লাল পতাকার দিকে একবার তাকাল। চৌরাস্তায় পৌঁছে গেছে সে, হাতের ডান দিকে চ্যাপেল স্ট্রীট রেখে আপার বেলগ্রেভ রোডে চলে এল। স্পিরিচ্যুয়ালিস্ট এসোসিয়েশন অভ গ্রেট ব্রিটেন-এর হেডকোয়ার্টার ছাড়িয়ে এল সে, আর মাত্র কয়েকটা বিল্ডিং পরই ইসরায়েলি দূতাবাস। একটা মার্সিডিজ গাড়িকে পাশ কাটাল। ফুটপাথের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা। ড্রাইভিং সীটে একজন লোককে দেখল ম্যানার, কিন্তু চেহারা ঢাকা পড়ে আছে খবরের কাগজের আড়ালে।

ম্যানারকে রিয়ার ভিউ মিররে আগেই লক্ষ্য করেছে খালেদ, দেখামাত্র তাকে চিনতে পেরেছে ও। ওর গাড়িকে ছাড়িয়ে ম্যানার এগিয়ে যেতেই একটা সিগারেট ধরাল ও—কালো ক্যাডিলাক এলডোরাডোর উদ্দেশে এটা একটা সঙ্কেত।

দূতাবাসে পৌঁছবার আগেই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাডিলাক। দরজা খুলে ধোপদুরস্ত উর্দি পরা শোফার বেরিয়ে এল। ম্যানার তখনও হাত দশেক দূরে। সে দেখল, একজন ইংরেজ শোফার তার দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রম বিনয়ের সাথে বাউ করল।

'মাফ করবেন, স্যার—আপনি মি. ম্যানার, মি. ন্যাট ম্যানার?'

বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ, মার্জিত আচরণ—কিছু সন্দেহ না করেই দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যানার। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত দূরে দূতাবাসের গেট, সশস্ত্র ইংরেজ গার্ডকেও দেখা যাচ্ছে।

'হ্যাঁ, আমি ন্যাট ম্যানার।' ক্যাডিলাকের ভেতরে তাকাল সে, ব্যাক সীটের শেষ প্রান্ত ঘেঁষে সৌদি জাতীয়-পোশাক পরা একজন আরোহীকে বসে থাকতে দেখল। সাথে সাথে সৌদি ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট খায়ের আহকামের কথা মনে

পড়ে গেল তার। দিন পনেরো আগে আহকামকে সে ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করার লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছে। আহকাম বোধহয় টোপ গিলেছে, ভেবে একটু মুচকি হাসল সে।

'যদি কিছু মনে না করেন, স্যার, মি. খায়ের আহকাম আপনার সাথে দুটো কথা বলতে চান,' বলল শোফার।

কয়েকটা ব্যাপার মিলল, কয়েকটা মিলল না। আহকাম দামী গাড়ি ব্যবহার করে, ম্যানার জানে। তার শোফার ইংরেজ, সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু দূতাবাসের ওপর অনেকেই নজর রাখে, আহকামেরও জানার কথা সেটা, তবু দূতাবাসের সামনে গাড়ি থামিয়েছে কেন সে?

সাফল্যের আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে ম্যানার, তাই ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সাথে নিল না সে। ভাবল, সৌদিরা চিরকালই অসতর্ক। শোফারকে পাশ কাটিয়ে এগোল সে, ঝুঁকে পড়ে উঁকি দিল ক্যাডিলাকের ভেতর।

আরোহীর মাথা ঢাকা আবরণের নিচে একজন ইংরেজের মুখ দেখতে পেল ম্যানার। একই সাথে অনুভব করল তার ঠোঁটের ওপর, ঠিক নাকের নিচেই ঠাণ্ডা, শক্ত একটা ধাতব স্পর্শ। ওটা একটা পয়েন্ট চার পাঁচ ক্যালিবারের ব্রাউনিং পিস্তল, ট্রিগারে রয়েছে রোনাল্ড হার্ডির আঙুল। 'ভেতরে ঢোকো, আস্তে-ধীরে,' বলল সে। একজন আরব শেখ-এর ছদ্মবেশ উপভোগ করছে রোনাল্ড।

বুদ্ধিমান লোক ম্যানার, বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখল। তলপেটের ভেতর আলোড়ন ওঠায় বমি বমি ভাব হলো তার। কিন্তু হুকুম মানতে দেরি করল না।

পথিক বা ইউনিফর্ম পরা ব্রিটিশ গার্ড, দূতাবাসের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে, কারও চোখেই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকল না। উর্দি পরা একজন শোফার গাড়ির দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে, সুবেশ এক ভদ্রলোক সে-গাড়িতে উঠল—তার পোশাকই বলে দেয় এই রকম দামী একটা বাহনের মালিক হতে পারে সে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে উঠে বসল শোফার। স্টার্ট দেয়াই ছিল, মুহূর্তের মধ্যে দ্রুত ধাবমান গাড়ির মিছিলে শামিল হলো ক্যাডিলাক।

কাগজটা ভাজ করল খালেদ, মৃদু হেসে ফেলে দিল হাতের সিগারেট, তাকিয়ে আছে দূতাবাসের গেটের সামনে দাঁড়ানো গার্ডের দিকে। হাতের উল্টোপিঠ মুখের সামনে তুলে হাই তুলছে লোকটা। কাছেপিঠে দু'চার জন পথিক যারা ছিল তারাও কেউ থমকে দাঁড়ায়নি। খুশি হলো খালেদ, অপারেশন সাকসেসফুল। ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে মার্সিডিজ ছেড়ে দিল ও।

লন্ডন শহরের ভেতর দিয়ে পঁয়ত্রিশ মিনিট ছুটল ক্যাডিলাক, ট্রাফিক জ্যাম থাকায় থামতে হলো কয়েক জায়গায়, তারপর ইস্ট এন্ডের হ্যাকনি ডাউনে পৌঁছে গেল ওরা। পাশাপাশি অনেকগুলো পরিত্যক্ত বাঁড়ি, তারই একটা ভাঙা গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল ক্যাডিলাক। উঠানে রাজ্যের লোহা-লক্কড় আর ভাঙাচোরা কাঠের বাক্স, পাহাড় সমান উঁচু হয়ে আছে।

ধাক্কাটা খানিক সামলে নিয়েছে ন্যাট ম্যানার, খানিকটা সাহসও ফিরে পেয়েছে। পথে বেশ কয়েকবার কথা বলবার চেষ্টা করেছে, তার জানতে হবে লোক দুটো কি চায়, কোন্ টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের হয়ে কাজ করছে ওরা।

এটা যে একটা পলিটিক্যাল কিডন্যাপিং, সে-ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই, হোক এরা ইংরেজ। কিন্তু রোনাল্ড তার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয়নি।

গাড়িটা যেখানে থামল সেখান থেকে আশপাশের বাড়ি বা রাস্তা দেখা যায় না। এখনও আরবী পোশাক পরে আছে রোনাল্ড, রিভলভারটা তার হাতেই। এলাকার কেউ যদি ওদেরকে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেও থাকে, পুলিসের কাছে খবর যাবে না। এটা রোনাল্ডের নিজের এলাকা। আশপাশে বেশিরভাগই নিগ্রোরা থাকে, তাদেরকে কাজ-কর্ম জুগিয়ে এবং নগদ কড়ি সাহায্য দিয়ে বশ করে রেখেছে সে। এই বাড়িটা প্রায়ই সে ব্যবহার করে। তখন গভীর রাতে আর্তচিৎকার শোনা যায়।

অনেকগুলো ঘর বাড়িটায়, প্রতিটিতে তালা দেয়া। ভেতরে ঢুকে দুটো কামরার তালা খুলল জ্যাক হার্ডি। একটা ঘরে ঢোকানো হলো ম্যানারকে। ঘরের মাঝখানে একটা লোহার চেয়ার, পায়াগুলো মেঝের মধ্যে গাঁথা। চেয়ারটা দেখেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ম্যানার। বুঝতে পেরেছে, টরচার করা হবে তার ওপর।

'তোমাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দেব না তা কি আমি বলেছি?' ম্যানারের চেহারায় আপোসের ভাব, কণ্ঠস্বরে আত্মসমর্পণের সুর। 'বলো, কি জানতে চাও তোমরা?'

'শাট আপ, ইউ বাস্টার্ড!' মাথামোটা আর বদরাগী বলে কুখ্যাতি আছে জ্যাক হার্ডির, শুধু শুধু গাল দিল সে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাইলনের মোটা কর্ড নিয়ে এল।

হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে ম্যানারকে চেয়ারের ওপর ফেলে দিল রোনাল্ড। সাথে সাথে জ্যাক হার্ডি ম্যানারের পাঁজরে একটা লাথি কষল। দু'ভাই মিলে দ্রুত হাতে নাইলনের কর্ড দিয়ে চেয়ারের সাথে শক্ত করে বাঁধল তাকে। তার মুখে গুঁজে দেয়া হলো খানিকটা তুলো। কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। দরজা খোলা, ঘরে ম্যানার একা। তার মাথার ভেতর আগুন জ্বলছে। কোন ভাবেই এসবের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না সে। পলিটিক্যাল কিডন্যাপিং হলে কিডন্যাপাররা তাকে জেরা করে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাকে জিম্মি রেখে ইসরায়েল থেকে কোন বন্দীকে মুক্ত করতে চায় ওরা? মনে হয় না, ইংরেজ কোন বন্দী ইসরায়েলে নেই। তাছাড়া, ভাবল সে, একজনকে জিম্মি রেখে কাউকে মুক্ত করার ইচ্ছে থাকলে, অ্যামব্যাসাডারকে ছেড়ে তাকে কেন কিডন্যাপ করল ওরা? সাদামাঠা হাইজ্যাক, মুক্তিপণ দাবি করবে? তাও বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ ওর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোটা অঙ্কের টাকা নেই।

কেউ আসবে, এই অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠল ম্যানার। আরও আধ ঘন্টা পেরোল। তার মনে হলো, এভাবে একা থাকলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাগল হয়ে যাবে সে।

সময় বয়ে চলেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। পাশের ঘরে ওরা দু'জন আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। মনে হলো, গোটা বাড়িতে সে একা। জানে, বাঁধনমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়, তবু সময় কাটানোর জন্যে সে-চেষ্টা করল সে। লাভ হলো এইটুকু যে হাত আর পায়ের বাঁধনগুলো আরও শক্ত হলো, নাইলনের কর্ড কামড়ে

বসল মাংসে।

ঘরে তাকে দিয়ে যাবার পর দেড় ঘণ্টা কেটেছে, অথচ মনে হলো তিন-চার ঘণ্টা একা রয়েছে সে। রিস্টওয়াচটা চেয়ারের হাতলের সাথে ঠেকে আছে, কব্জি ঘুরিয়ে দেখার কোন উপায় নেই।

'তোমরা কোথায়?' চিৎকার করে জানতে ইচ্ছে হলো ম্যানারের। কিন্তু মুখের ভেতর তুলো।

কোন সাড়া নেই।

এভাবে আরও বিশ মিনিট কাটল। সত্যি সত্যি পাগল হবার জোগাড় হলো ম্যানারের। গোঙাতে শুরু করল সে। নাক দিয়ে ভোঁতা এক ধরনের আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল।

আট ঘণ্টা পর, সন্ধের দিকে, জ্ঞান হারাল ম্যানার। টানাটানি করাতে হাত-পায়ের বাঁধনের কাছ দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে। জ্ঞান হারাবার আগে ঝাঁক ঝাঁক মশার অস্তিত্ব অনুভব করেছিল সে। যখন জ্ঞান ফিরল, ঘরে তখন আলো জ্বলছে। প্রচণ্ড খিদে বোধ করল ম্যানার। সব কথা মনে পড়ে যেতে আবার হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করল। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল মুখের চেহারা। চোখ মেলল সে। দেখল, আরবী পোশাক পরা এক যুবক তার সামনের একটা হাতলহীন চেয়ারে বসে রয়েছে। লোকটা ইংরেজ নয়, এটুকু ধরতে পারল সে।

'হ্যালো, ম্যানার,' বলল যুবক। 'কেমন বোধ করছ?'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করল ম্যানার। হাত বাড়িয়ে তার মুখ থেকে তুলোটুকু বের করে নিল খালেদ। সাথে সাথে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল ম্যানার।

'ছি, কাঁদে না,' বলল খালেদ। 'লোকে দেখলে হাসবে যে!' বলে নিজেই হেসে উঠল সে।

'কে তুমি, কি চাও, এসব কি···?' আরও অনেক প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল ম্যানার, কিন্তু দম ফুরিয়ে যাওয়ায় থেমে গিয়ে হাঁপাতে শুরু করল সে।

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে,' মৃদু হেসে বলল খালেদ। হাত তুলে দুই চেয়ারের মাঝখানে একটা কালচে দাগ দেখাল ও। 'ওই দাগটা কিসের বলো তো?'

দাগটা দেখল ম্যানার। পাল্টা প্রশ্ন করল সে, 'কিসের?'

'শুকনো রক্তের,' বলল খালেদ। 'মাত্র দু'দিন আগে একজন লোককে খুন করা হয়েছে এখানে। কিভাবে, শুনতে চাও?'

প্রথমে ফ্যালফ্যাল করে খালেদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যানার, তারপর হঠাৎ ঘন ঘন কয়েকবার মাথা নাড়ল। 'আমি কথা বলব, কি জানতে চাও জিজ্ঞেস করো আমাকে। প্লীজ!'

'শুনে খুশি হলাম,' বলল খালেদ। 'কিন্তু, আমার ধারণা, মারধর না খেয়ে তুমি মুখ খুলবে না।'

'না, না,' আবার দ্রুত কয়েকবার মাথা নাড়ল ম্যানার। 'তুমি প্রশ্ন করো। কি চাও তোমরা?'

'সোনা,' বলল খালেদ।

প্রথমে বুঝতেই পারল না ম্যানার। চোখ পিট পিট করল সে। 'সোনা মানে?'

'ইসরায়েলি সোনা। আসলে সৌদি সোনা। লন্ডনে রাখা আছে। ঠিক কোথায়, ম্যানার?'

হঠাৎ করে সব পরিষ্কার বুঝতে পারল ম্যানার। ব্যাপারটা তার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকল। তার দেশের সবচেয়ে গোপনতম বিষয়গুলোর মধ্যে এই সোনা একটা। একজন আরব, তাও লন্ডনে বসে, সোনাটা কোথায় জানতে চাইছে। সৌদি সোনা, লন্ডনে আছে—এই তথ্যই বা পেল কোথায় ওরা? দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একটা ভাব দেখা গেল ম্যানারের চেহারায়। প্রাণ থাকতে এ-ব্যাপারে মুখ খুলবে না সে। তারপরই তার বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। এরা যে নিষ্ঠুর, সহজে হার মানার পাত্র নয়, পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে। মনটাকে শক্ত করল সে। ওরা তাকে মারবে, টরচার করবে—সব সহ্য করবে সে। অতিকষ্টে একটা ঢোক গিলল, বলল, 'আ-মি···আ-মি ঠিক তোমার কথা বুঝতে পারছি না।' গলাটা কেঁপে গেল, নিজের কানেও বিশ্বাস্য ঠেকল না।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল খালেদ। কয়েক পা এগিয়ে ম্যানারের সামনে থামল ও। তারপর প্রচণ্ড এক চড় কষাল তার কানে। বাতাসের চাপ খেয়ে কানের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করতে শুরু করল ম্যানারের। কিছু বুঝে ওঠার আগে আরেক কানে আরেকটা চড় খেল সে। এরপর কোন বিরতি ছাড়াই দু'কানে পাঁচ দু'গুণে দশটা চড়। কানের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটছে তার, সেই সাথে ব্যথায় নীল হয়ে উঠল চেহারা।

ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল খালেদ। কিছুক্ষণ কথা বলল না ও, কারণ বললেও এখন কিছু শুনতে পাবে না ম্যানার। খানিক পর জিজ্ঞেস করল, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, ম্যানার?'

মাথা ঝাঁকাচ্ছিল ম্যানার, খালেদের দিকে তাকাল।

'বোকামি করছ কেন?' জিজ্ঞেস করল খালেদ। 'মুখ খোলো, কথা দিচ্ছি তোমার ওপর কোন অত্যাচার হবে না।' একটু থেমে আবার বলল খালেদ, 'আমরা জানি, লন্ডনেই রাখা হয়েছে সোনাটা। কোথায়, ম্যানার?'

দম আটকে এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল ম্যানার। 'বিশ্বাস করো, আমি জানি না। প্লীজ, বিশ্বাস করো। তুমি যা জানো তাতে হয়তো কোন ভুল নেই, কিন্তু কেউ আমাকে এ-ব্যাপারে কিছু বলেনি, ফর গডস সেক।'

'তা কি করে হয়,' বলল খালেদ। 'দূতাবাসে অ্যামব্যাসাডারের পরই তোমার গুরুত্ব। তোমার বাপ একজন মন্ত্রী ছিল, তোমার দৃষ্টি নাকি আরও ওপরে—প্রাইমমিনিস্টারের পদটা। তুমি সামরিক অ্যাটাশে, ওই সোনা নাকি বিক্রি করে, টাকাটা সামরিক খাতে ব্যয় করা হবে।' এটা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল খালেদ। 'কাজেই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তুমি না জেনেই পারো না।'

'প্লীজ! সত্যি আমি কিছু জানি না!' করুণ আবেদনের সুরে বলল ম্যানার। 'তোমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ···'

'তাই কি?' রাগে লালচে হয়ে উঠল খালেদের চেহারা। 'সত্যি তুমি কিছু জানো না?'

'না, বিশ্বাস করো···'

'তোমাকে?' মাথা নাড়ল খালেদ। 'পরীক্ষা না করে নয়।' বলে পকেট থেকে একটা চুরুট বের করল ও। ধরাল সেটা। চুরুটের ডগায় আগুন যখন গন গনে হয়ে উঠল, ছুড়ে সেটা ম্যানারের গায়ের ওপর ফেলল। বুকের কাছে ওভারকোটে একটা কালো দাগ রেখে চুরুটটা পড়ল ম্যানারের দুই উরুর মাঝখানে, লোহার চেয়ারে। কিন্তু আগুনটা ঠেকে রইল ট্রাউজারের গায়ে। ট্রাউজার পুড়ছে। এক সেকেন্ড পর চিৎকার শুরু করল ম্যানার। তার আগেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে খালেদ।

আবার যখন ফিরল সে, দেখল, চোখমুখ বিকৃত করে গোঙাচ্ছে ম্যানার, তার দুই উরুর মাঝখানটা ভিজে, নিভে গেছে চুরুটটা, মেঝেতে খুদে একটা জলাশয় তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাতাস এখনও ভারী হয়ে রয়েছে মাংস পোড়া গন্ধে।

খালেদের হাতে ছোট একটা টেপ-রেকর্ডার দেখা গেল। 'এবার তোমাকে কথা বলতে হবে।'

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে ম্যানার, তারই ফাঁকে বিড় বিড় করে সে বলল, 'মেরেও ফেলতে পারো, আপত্তি নেই—তবু আমি মুখ খুলব না।'

তারমানে স্বীকার করছে, ও জানে! মনে মনে স্বস্তি বোধ করল আবদুল্লাহ খালেদ। ম্যানার যেভাবে অস্বীকার করছিল, ভয় হচ্ছিল সত্যি বুঝি সোনা সম্পর্কে কিছু জানে না ব্যাটা। মুচকি একটু হাসল ও। পকেট থেকে ট্রুথ সেরাম ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল আর হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বের করল ও, এগিয়ে গেল ম্যানারের দিকে। চোখ বুজে গোঙাচ্ছে লোকটা, কিছুই দেখতে পেল না। খালেদ জানে, এই ট্রুথ সেরাম সবার বেলায় সমান কাজ করে না, সেজন্যেই শেষ অস্ত্র হিসেবে হাতের কাছে রেখেছিল এটা, আর কোন উপায় না দেখলে ব্যবহার করবে বলে। ম্যানারের প্রতিজ্ঞা শোনার পর ওর মনে হয়েছে, ভয় বা হুমকি দেখিয়ে মারধর করে বা অত্যাচার চালিয়ে এ-লোকের কাছ থেকে কথা আদায় করা যাবে না।

অ্যাম্পুল ভেঙে সিরিঞ্জে সেরাম ভরল খালেদ। এক হাতে সিরিঞ্জ, আরেক হাতে একটা ধারাল ক্ষুর নিয়ে এগিয়ে গেল ও। স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলল ম্যানার। ক্ষুর দিয়ে খালেদ তার ওভারকোটের আস্তিন কাটছে দেখে শিউরে উঠল সে। 'কি··· কি···?'

সিরিঞ্জ ধরা হাতটা পিছনে লুকিয়ে রেখেছে খালেদ। ও চাইছে, ম্যানার একেবারে শেষ মুহূর্তে জানুক ট্রুথ সেরাম দেয়া হচ্ছে তাকে। তাহলে কথা না বলার ব্যাপারে নিজেকে সে অটোসাজেশন দেয়ার সুযোগ পাবে না।

ওভারকোট আর শার্টের আস্তিন কেটে বাহুর একটা অংশ বের করল খালেদ। সুঁই বেঁধার ব্যথায় কেঁপে উঠল ম্যানার।

পিছিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসল খালেদ। ম্যানারের চেহারায় আতঙ্কের ছাপ দেখে খুশি হলো ও। ব্যাপারটা ম্যানার টের পেয়েছে, কিন্তু বিস্ময় আর আতঙ্কের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে সময় নেবে সে, নিজেকে অটোসাজেশন দেয়ার সুযোগ পাবে না।

একটু পরই চোখ জোড়া ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠল ম্যানারের। নেতিয়ে পড়ল শরীর।

চেয়ারটা টেনে তার আরও সামনে নিয়ে গিয়ে বসল খালেদ। ঘরের দরজা আগেই বন্ধ করে দিয়েছে।

'সোনা সম্পর্কে জানতে চাই, ম্যানার,' নরম সুরে বলল খালেদ। 'আছে, তাই না?'

প্রথমে মাথা ঝাঁকাল ম্যানার, আধবোজা চোখে ঝাপসা দৃষ্টি। 'হ্যাঁ, সোনা আছে।'

'কোথায়, ম্যানার?' আরও নরম সুরে, যেন আদর করছে, জিজ্ঞেস করল খালেদ।

'বিশেষ একটা ভল্টে,' বিড়বিড় করে জড়ানো গলায় জবাব দিল ম্যানার। 'একটা ব্যাংকের নিচে।'

'কোন ব্যাংক? কোথায়?'

'তেল আবিব ক্রেডিট ব্যাংক। উইগমোর স্ট্রীটে।'

'উইগমোর স্ট্রীটের কত নম্বর বিল্ডিং?'

'মনে নেই।'

'কতটা সোনা রাখা হয়েছে ওখানে, ম্যানার?'

'একশো হাজার কিলো।'

দ্রুত হিসেব করল খালেদ। একশো হাজার কিলোতে একশো টন। সোনার চলতি বাজার দর সঠিক জানা নেই তার, আন্দাজ করল, অন্তত এক হাজার মিলিয়ন ডলার দাম হবে।

'সোনাটা ওখানে রাখা হয়েছে কেন?'

এবার সাথে সাথে জবাব এল না। তিন সেকেন্ড পর আবার প্রশ্নটা করল খালেদ। ধীরে ধীরে ম্যানার বলল, 'একটা টপ সিক্রেট প্রজেক্টের জন্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে।'

'টপ সিক্রেট প্রজেক্ট?' ভুরু কুঁচকে উঠল খালেদের। 'এ-সম্পর্কে কি জানো বলো।'

আবার কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল ম্যানার। বেশ কয়েকবার প্রশ্নটা রিপিট করতে হলো খালেদকে। তারপর যখন বলতে শুরু করল ম্যানার, সব গড়গড় করে বলে ফেলল। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল খালেদ, অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল তার।

একটা অ্যাটমিক উইপনস প্ল্যান্ট তৈরির কাজে ফাইন্যান্স করার জন্যে রাখা হয়েছে এই সোনা। প্ল্যান্টটা তৈরি হবে ইংল্যান্ডে, কিন্তু এটা একটা ইসরায়েলি প্ল্যান্ট। ইসরায়েলিরা ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের আণবিক অস্ত্র বানাতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সরকার ব্যাপারটা জানে, এতে তাদের অনুমতিও আছে, কিন্তু আনঅফিশিয়ালি। প্ল্যান্টের কাজ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। প্ল্যান্টটা হবে সারে-র একটা প্রাইভেট এস্টেটে।

ম্যানার থামার পরও অনেকক্ষণ নড়ল না খালেদ। উত্তেজনায় তার সারা শরীর ঝিম ঝিম করছে। আবার যখন ম্যানারের দিকে তাকাল সে, দেখল, সেরামের প্রভাবে আর ক্লান্তিতে আরও নেতিয়ে পড়েছে সে। কিন্তু আরও একটা কথা জানার আছে ওর।

ম্যানারের কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সোনাটা এল কোত্থেকে, ম্যানার?'

প্রশ্নটা কয়েকবার করতে হলো, তারপর বিড় বিড় করে জবাব দিল ম্যানার, 'সৌদি আরবের সোনা। আরব সাগর থেকে ওদের জাহাজ হাইজ্যাক করা হয়…ক্রু আর নাবিকদের মেরে ভাসিয়ে দেয়া হয় সাগরে…একশো হাজার কিলো সোনা পাঠিয়ে দেয়া হয় ইংল্যান্ডে…আগেই সব ব্যবস্থা করা ছিল…'

যা জানার জেনে নিয়েছে খালেদ, টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পাশের ঘরে ওরা দুই ভাই তাস খেলছিল। খালেদকে দেখে খেলা থামিয়ে মুখ তুলল তারা। রোনাল্ড হার্ডি জানতে চাইল, 'কি, আমাদের সাহায্য লাগবে নাকি?'

'না,' বলল খালেদ। 'যা জানার ছিল জেনেছি আমি। এখন থেকে ওর দায়িত্ব তোমাদের ওপর। আমার কাছ থেকে হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত ওকে তোমরা আটকে রাখবে।' পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করল সে। 'দশ হাজারের মধ্যে পাঁচ হাজার আগেই পেয়েছ। কাজ এখনও শেষ হয়নি, কাজেই বাকি টাকা এখনও তোমাদের পাওনা হয়নি। কিন্তু তোমরা তোমাদের কথা রাখবে, এই বিশ্বাসে বাকি পাঁচ হাজার পাউন্ডও দিয়ে দিচ্ছি আমি।

নোটের তাড়াটা ছুঁড়ে টেবিলের ওপর ফেলল খালেদ।

'তোমার সাথে কাজ করে আরাম আছে,' বলল রোনাল্ড। নোটের তাড়াটা পকেটে ভরল সে। 'তা, আপদ নিয়ে ঝামেলা করতে চাইছ কেন? একেবারে সরিয়ে দিলে ক্ষতি কি?'

'না,' কঠোর সুরে বলল খালেদ। 'ন্যাট ম্যানারকে মেরে ফেলা চলবে না। নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত ওকে শুধু আটকে রাখবে তোমরা। মনে থাকবে তো?'

'নিশ্চয়ই, অবশ্যই!' এক গাল হাসল রোনাল্ড হার্ডি। 'এবার তাহলে মাইকেল আমপালার সাথে তোমার একবার দেখা হওয়া দরকার, কি বলো?'

'কালই স্পেনে যাচ্ছি আমি,' বলল খালেদ। 'মালাগা-য়।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রোনাল্ড। তারপর বলল, 'তাহলে কাল সন্ধ্যায় আমপালার সাথে মালাগা-র সিটি ক্লাবে থাকব আমি। প্রাথমিক আলাপটা ওখানেই সারো তোমরা।'

'ঠিক আছে।'

দু'ঘণ্টা বিশ মিনিট হলো বরফ ঢাকা লন্ডন ছেড়েছে খালেদ। মালাগা এয়ারপোর্টের টারমাক ধরে হাঁটার সময় গা থেকে জ্যাকেটটা খুলে ফেলল সে। মুখে আর হাতে পঁচাত্তর ডিগ্রী গরম রোদের উপভোগ্য আঁচ নিয়ে বেরিয়ে এল এয়ারপোর্ট থেকে। রোববারের দুপুর, শহরের তাজা-তরুণ সবাই মারবেলা সৈকতে ভিড় জমিয়েছে। খালেদও যাচ্ছে সেখানে, ওখানেই তার সাথে দেখা হওয়ার কথা সা'দুল্লার।

ট্যাক্সি নিয়ে মারবেলায় পৌছুতে পঞ্চাশ মিনিট লাগল খালেদের। সাথে শুধু একটা লেদার সুটকেস, তাতে টয়লেট সরঞ্জাম আর দুই প্রস্থ কাপড়চোপড় আছে। মারবেলার সবচেয়ে নামকরা আশ্রয়, হোটেল ভ্যালেন্সিয়ার ফোয়ায়ে দাঁড়িয়ে

খাতায় নাম সই করল সে। হোটেল ভ্যালেন্সিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো এর বাগান, ভূমধ্যসাগরের তীর ধরে আধ মাইল লম্বা। দুনিয়ার ধনী লোকজন ওঠে, তাই শুধু একটা রুম এখানে ভাড়া পাওয়া যায় না। গেস্টদের জন্যে স্বতন্ত্র বাংলো আছে, সাথে একটা করে প্রাইভেট বাগান। আর আছে স্যুইট, প্রতিটি সুইমিং পুলের দিকে মুখ করা। নিজের জন্যে একটা স্যুইট বুক করল খালেদ। কাপড় বদলে সাদা সিল্কের শার্ট আর একখানা সুইমিং শর্টস পরল সে, শার্টের বোতাম খোলা রাখল। তারপর বেরিয়ে পড়ল সা'দুল্লার খোঁজে।

সুইমিং পুলের ধারে দেখা পাওয়া গেল সা'দুল্লার। আড়াই মণ ওজনের বিশাল এক প্রাণী, ঘাড়ে-গর্দানে সমান। রোদে পুড়ে তামা হয়ে গেছে গায়ের রঙ, মাংসল মুখে নাকটা বেমানান রকম খাড়া। একটা ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে রয়েছে সে, হাত দুটো দুই উরুর মাঝখানে নিঃসাড় পড়ে রয়েছে, গভীর আগ্রহের সাথে ঝুঁকে পড়ে কথা বলছে উদ্ভিন্ন-যৌবনা এক স্বর্ণকেশীর সাথে। পুলের আরেক প্রান্ত থেকে সা'দুল্লাকে দেখতে পেল খালেদ। চিনতে সাহায্য করল লোকটার অলঙ্কারগুলো। তার এক কব্জিতে একটা মোটা ব্রেসলেট, আরেক কব্জিতে ঘড়ি, গলায় তিন তিনটে চেইন—সবই সোনার। রঙচঙে সুইমশর্টস পরে আছে সে, তার ওপর ঢিবি আকৃতির মস্ত এক লোমশ পেট।

ওকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সা'দুল্লা। 'হাই, রানা!'

নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পাবে, উত্তেজিত হয়ে আছে মন। পদে পদে বিপদ শিহরণ ভয় আর মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকবে, কল্পনা করতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল শরীর। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার আরও একটা সুযোগ বোধহয় আসছে।

কিন্তু কার সামনে দাঁড়াতে হবে মনে পড়তেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। একটা ঢোক গিলে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করল মাসুদ রানা। তারপর বিসমিল্লাহ্ বলে নক করল চেম্বারের দরজায়।

ভেতর থেকে গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল, 'কাম ইন।'

দরজা খোলাই ছিল, কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা, ছেড়ে দিতে আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল সেটা। বিরাট ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারটা খালি দেখে আশ্চর্য হলো ও, চোখ পড়ল জানালার দিকে। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, ওর দিকে পিছন ফিরে। তাঁর মুখের একটা পাশ দেখতে পেল ও—কপালের কাছে একটা শিরা সামান্য ফুলে আছে। এই ঘরে ঢুকলে বরাবর যা হয়, হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে রানার, শরীর আড়ষ্ট। বুঝতে পারছে, কোন বিষয়ে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় আছেন বস্। মেজাজটাও নিশ্চয়ই তিরিক্ষি হয়ে আছে।

পা টিপে টিপে হাতলহীন একটা চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়াল রানা। বুকের ভেতর আটকে আছে বাতাস, কিন্তু একটু একটু করে ছাড়ছে, যাতে কোন শব্দ না হয়।

'বসো,' দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন তিনি, এক চুল নড়লেন না।

বসতে পারলে পা বেচারিদের মুশকিল আসান হত, কিন্তু বসের আগে নিজে

বসে পড়ে নতুন একটা রেকর্ড তৈরি করার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

আরও প্রায় মিনিট খানেক ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকলেন রাহাত খান। তারপর আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালেন, ঘুরে এগিয়ে এসে বসলেন নিজের চেয়ারে। ধমক খাওয়ার আগেই এবার বসে পড়ল রানাও। বুড়োর অসন্তুষ্ট, রাগী চেহারা দেখে গলা শুকিয়ে গেল ওর।

চুরুট ধরালেন রাহাত খান। শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছেন। 'সৌদি আরবের একশো টন সোনা খোয়া গেছে, জানো তুমি?'

ঘটনাটা মনে পড়তে এক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগল না। 'বছর দুই আগের কথা,' বলল রানা। 'আরব সাগরে ওদের একটা জাহাজ নিখোঁজ হয়ে যায়...।' কথা বলার সাথে সাথে চিন্তা-ভাবনাও চলছে। সোনাটা কোথায় আছে, জানা গেছে? বোধহয় ইসরায়েলে। ওখানে পাঠানো হবে তাকে? নিশ্চয় কমান্ডো বাহিনী নিয়ে?

'ওরা ঘোষণা করেছিল, একশো টন সোনা ছিল জাহাজে,' বললেন রাহাত খান। 'কথাটা তখন অনেকেই বিশ্বাস করতে চায়নি। কেউ কেউ এই দাবিকে কূটনৈতিক চাল বলে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েনি।' রাহাত খান থামলেন, যেন রানাকে কিছু বলার সুযোগ দেয়ার জন্যেই।

'রিয়াদ থেকে বলা হয়েছিল, ওদের জাহাজ নিখোঁজ হওয়ার পেছনে ইসরায়েলই দায়ী।'

'কিন্তু কিছু প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি,' বললেন রাহাত খান। 'প্রমাণ এখনও ওদের হাতে নেই। তবে...' বলে একটু থামলেন বি. সি. আই. চীফ, চুরুটে ঘনঘন কয়েকটা টান দিলেন, নীলচে-সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এল ঠোঁটের কোণ দিয়ে। স্বাদটা বোধহয় কটু লাগল, চুরুটটা অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রাখলেন। '...ওদের সন্দেহ, ওই সোনা নিয়ে ইসরায়েল ইংল্যান্ডে রেখেছে।'

একশো টন সোনা। উদ্ধার করা, তারপর গোপনে একটা দেশ থেকে বের করে আনা। সম্ভব? চ্যালেঞ্জ বোধ করায় পুলক অনুভব করল রানা। বোধহয় সত্যিকার বিপজ্জনক একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেতে যাচ্ছে সে। কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্টে শত্রুপক্ষ কে? ইসরায়েল, না ইংল্যান্ড?

'অনুরোধে ঢেকি গিলছি আমরা,' খোলা একটা ফাইলে চোখ রেখে বললেন রাহাত খান। 'সৌদি আরবের ওই সোনা, তা সে ইসরায়েলেই থাকুক আর ইংল্যান্ডে, উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছি আমি। ওরা এমন ভাবে পেঁচিয়ে ধরল, কথা না দিয়ে উপায় ছিল না। যাই হোক, কাজটা হাতে নিতে হচ্ছে বি. সি. আই-কে।'

কি বলতে কি বলে ফেলে ধমক খেতে চায় না রানা, তাই চুপ করে থাকল।

'ইংল্যান্ড আমাদের বন্ধু দেশ,' রানাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন রাহাত খান, 'কাজেই ওদেরকে চটানো চলবে না। চোরাই সোনা ওরা যদি নিজেদের দেশে রেখে থাকে, মস্ত অন্যায় করেছে, কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে বলা যাবে না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে তোমাকে।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

'প্রথমে তোমাকে জানতে হবে, সোনাটা কোথায় আছে। ইসরায়েলে

থাকলে, একটা কমান্ডো বাহিনী নিয়ে ওখানে যেতে হবে তোমাকে। ইংল্যান্ডে থাকলে, গুণ্ডাপাণ্ডা বা টেরোরিস্টদের সাহায্য নিয়ে কাজটা করবে। তুমি থাকবে আড়ালে, তোমার পরিচয় কোন অবস্থাতেই, আই রিপিট, কোন অবস্থাতেই ফাঁস হওয়া চলবে না।'

শত্রুপক্ষ কে, পরিষ্কার হয়ে গেল। কুখ্যাত গুণ্ডা বা টেরোরিস্টদের সাথে কাজ করা মানে প্রতি পদে বিশ্বাসঘাতকতার আতঙ্কে তটস্থ থাকতে হবে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে কপালের একটা পাশ আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন রাহাত খান। প্রায় অসম্ভব একটা অ্যাসাইনমেন্টে রানাকে পাঠাচ্ছেন তিনি, সেটাই তাঁর রাগ আর মাথা ব্যথার কারণ। কপাল থেকে হাত সরিয়ে আবার তিনি বললেন, 'স্পেনে সৌদি ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট সা'দুল্লা আছে, তার সাহায্য নিতে পারো তুমি। সমস্ত খরচ সৌদি ইন্টেলিজেন্স দেবে, সা'দুল্লাকে বললেই সব ব্যবস্থা করবে সে। এটা তোমার একার অ্যাসাইনমেন্ট, তবে গিলটি মিয়া আর সলিলকে সাথে রাখতে পারো। কাজে লাগতে পারে তেমন কোন ইনফরমেশন তোমাকে দেয়া গেল না। তবে একটা ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছি তোমার ডেস্কে। আরও কিছু জানতে চাইলে ওটা পড়ার পর যোগাযোগ কোরো।'

অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল মনে, কিন্তু রানা জানে, এগুলোর কোনটার উত্তরই বুড়োর জানা নেই। জানা থাকলে নিজে থেকেই বলতেন। ও শুধু জানতে চাইল, 'স্পেনে কোথায় পাব সা'দুল্লাকে?'

'মালাগায়—হোটেল ভ্যালেন্সিয়ায়।' নিভে যাওয়া চুরুটটা অ্যাশট্রে থেকে তুলে নিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। তার অর্থ—এবার তুমি আসতে পারো।

অ্যাসাইনমেন্টের ধরনটা আঁচ করতে পেরে অসহায় বোধ করছে রানা। সোনাটা কোথায়, কিভাবে আছে তা-ই কারও জানা নেই। সেটা উদ্ধার করা তো অনেক দূরের কথা। বুড়োর কাছ থেকে আর কোন সাহায্য পাবার আশা নেই, বুঝতে পেরে পালিয়ে বাঁচার ইচ্ছেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা।

'ও, আরেকটা কথা,' রানার চোখে কড়া দৃষ্টি রেখে বললেন রাহাত খান, 'সোনাটা তোমার খুব তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে দিতে হবে। সৌদি ইন্টেলিজেন্স আভাস পেয়েছে, সোনা বিক্রি করে টাকাটা কাজে লাগাবার প্ল্যান করছে ইসরায়েল। বড়জোর এক থেকে দেড়মাস সময় পাবে তুমি, তার বেশি না।'

ইচ্ছে হলো, জিজ্ঞেস করে, বাজার থেকে একশো টন সোনা কিনে সৌদি আরবকে ফিরিয়ে দিলে হয় না? কিন্তু জানে, টাকা নেই; তাছাড়া একসাথে এত সোনা কিনতে গেলে, তাতেও দেড়মাসের বেশি সময় লাগবে। এবং এ-ধরনের প্রশ্ন করলে ঘাড়-ধাক্কা খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘুরে দাঁড়াতে এক সেকেন্ডের মত দেরি হলো রানার, রাহাত খান মুখ তুলে কটমট করে তাকালেন। পিছন ফিরে মুচকি হাসল রানা, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

*

চট করে চারদিকটা একবার দেখে নিল রানা। কাছেপিঠে কেউ নেই, বাগানের ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে রয়েছে কিছু লোক। হোটেল গেস্টরা বেশির ভাগই সৈকতে। কয়েকজনকে চিনতে পারল ও, সবাই মধ্যপ্রাচ্যের, তার মধ্যে আবুধাবী সরকারের এক প্রভাবশালী আমলাকেও দেখল। দৃষ্টি ফিরে এল সা'দুল্লার ওপর, ওর চোখ দেখে মনের ভাব বুঝতে পারল সা'দুল্লা, অভয় দিয়ে একটু হাসল সে। মেয়েটার দিকে তাকাল রানা।

'আমার খালাতো বোন,' পরিচয় করিয়ে দিল সা'দুল্লা।

পটলচেরা চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা, চাহনিতে সেই পরিচিত, আদিম ঝিলিক। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল রানা। 'তোমার সাথে কথা আছে, সা'দুল্লা।'

খানিক ইতস্তত করে মেয়েটার উদোম পিঠে একটা হাত রাখল সা'দুল্লা, তার কানে কানে কি যেন বলল। গাল ফোলাল মেয়েটা, কিন্তু কিছু বলল না। রানার একটা হাত ধরল সা'দুল্লা, বলল, 'চলো।'

পুলের কিনারা ধরে রেস্তোরাঁর দিকে এগোল রানা। খিদে পেয়েছে ওর। 'তুমি আমার নাম ধরলে কি মনে করে?' হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল ও।

'বললাম না, ও আমার খালাতো বোন! জানলেও তোমার পরিচয় ফাঁস করবে না...'

পুলের আরেক প্রান্তে এসে বিশাল এক রঙিন ছাতার নিচে বসল ওরা। আশপাশের টেবিলগুলো খালি। 'এসব ব্যাপারে খালাতো কেন, আপন বোনকেও কিছু জানাতে নেই, জানালে ওদেরও বিপদ হতে পারে।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল সা'দুল্লা। 'ততটা গুরুত্ব দিইনি আসলে।'

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল, ওয়েটার এগিয়ে আসছে। চারদিকে আরেকবার চোখ বুলাল ও। ওর অনুমতি নিয়ে অর্ডার দিল সা'দুল্লা, ওয়েটার চলে গেল।

'আশপাশে শুধু আমাদের লোকই দেখছ, তাই না?' বলল সা'দুল্লা। 'পবিত্র কোরানে বলা আছে, মুসলমানরা একদিন আন্দালুসিয়া ফিরে পাবে। সেটা সত্যি হতে যাচ্ছে। যুদ্ধ না করে, আমরা সব কিনে নিচ্ছি। এই হোটেলের অর্ধেক শেয়ার একজন আরব শেখের। এলাকার প্রতিটি বড় এস্টেটের অর্ধেক মালিকানা আরবদের।' হঠাৎ লক্ষ করল সে, রানা ওর কথা শুনছে না। দ্রুত জানতে চাইল সে, 'লন্ডনের খবর কি, রানা?'

মুখ ফেরাল রানা। 'তোমাদের ইনফরমেশন মিথ্যে নয়,' বলল ও। 'সোনাটা লন্ডনেই আছে।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সা'দুল্লার। 'আমাদের তাহলে তেল আবিবে যেতে হচ্ছে না। কোথায়, তাও নিশ্চয়ই জেনেছ?'

চেয়ারে হেলান দিয়ে দোল খেতে শুরু করল রানা। 'হ্যাঁ।'

ব্যস্ত হাতে একটা সিগারেট ধরাল সা'দুল্লা। নাকের ভেতর একটা আঙুল ভরে ফোঁৎ ফোঁৎ আওয়াজ করল। 'এত তাড়াতাড়ি এ-সব জানলে কিভাবে? কতটুকু আছে ওখানে?'

'সবটুকু। পুরো একশো টন।'

'ইয়াল্লা!' উত্তেজনায় কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না সা'দুল্লা। 'লন্ডন পুলিসের ধীরে চলো নীতি সম্পর্কে আর কিছু জানলে?'

'ওপর মহলের অনেকের সাথে কথা বলেছি,' বলল রানা। 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আসছেন বলে পুলিস ডিপার্টমেন্ট ফুল স্কেল ধর্মঘটে যাচ্ছে না। কিন্তু ধীরে চলো নীতি থেকে একচুল নড়বে না তারা। বেতন আর অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে বাড়াবার ব্যাপারে পুলিস প্রতিনিধিদের সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আলোচনা ভেঙে গেছে। ওখানের কাগজগুলোয় এটাই এখনকার সবচেয়ে গরম খবর। সরকার জানিয়ে দিয়েছে, পুলিসদের দাবি মেনে নেয়া সম্ভব নয়।'

ওয়েটার এসে ওদের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে গেল। একটা গলদা চিংড়ি তুলল রানা কাঁটা চামচ দিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

'আমার কিন্তু নার্ভাস লাগছে,' এক সময় বলল সা'দুল্লা। 'গোটা ব্যাপারটা এত জটিল, মনে হচ্ছে এই কাজে হাত দেয়া পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। তুমি কি মনে করো, রানা?'

'সোনা না হয়ে যদি নগদ টাকা হত, সরানো তেমন কঠিন হত না,' বলল রানা। 'সমস্যায় ফেলবে সোনার ওজন। বড় সমস্যাগুলোর মধ্যে এটা একটা।'

'বড় আর ক'টা?'

'অসংখ্য,' বলল রানা। 'তবে সবগুলোকে বড় তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি আমি। প্রথম সমস্যা, ব্যাংক থেকে ওই সোনা লুঠ করা। আর সব সাধারণ ব্যাংক ডাকাতি যে-রকম হয় এটা সে-রকম হতে যাচ্ছে না। বিশেষ একটা ভল্টে রাখা হয়েছে সোনা, নিশ্চয়ই বিশেষ ধরনের পাহারার ব্যবস্থাও আছে।'

গ্লাসে চুমুক দিল সা'দুল্লা। 'হুঁ। ভাল কথা, সোনাটা ওরা এত থাকতে লন্ডনে রেখেছে কেন জানতে পেরেছ?'

'না,' মিথ্যে কথা বলল রানা। সব কথা সা'দুল্লাকে জানাতে ভরসা পাচ্ছে না। সময় মত সৌদি ইন্টেলিজেন্সকে নিজেই রিপোর্ট করবে ও।

'ব্যাংক লুঠ হবার পর ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া কি হবে তাই ভাবছি।'

'ব্রিটিশ সরকার সাংঘাতিক অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যাবে, সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'সোনা লুঠ হয়ে গেছে, এটা ওরা প্রকাশ্যে প্রচার করতে পারবে না। তাহলেই প্রশ্ন উঠবে, ওটা এল কোত্থেকে। কি ব্যাখ্যা দেবে ওরা? হার ম্যাজেস্টির গভর্নমেন্ট বেশ একটু কোণঠাসা হয়ে পড়বে। ইসরায়েলিরা লয়েডের মাধ্যমে নিশ্চয়ই বীমা করিয়ে রেখেছে সোনাটা, সে-ও এক সমস্যা। তবে ওরা যাতে বীমার টাকা না পায়, তার ব্যবস্থাও করতে চাই আমি।'

'বাকি সমস্যা? ক্যাটাগরি দুই আর তিন?'

'দু'নম্বর হলো পরিবহন,' বলল রানা, সেভেন আপ-এর স্ট্র-তে ছোট একটা চুমুক দিল ও। 'এটা একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। সোনার কাছে যদি পৌঁছুতেও পারি, সবটা নিয়ে আসতে পারব বলে মনে হয় না। ধরো, অর্ধেকটা আনা হয়তো সম্ভব হবে।'

প্রচণ্ড বেগে মাথা নাড়াল সা'দুল্লা, প্রবল প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে গেল,

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'যদি সম্ভব হয় তাহলে তো আমরা সবটাই নিয়ে বেরিয়ে আসব, কিন্তু যদি সম্ভব না হয়? ধরো, অর্ধেকটা আনব আমরা, তাহলেও দশ টনী পাঁচটা ট্রাক লাগবে। প্রতিটি ট্রাক সিকি ভাগও হয়তো ভরবে না, কিন্তু সোনার যা ওজন, তার বেশি ভরলে চাকা বসে যাবে। বিপদে ফেলবে ওই ওজন, আয়তন নয়।'

'তবু ওখানে যদি পৌঁছুতে পারি,' জেদের সুরে বলল সা'দুল্লা, 'অর্ধেক নয়, সবটা নিয়ে আসব আমরা।'

হেসে উঠল রানা। 'যদি সম্ভব হয়। আসলে সময় নিয়ে বিপদে পড়ব আমরা। হাজার পাউন্ডের নোট নয় যে সুটকেসে ভরতে যা দেরি, নিয়ে চলে এলাম। ভল্ট থেকে সোনার বার বের করা, ট্রাকের কাছে নিয়ে আসা, ট্রাকে তোলা, এই রকম আরও অনেক কাজ থাকবে আমাদের। কি রকম সময় লাগবে ভেবে দেখেছ?'

'তিন নম্বর সমস্যা?'

'ডেসটিনেশন,' বলল রানা। 'এটাও একটা চ্যালেঞ্জ। ব্যাংক থেকে বের না হয় করলাম, তারপর? কোথায় নিয়ে যাব? মার্কেটে বিক্রি করে নগদ টাকা নেব, তা সম্ভব নয়। হঠাৎ করে কেউ পঞ্চাশ টন সোনা...'

'একশো টন...'

'ঠিক আছে, একশো টন। হঠাৎ কেউ কিনতে পারবে না। চাইবে কিনা তাও সন্দেহ। লুঠ করা মাল। যদি কেউ কিনতে চায়ও, বাজার দরের সিকি ভাগের বেশি দিতে চাইবে না। তারপর, ব্যাংক থেকে লুঠ করে না হয় কোথাও নিয়ে গিয়ে রাখলাম, কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে বের করে নিয়ে যাব কিভাবে? কোথায় নিয়ে যাব?'

'কেন, আমার দেশের সোনা আমার দেশেই যাবে,' বলল সা'দুল্লা।

'তা তো যাবে, কিন্তু কিভাবে, কিসে করে?'

'তাহলে?' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল সা'দুল্লা। নাকের ফুটোয় আবার আঙুল ভরল সে। 'কি উপায় হবে?'

'নাক থেকে আঙুলটা বের করবে তুমি? উপায় একটা না একটা হবেই,' বলল রানা। 'আমপালার সাথে কথা বলে দেখি, তার সাহায্য পাওয়া গেলে হয়তো সমস্যা অনেক কমে যাবে।'

কিন্তু রানা জানে না, ঘটতে যাচ্ছে ঠিক উল্টোটা।

সন্ধে সাতটায় সিটি ক্লাবে পৌঁছুল রানা। নাম করা ক্লাব, দেশী-বিদেশী ধনী লোকজন জুয়া খেলতে আসে এখানে। বারে ওর জন্য অপেক্ষা করছে রোনাল্ড হার্ডি। রোনাল্ডের চেহারা একটু ম্লান দেখে মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠল ও, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। লক্ষ করল, ও বারে ঢুকতেই একজন বিশালদেহী ইটালিয়ান বাইরে বেরিয়ে গেল।

রানার সাথে তিনজন লোকের পরিচয় করিয়ে দিল রোনাল্ড, বলল, 'এরাই তোমাকে মাইকেল আমপালার কাছে নিয়ে যাবে। আজকের আলোচনায় আমি থাকছি না।'

রোনাল্ডের মন খারাপের কারণটা আন্দাজ করতে পারল রানা, আমপালা

বোধহয় আলোচনায় তাকে রাখতে চায়নি। লোক তিনজনের সাথে বার থেকে বেরিয়ে এল ও। তিনজনেরই অল্প বয়স, বাইশ থেকে আটাশের মধ্যে। কালো স্যুট পরা, ট্রাউজারের কোন কোন জায়গা বেঢপ ভাবে ফুলে আছে। হাসি হাসি মুখ, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রয়োজনে এরা হিংস্র নেকড়ে হয়ে উঠতে জানে। মেদহীন শরীর, লোহার রডের মত একহারা আর শক্ত। বার থেকে বেরুবার আগে ওদের একজন সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চীফ আমপালার সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগে মি. খালেদ কি গলাটা ভিজিয়ে নিতে চান?'

মুচকি একটু হাসল রানা, উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

ক্লাবের করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। তারপর শেষ প্রান্তের একটা কামরায় ঢুকল। বড় একটা ডেস্ক, দুটো মাত্র চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে রয়েছে মাফিয়া চীফ মাইকেল আমপালা। ফটোতে আগেই দেখেছে রানা, চিনতে অসুবিধে হলো না। চৌকো আকৃতির মুখ, কামানো মাথা, চোখে সানগ্লাস। মানুষের শরীরে এমন অস্বাভাবিক চওড়া হাড় সাধারণত দেখা যায় না, আর এটাই মাইকেল আমপালার শারীরিক বৈশিষ্ট্য। সাদা গ্যাবার্ডিনের স্যুট পরে রয়েছে সে। ঠোঁটে লম্বা একটা চুরুট।

কামরায় আরও দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রানাকে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আমপালা। হাত নাড়ল, সাথে সাথে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল তার পাঁচজন দেহরক্ষী। বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। এগিয়ে এসে আমপালার বাড়ানো হাতটা ধরল রানা। আমপালা বলল, 'কি ভাগ্য আমার, তোমার সাথে পরিচয় হলো। বসো, খালেদ।'

আমপালার হাতটায় জোরে চাপ দিল রানা, ব্যথাটা মুখ বুজে সহ্য করল আমপালা, কারণ এটা রানার পাল্টা জবাব—সে-ই প্রথম চাপ দিয়েছিল। রানা বলল, 'তুমি স্পেনে জানলে লন্ডনে আমাকে হয়তো যেতেই হত না।' বসল ওরা।

একটু যেন ম্লান হলো আমপালা। কিন্তু পরমুহূর্তে সরল, নিষ্পাপ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। এটা একটা ফাঁদ, এই হাসি, নিজেকে সাবধান করল রানা। আমপালা বলল, 'হ্যাঁ, ছুটি কাটাতে এবার স্পেনেই এলাম আর কি।'

মিথ্যে কথা, জানে রানা। আবু সিনা আবদুল্লাহ খালেদ সম্পর্কে নানা রকম গুজব শোনার পর লন্ডনে বসে থাকার চেয়ে স্পেনে এসে তথ্য সংগ্রহ করাটাকেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল আমপালা। নিজের ছদ্ম-পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে, সে-ভয় রানা করছে না। আবু সিনা আবদুল্লাহ খালেদের স্থায়ী কোন ঠিকানা নেই, তবে স্পেনের অপরাধ-জগতে খোঁজ-খবর করলে তার সম্পর্কে অনেক তথ্য যোগাড় করা সম্ভব। সেই আশাতেই এখানে আসা আমপালার। কয়েক দিন হলো খালেদ স্পেনে নেই, আছে দক্ষিণ আমেরিকার এক অখ্যাত শহরে। খবরটা একমাত্র রানাই জানে, কারণ ওর অনুরোধেই সেখানে কিছু দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যে গেছে খালেদ। অনুমতি নিয়েই খালেদের ছদ্মবেশ ও পরিচয় গ্রহণ করেছে রানা। খালেদের কোন ফটো যদি আমপালা যোগাড় করে থাকে, তার সাথে রানার এখনকার চেহারা মিলে যাবে।

হুইস্কি ছাড়াও কোল্ড ড্রিঙ্ক রয়েছে, আমপালাই পরিবেশন করল। সরাসরি

প্রসঙ্গে না গিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি আর অর্থনীতি নিয়ে আলাপ শুরু করল ওরা। সোনার দাম ওঠা-নামা করছে, মন্তব্য করল রানা। আমপালা বলল, 'তবু আমি মনে করি, ডলার বা মার্কের চেয়ে এখনও সোনার ওপরই ভরসা আছে মানুষের।'

কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাস ঠোঁটে তুলল রানা, গ্লাসের কিনারা দিয়ে সরাসরি তাকাল আমপালার চোখে। 'হ্যাঁ, তা ঠিক।' এক সেকেন্ড বিরতি নিল ও। 'সেজন্যেই সোনার দিকে চোখ আমার।'

সাথে সাথে সতর্ক হয়ে উঠল আমপালা। 'আমারও,' বলল সে। 'কিন্তু পোড়াচোখে আজকাল বড় একটা সোনা দেখতে পাই না।'

'আমি পাই।'

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ল আমপালা। 'কিন্তু দেখতে পেলেও সেটা তুলে আনতে পারো না, ঠিক?'

'পারি, তবে কিছু অসুবিধে আছে,' বলল রানা। 'তাই বাইরের সাহায্য লাগবে।'

'তাহলে বলব ঠিক লোকের কাছেই এসেছ তুমি,' বলল আমপালা, আবার তার মুখে সরল, নিষ্পাপ হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

শব্দ হতেই ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। দরজা খুলে গেছে। কামরায় ঢুকল একটা···মেয়ে নয়, যেন, স্বর্গ থেকে নেমে আসা অপ্সরী। কোন মেয়ের চেহারায় এমন পবিত্র ভাব, এমন ঝলমলে আলোর আভা আর কখনও দেখেনি রানা। নিজের অজান্তেই দম আটকে গেছে ওর। হলুদ একটা স্কার্ট আর লাল ব্লাউজ পরে আছে মেয়েটা। বয়স আন্দাজ করা মুশকিল, পনেরোও হতে পারে, আবার উনিশ বিশ হওয়াও বিচিত্র কিছু না। বাইশ বা চব্বিশ হলেও অবিশ্বাস করবে না রানা। হালকা পায়ে এগিয়ে এল সে, হাবভাব কেমন যেন একটু জড়সড়। কামরায় ঢোকার পর থেকে সরাসরি আমপালার দিকেই তাকিয়ে থাকল, যেন জানেই না আরও একজন মানুষ রয়েছে। রানার ডান দিকে আর আমপালার বাঁদিকে, ডেস্ক ঘেঁষে দাঁড়াল ও।

সব ভুলে মেয়েটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে রানা।

কিন্তু এক সময় লক্ষ করল, মেয়েটাকে দেখে আমপালার মধ্যেও একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে। কি যেন এক গোপন, নিষিদ্ধ প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমপালার মুখ। মাথা নিচু করে হাতঘড়ি দেখল সে। তৃপ্তির হাসি ফুটল চেহারায়, বলল, 'দু'মিনিট আগেই এসেছ।'

কথা বলল না মেয়েটা, শুধু মাথা নিচু করল, একবার যেন কেঁপে উঠল ঠোঁট জোড়া।

'এসো, পরিচয় করিয়ে দেই,' বলল আমপালা। 'ইনি আমার বন্ধু, খালেদ। আর খালেদ, ও আমার···ওর নাম ফিরোজা।'

রানার দিকে এই প্রথম তাকাল মেয়েটা। চোখ নয় যেন নীল পদ্ম নিয়ে পাশাপাশি এক জোড়া দীঘি। রানার মনে হলো, ও কি প্রয়োজনের চেয়ে এক সেকেন্ড বেশি তাকিয়ে থাকল ওর দিকে? অনুভব করল, বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে।

সংবিৎ ফিরল মেয়েটার কণ্ঠস্বরে, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. খালেদ।' শোনার পরপরই রানার মনে হলো, কি মিষ্টি, আবার যদি শুনতে পেতাম!

'আমরা এখন কাজের কথা বলছি,' বলল আমপালা। 'বেড়াও, কিন্তু বাইরে কোথাও যেয়ো না।'

মাথা দুলিয়ে দরজার দিকে এগোল ফিরোজা। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। ও আমার, আমপালার এ-কথার মানে কি? বাইরে থেকে আবার দরজা বন্ধ হয়ে যেতে আমপালার দিকে ফিরল ও। 'এমন রূপ সচরাচর দেখা যায় না।'

'তোমাদের এলাকার মেয়ে,' বলল আমপালা। 'প্যালেস্টাইনী।'

রানা কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে বাধা দিল সে, 'কাজের কথায় ফিরে আসা যাক। তোমার যদি সত্যি সাহায্য লাগে, আমার তাহলে জানতে হবে, সমস্যাটা কি ধরনের। কতটুকু সোনা, কোথায় আছে…'

'একশো টন।'

ঝাড়া দশ সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল আমপালা। ধীরে ধীরে রাগে লাল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করতে এসেছ?'

'আছে তোমাদের পাড়াতেই…লন্ডনে,' বলল রানা।

আরও পাঁচ সেকেন্ড পাথর হয়ে থাকল আমপালা। তারপর রানার দিকে হাড়সর্বস্ব লম্বা একটা আঙুল তাক করে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'মাইগড! তুমি, তুমি সিরিয়াস? একশো টন সোনা…লন্ডনে, মাই গড!'

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা ঠক্ করে ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখল রানা। 'ভাব দেখে মনে হচ্ছে কাজটাকে তুমি নিজের তুলনায় একটু বড় মনে করছ? সাহায্য করা কঠিন হবে?'

এক সেকেন্ড রানার দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে থাকল মাফিয়া চীফ, তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তার ঘর-কাঁপানো হাসি যেমন হঠাৎ শুরু হলো তেমনি হঠাৎ-ই থামল। আমপালা বলল, 'এরচেয়েও কঠিন কাজ করেছি আমরা, খালেদ। আর, সে-খবর পেয়েই তুমি আমার কাছে এসেছ। আমি অবাক হয়েছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে। একশো টন সোনা রয়েছে লন্ডনে, লুঠ করা সম্ভব, তুমি খবর পেয়েছ অথচ আমি পাইনি—এ এক রকম অসম্ভব, সেজন্যেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যাক। এখন বলো তো, সোনাটা কার? কোত্থেকে তুলে আনতে হবে?'

'সে-সব কথা এখুনি তোমাকে আমি জানাতে পারি না,' বলল রানা। 'তার আগে আরও আলোচনা দরকার।'

'তা ঠিক, তা ঠিক,' বলল আমপালা। 'একশো টন সোনা…তুমি সেটা লুঠ করতে চাও…'

'হ্যাঁ। আর, এমন একটা পরিস্থিতি আসছে, কাজটা করা সহজ হয়ে যাবে বলে আশা করছি আমি।'

ঝট করে মুখ তুলল আমপালা। 'লন্ডন পুলিসের ধীরে চলো নীতি?'

'এই তো জানো।'

'পেশার সাথে সম্পর্ক,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল আমপালা, 'জানতেই হয়। কিন্তু

তোমার নিজের একটা শক্তিশালী গ্রুপ থাকতে বাইরের কারও সাহায্য দরকার পড়ছে কেন বুঝলাম না।'

'এটা অন্য লোকের কাজ, আমি কন্ট্রাক্ট নিয়েছি,' বলল রানা। 'আমার নিজের লোকেরা একটা রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী, তাই এর মধ্যে ওদেরকে টানতে চাই না। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না এমন লোকের সাহায্য দরকার আমার।'

'আর লন্ডনে তোমার সংগঠন নেই, তোমার লোকেরা ওখানে সুবিধে করতে পারবে না, সেটাও একটা কারণ, তাই না?'

শান্তভাবে হাসল রানা। 'না। আমার গ্রুপকে তুমি ছোট করে দেখছ। দুনিয়ার যে কোন শহরে অপারেশন চালাতে পারে ওরা। বললাম তো, রাজনীতি করে না এমন লোক দরকার আমার।'

'ও, আচ্ছা।'

'তুমি যদি সাহায্য করতে চাও, তোমার লেফটেন্যান্টদের সম্পর্কে জানতে হবে আমার,' বলল রানা। 'এরপর আবার যখন আলোচনা করব আমরা, ওদেরকে আমি তোমার সাথে দেখতে চাই।'

'বেশ তো।'

'রোনাল্ড হার্ডিও যেন থাকে।'

স্পষ্ট বোঝা গেল, অসন্তুষ্ট হয়েছে আমপালা। বলল, 'কিন্তু রোনাল্ডের সাথে আমার ভাল সম্পর্ক থাকলেও, আমার দলের কেউ নয় ও। একটা কাজে দুটো দলকে জড়ানো কি উচিত হবে?'

'রোনাল্ডের সাথেই প্রথম কথা হয়েছে আমার,' বলল রানা। 'ওকে বাদ দিতে পারি না।'

'যদি ভেবে থাকো এখন ওকে বাদ দিলে ও বেঈমানী করবে, সে ভয় কোরো না,' খুব জোরাল আশ্বাস দিল আমপালা। 'এই কাজে আমি আছি জানলে কারও কাছে মুখ খুলবে না সে।'

'কারও বেঈমানীর ভয় আমি করি না,' দৃঢ় সুরে বলল রানা। 'নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় জানা আছে আমার। আমার সব কাজ বীমা করা থাকে।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল আমপালা। 'ঠিক আছে, তুমি যা বলো। থাকবে রোনাল্ড। আবার আমরা কোথায় বসব?'

'লন্ডনে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'হ্যাঁ, ভুলেই যাচ্ছিলাম মার্কিন প্রেসিডেন্টের লন্ডনে আসতে আর পাঁচ হপ্তা মাত্র বাকি আছে।' ডেস্কের দেরাজ খুলে ভেতর থেকে কাগজ আর কলম বের করল আমপালা। 'তাহলে মঙ্গলবারেই, পরশুদিন। এই সুযোগে অধমের গরীবখানাটাও দেখে যেতে পারবে।' খস খস করে ঠিকানা লিখল সে। 'রিজেন্ট'স পার্কের ধারেই। সকাল নয়, দুপুরের দিকে এসো। আমার লেফটেন্যান্টদের বসিয়ে রাখব।'

এরপর আমপালার কাছ থেকে বিদায় নিল রানা, কিন্তু ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল না—মেয়েটাকে আরেকবার দেখতে চায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করে যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, দেখল, বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে ফিরোজা। তার দিকে চোখ

পড়তে আবার বুকের ভেতর কেমন যেন তোলপাড় শুরু হলো ওর। লক্ষ করল, আপন মনে হাঁটছে ফিরোজা, কারও দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না। ওর পাশ দিয়েই হেঁটে গেল, কিন্তু চোখ তুলল না। পোকার রুমে ছিল আমপালা, সরাসরি সেখানেই ঢুকল মেয়েটা। দূর থেকে ওদেরকে লক্ষ করল রানা। ফিরোজাকে দেখেই আবার হাতঘড়ি দেখল আমপালা। হাসিমুখে কি যেন বলল, তারপর আবার মন দিল খেলায়। বিষণ্ন চেহারা নিয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল ফিরোজা, তারপর ধীর পায়ে বাথরুমের দিকে এগোল।

আরও কিছুক্ষণ থাকল রানা। আবিষ্কার করল, ঠিক আধ ঘন্টা পর পর একবার করে আমপালাকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে ফিরোজা। রহস্যটা কিছুই বুঝল না ও।

# তিন

প্রাইভেট রোডের মুখে বিরাট একটা ফটক, মার্সিডিজ থেকে নেমে ফটকের পাশে একটা খোপে ঢুকে ইন্টারকমে কথা বলল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর খুলে গেল ফটক। গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। রাস্তার শেষ মাথায় ইস্পাতের ফ্রেমের ওপর কাচ লাগানো একটা দোতলা বাড়ি। দুটো মার্সিডিজ আর দুটো ক্যাডিলাকের পিছনে গাড়ি থামিয়ে নামল ওরা। কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল রানা। প্রচণ্ড শীত, হি হি করছে।

বিশ সেকেন্ড পর আবার। এইবার খুলে গেল দরজা। অদ্ভুতদর্শন এক আমপালাকে দেখল ওরা—কোমরে বড় একটা তোয়ালে জড়ানো, সদ্য কামানো গাল থেকে আফটার শেভ লোশনের গন্ধ বেরুচ্ছে, হাতে একটা লাল গোলাপ, কামানো মাথায় সাবানের খানিকটা ফেনা আর চোখে নিত্যসঙ্গী সানগ্লাস। 'তুমি আমার জন্যে সৌভাগ্য বয়ে এনেছ,' বলে রানার কোটের বাটন হোলে গোলাপটা আটকে দিল সে।

তার পিছু পিছু বড়সড় একটা হলঘরে ঢুকল ওরা। সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের বদৌলতে গরম হয়ে আছে গোটা বাড়ি, দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে কোটের বোতাম খুলতে শুরু করল রানা।

আমপালা হাসছে। 'একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে এসেছ তোমরা। ওরাও সবাই হাজির। তোমাদের কোটগুলো দাও, প্লীজ।'

আমপালার ..তে কোটটা তুলে দিল রানা, বলল, 'ধন্যবাদ।' গোলাপটা হাতে নিয়ে নাকের কাছে তুলে গন্ধ নিল ও। 'হট হাউজের ফুল, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল আমপালা, তারপর সা'দুল্লার কোট নিয়ে একটা কুজিটের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে এসে ওদেরকে পথ দেখাল সে, মোটা ইরাকী কার্পেটে মোড়া সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠে এল দোতলায়। বিশাল একটা লাউঞ্জে ঢুকল ওরা, সিলিংটা অস্বাভাবিক উঁচু। চারদিকে তাকাল রানা, প্রতিটি জিনিস লক্ষ করল—চলতি ফ্যাশনের ফার্নিচার, দামী কার্পেট, বৈদ্যুতিক ঝাড়বাতি, সিল্ক-পেপার দিয়ে

মোড়া দেয়ালে শিল্পকর্ম—সবকিছুতেই উন্নত রুচি আর প্রাচুর্যের ছাপ। 'সুন্দর,' মন্তব্য করল ও, তাকাল সা'দুল্লার দিকে। 'আমার পার্টনারের সাথে পরিচয় নেই তোমার। ও সা'দুল্লা...'

'এ প্লেজার, মি. সা'দুল্লা।' সা'দুল্লার সাথে হ্যান্ডশেক করল আমপালা। 'তোমরা আরাম করে বসো, দু'মিনিটে গোসলটা সেরে আসি আমি।' চলে গেল সে।

ভেলভেটে মোড়া কয়েক সেট সোফা আর আর্মচেয়ার রয়েছে, তারই একটায় বসল সা'দুল্লা। রানাকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে, ধীর পায়ে একটা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। বাড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে রিজেন্ট'স পার্ক। ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর নিচেই ছোট্ট, পরিচ্ছন্ন একটা বাগান, তারপরই রিঙ রোড।

'লন্ডনে এইরকম একটা বাড়ি থাকলে লাইফটা এনজয় করা যেত,' বলল সা'দুল্লা।

রানার বলতে ইচ্ছে করল, এমনিতেই তো এক জন্মে কমপক্ষে তিনটে জীবনের আনন্দ উপভোগ করছ, তবু মন ভরে না?

দু'মিনিট নয়, পাঁচ মিনিট পর এল আমপালা। রোনাল্ড হার্ডি ছাড়া আরও দু'জন লোক রয়েছে তার সাথে। দু'জনকেই একটু চেনা চেনা লাগল রানার। কোথায় যেন দেখেছে ও এদেরকে। পরে পরিচয় করিয়ে দিল আমপালা। রোগা-পাতলা, সাড়ে ছয় ফিট লম্বা ইটালিয়ান বুচেত্তি পিয়ানো। নামটা শোনার পরপরই লোকটাকে চিনতে পারল রানা। এর ফটো দেখেছে ও। সিসিলি আর যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডারওয়ার্ল্ডে পিয়ানো একটা অতি পরিচিত নাম। কুখ্যাত অনেক টেরোরিস্ট গ্রুপ প্রায়ই তাকে ভাড়া করে। অপর লোকটা মাঝারি আকৃতির, মাথার চুল শজারুর কাঁটার মত শক্ত আর খাড়া, চোখ দুটো টকটকে লাল। দোয়াম ম্যানচিনি, নাম শুনে একেও চিনতে পারল রানা। এরও ফটো দেখেছে ও। সিসিলি আর লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডে এক ডাকে তাকে চেনে সবাই। এ-ও ভাড়া খাটে। এদের রাজনৈতিক কোন বাঁধন নেই, সেটা একটা সান্ত্বনা বটে। এধরনের একটা কঠিন কাজের জন্যে এদের চেয়ে উপযুক্ত লোক আর পাওয়া যাবে না তাও সত্যি। কিন্তু এদের রেকর্ড সম্পর্কে যতটুকু জানে রানা, সুযোগ পেলে বেঈমানী না করলেই বরং আশ্চর্য হবে ও।

এখনও সময় আছে, নিজেকে সাবধান করে দিল রানা, কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে আলোচনা বাতিল করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তারপর? কারও না কারও সাহায্য তো নিতেই হবে। এ-লাইনে যারা যোগ্য তারা সবাই আন্ডারগ্রাউন্ডের লোক, সুযোগ পেলেই বেঈমানী করবে।

বড় বেশি ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই। এদের নিয়ে কাজ করতে হলে মুহূর্তের জন্যেও অসতর্ক হওয়া চলবে না।

পরিচয় পর্ব শেষ হতে সবাইকে নিয়ে নিজের স্টাডিতে এল আমপালা। ওক কাঠের প্যানেল, চারদিকে বুক-শেলফ। বাদামী রঙের লেদারে মোড়া চেয়ারে বসল ওরা, শুধু আমপালা বাদে। ঘরের মাঝখানে বিশাল একটা মেহগনি ডেস্ক,

সেটার ওপর কনুই ঠেকিয়ে একদিকে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। সবাই বসেছে দেখে সিধে হলো, হাত দুটো ভাঁজ করল বুকে। বলল, 'খালেদ, আমার লেফটেন্যান্টদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলে তুমি। প্রথমে—'

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা, বলল, 'ওদের আমি দেখেই চিনেছি।'

সরল হাসি দেখা গেল আমপালার মুখে। 'আমিও ধারণা করেছিলাম, ওদেরকে দেখলেই তুমি চিনতে পারবে। হাজার হোক, একই পানির মাছ আমরা সবাই।' এক সেকেন্ড বিরতি নিল সে। 'এবার তাহলে বলো, আমার লেফটেন্যান্টদের সাহায্য নিতে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

মৃদু হেসে মাথা ঘোরাল রানা। কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু দরজা খোলার আওয়াজ শুনে চুপ করে গেল।

সেই পবিত্র আলো নিয়ে স্টাডিতে ঢুকল ফিরোজা। সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল, কিন্তু ফিরোজাকে দেখেই কেমন যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘাড় আবার সিধে করল সবাই। ব্যাপারটা লক্ষ করে অবাক হলো রানা। দেখল, শুধু আমপালা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফিরোজার দিকে। সেদিন যেমন দেখেছিল ও, আজও তেমনি। আমপালার চেহারায় গোপন, নিষিদ্ধ একটা প্রত্যাশা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। পঞ্চাশের ওপর বয়স আমপালার, ছোট এইটুকু একটা মেয়ের সাথে কি তার সম্পর্ক?—ভাবল ও।

চোখ নামিয়ে হাতঘড়ি দেখল আমপালা। রানার মনে হলো, আমপালার চৌকো মুখটা যেন মুহূর্তের জন্যে থমথমে হয়ে উঠল। নিজের অজান্তে রানা নিজেও একবার চোখ বুলাল হাত ঘড়িতে। একটা বেজে তিন মিনিট। প্রশ্ন জাগল মনে, নিয়ম বাঁধা আছে আধ ঘণ্টা পর পর দেখা দিতে হবে? তিন মিনিট দেরি করে ফেলেছে ফিরোজা?

নিজেকে সামলে নিয়েছে আমপালা। তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ফিরোজা। রোনাল্ড, পিয়ানো বা দোয়াম কেউ ওদের দিকে তাকাচ্ছে না। শুধু বিরাট বপু সা'দুল্লা বিস্ফারিত চোখে গিলছে ফিরোজাকে। জুতোর ডগা দিয়ে তার হাঁটুর ওপর একটা খোঁচা মারল রানা।

ফিরোজার কাঁধে একটা হাত রাখল আমপালা। 'মেহমানদের সবাইকে তুমি চেনো, শুধু সা'দুল্লা বাদে। সে-ও এখন থেকে আমাদের একজন বন্ধু। তা, মেহমানদের গলা ভেজাবার জন্যে কিছু দেবে না?'

মাথা নিচু করে ছিল ফিরোজা, চোখ না তুলেই বলল, 'আপনি যদি বলেন।'

গোপন আলোচনা চলছে, অথচ নক না করেই ঘরে ঢুকল ফিরোজা, তারপর আমপালাও তাকে চলে যেতে বলল না—আশ্চর্যই হলো রানা।

ঢোলা একটা ব্লাউজ পরেছে ফিরোজা, কলারটা ভাঁজ করা নয় বলে ঘাড়টা ঢাকা পড়ে আছে, কোমর ও নিতম্বে সেঁটে আছে কর্ডের টাইট ফিটিং ট্রাউজার। পায়ের নখগুলো টকটকে লাল, হাইহিল জুতোরই নক্সা করা অংশ বলে মনে হচ্ছে।

একটা ওক-প্যানেল খুলে ভেতর থেকে ড্রিঙ্কের সরঞ্জাম বের করল ফিরোজা। হাতে একটা ট্রে নিয়ে প্রথমে রানার দিকে এগিয়ে এল সে। কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ

করল রানা। একটু ঝুঁকে নিচু টেবিলে একটা গ্লাস নামিয়ে রাখল ফিরোজা, আমপালার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে। সিধে হবার সময় রানার চোখে তাকাল সে। মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে চলে গেল আরেকদিকে। কিন্তু এই এক সেকেন্ডেই একটা মেসেজ দিয়ে গেল মেয়েটার চোখজোড়া।

কি বলল মেয়েটা? কি বলতে চাইল? কিছু একটা বলেছে, বলতে চেয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই রানার, কিন্তু মেসেজটা ধরতে পারেনি ও। ওকে কি সাবধান করে দিতে চাইল? নিষেধ করল আমপালার সাথে জড়াতে? নাকি অন্য কিছু? ওর নিজের কোন কথা?

গ্লাসটা হাতে নিয়ে নাকের কাছে তুলল রানা। কোকা কোলা। ছোট্ট একটা চুমুক দিল ও। ভাবল, মদ খাই না তাও দেখছি জানে।

'এবার তাহলে কাজের কথা শুরু হোক,' বলল আমপালা।

ঝট করে ফিরোজার দিকে তাকাল রানা। ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করে মৃদু শব্দে হাসল আমপালা। বলল, 'ফিরোজা থাকলে কোন অসুবিধে নেই, খালেদ। আমাদেরই একজন ও।'

'কিন্তু…' এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, '…তা কি করে হয়। এটা পুরুষদের ব্যাপার…।'

'এটা ফিরোজারও ব্যাপার, মাই ফ্রেন্ড।'

'কি রকম?' ব্যাখ্যা দাবি করল রানা। এখনও ফিরোজা পরিবেশন করে চলেছে। ওদের কথা শুনছে সে, কিন্তু কারও দিকেই তাকাচ্ছে না।

'ভুলটা আমারই হয়েছে,' বলল আমপালা। 'ওর পরিচয়টাও তোমাকে দেয়া উচিত ছিল।' একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল সে। 'তোমাকে আগেই বলেছি, ও একজন প্যালেস্টাইনী। এগারো বছর বয়সে রাইফেল চালাতে শেখে ও। তেরো বছর বয়সে ইসরায়েলি পুলিস ক্যাম্পে হামলা চালায়। সে-বছরই একজন ইসরায়েলি সীমান্ত রক্ষীকে গুলি করে খুন করে ও। পরের বছর চারটে ব্যাংক ডাকাতিতে অংশ নেয়। সে বছরই ইসরায়েল থেকে ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসে লেবাননে, কিন্তু সীমান্ত পেরোবার সময় গুলি খেয়ে মারা যায় ওর বাবা। সে আমার বন্ধু ছিল। মেয়েকে আনতেই ঢুকেছিল ইসরায়েলে। আমি ছিলাম লেবাননে। বাবা মারা যাওয়ায় অসহায় হয়ে পড়ে ফিরোজা, কাজেই বন্ধুর মেয়েকে আশ্রয় না দিয়ে উপায় থাকে না আমার।'

ঘরে পিন-পতন স্তব্ধতা। পরিবেশন শেষ করে সবার কাছ থেকে একটু দূরে একটা চেয়ারে বসেছে ফিরোজা। মাথা নিচু করে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার পবিত্র চেহারা, চোখ ধাঁধানো রূপ আর অল্প বয়স দেখে বিশ্বাসই হয় না আমপালা সত্যি কথা বলছে।

'আমার পেশার সাথে ওকে আমি জড়াতে চাইনি,' আবার শুরু করল আমপালা। 'কিন্তু বাঘ…এখানে বাঘিনী,' বলে মুচকি একটু হাসল সে, '…একবার রক্তের স্বাদ পেলে তা কি আর ভুলতে পারে? দেখতে শান্তশিষ্ট, চুপচাপ থাকে, কিন্তু ওর ভেতর যে প্রচণ্ড একটা ঝড় মাথা কুটে মরছে সেটা আমি ঠিকই টের পেয়ে যাই। তাই অনেকটা মজা করার জন্যেই একদিন ওকে একটা অপারেশনে

নিয়ে গেলাম। সেদিনের কথা কখনও ভুলব না আমি।'

কামানো মাথায় একবার হাত বুলিয়ে চুরুট ধরাল আমপালা। 'সেটাও একটা ব্যাংক ডাকাতির অপারেশন ছিল। আমাদের একজন মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলায় সবাই আমরা ধরা পড়ে যাচ্ছিলাম। সবগুলো টেলিফোনের লাইন কাটা হয়নি। আহত একজন কেরানী সেই সুযোগটাই নেয়। পুলিসকে ফোন করে সে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাইরে থেকে গোটা বিল্ডিংটা ঘিরে ফেলে পুলিস। সবাই ধরে নিয়েছিলাম, আর রক্ষে নেই। ওই অবস্থায় সাহস বা বুদ্ধি কোন কাজে আসার নয়।

'তবে ফিরোজা উল্টোটা প্রমাণ করল। খুব শান্ত গলায় আমাকে সে বলল, কিন্তু জেল খাটতে পারব না। বাধা দেয়ার আগেই স্টেন উঁচিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। উঁকি দিয়ে দেখি, পুলিসরা যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। ওদের মধ্যে যারা কাভার নিয়েছিল তারা এমন হকচকিয়ে যায় যে প্রথম কয়েক সেকেন্ড গুলি করেনি। সেই সুযোগটাই নিই আমরা। ফিরোজার পিছু পিছু গুলি করতে করতে বেরিয়ে পড়ি আমরা সবাই।

'আটজনের মধ্যে ছয়জনই মারা পড়ে, বেঁচে যাই শুধু আমরা দু'জন,' থামল আমপালা।

অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। নিস্তব্ধতা আবার আমপালাই ভাঙল, 'সেই থেকে আমার প্রতিটি অপারেশনে ফিরোজা থাকে। আমার ডান হাত বলতে পারো ওকে।'

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে পড়ল না রানা, কিন্তু অসহায় একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করার জন্যে আমপালার ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো ওর। অনেক কড়া কথা গলার কাছে এসে আটকে গেল, বেরুতে পারল না। আপনা থেকেই মাথা হেঁট হয়ে গেল ওর।

'যদি বলো, ওর কৃতিত্বের বিশদ একটা ফিরিস্তি তোমাকে শোনাতে পারি, খালেদ,' বলল আমপালা।

মুখ তুলল রানা। 'দরকার নেই,' বলল ও। 'তবে, আমি ফিরোজার মুখ থেকে শুনতে চাই, ও কি নিজের ইচ্ছায় আমাদের এই বিপজ্জনক কাজে থাকতে চায়?'

আর কেউ না, শুধু আমপালা ফিরোজার দিকে তাকাল। বাকি সবাই কান খাড়া করে থাকল।

আমপালা জিজ্ঞেস করল, 'ফিরোজা, খালেদ কি জিজ্ঞেস করছে?'

চুপ করে থাকল ফিরোজা। এক চুল নড়ছে না সে।

কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। চেহারা থমথমে হয়ে উঠল আমপালার। আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, এই সময় মুখ তুলল ফিরোজা। রানার দিকে নয়, তাকাল আমপালার দিকে। মৃদু গলায় বলল, 'নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি।' দু'সেকেন্ড বিরতি নিল সে। 'সব কাজেই থাকি, এটাতে থাকতে অনিচ্ছা হবে কেন!'

ফিরোজা থামতেই আমপালা জানতে চাইল, 'এরপর আর কথা থাকে কি, খালেদ?'

আরও দশ সেকেন্ড একদৃষ্টে ফিরোজার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর

আমপালার দিকে ফিরল। ধীরে ধীরে মাথা দোলাল ও।

'তাহলে কাজের কথা শুরু হোক,' বলল আমপালা। 'সব কথা আগে জানতে চাই আমরা। কোথায় আছে সোনা, সঠিক পরিমাণ, সিকিউরিটি সিস্টেম...'

মাথা নাড়ল রানা। 'তার আগে টাকা-পয়সার ব্যাপারটা আলোচনা হওয়া দরকার,' বলল ও।

'টাকা-পয়সা?' যেন আকাশ থেকে পড়ল আমপালা। 'কাজের ধরনটা না জেনে সেটা আলোচনা করি কিভাবে? কতটা বিপজ্জনক, কতটা ঝুঁকি নিতে হবে, লোক লাগবে কতজন এসব না জেনে...'

'একশো টন সোনা, আগেই তো বলেছি। একটা ব্যাংকে আছে। সিকিউরিটি সিস্টেম কি রকম হবে, আন্দাজ করা যায় না? ব্যাংক থেকে ওগুলো বের করে নিশ্চয়ই পুলিসের হাতে তুলে দেব না, নিরাপদ কোথাও রাখব, তারপর ইংল্যান্ডের বাইরে নিয়ে যাব। তার আগে পর্যন্ত কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে, আন্দাজ করে নাও। সেগুলোর সমাধানও তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সেজন্যেই তো তোমাদের সাহায্য চাওয়া।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর আমপালা বলল, 'বেশ। আগে তাহলে ভাগাভাগির ব্যাপারটাই আলোচনা হোক।'

'তার কোন সুযোগ নেই,' শান্ত ভঙ্গিতে বলল রানা। 'তোমরা পারিশ্রমিক পাবে।'

'ওহ্ নো!' দ্রুত মাথা নাড়ল আমপালা। তার সঙ্গী দু'জনও অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল, তারপর মাথা নাড়তে শুরু করল। 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, খালেদ, তুমি আমাদেরকে ভুল বুঝেছ। আমরা সাধারণ ক্রিমিন্যাল নই, ভাড়াটে গুণ্ডা তো নই-ই। বড় দাঁও ছাড়া আর কিছুতে আমরা হাত লাগাই না, আর যাতে হাত লাগাই তার সবটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই। কেউ হয়তো একটু বেশি ভাগ পায়, কিন্তু বাকিরাও পারিশ্রমিক নয়, ওই ভাগই পায়।'

দোয়াম ম্যানচিনি তার শজারুর কাঁটায় হাত বুলিয়ে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, 'এমন জানলে হাতের কাজ ফেলে আসতামই না আমি!'

'ঠিক,' বলল বেলুচি পিয়ানো। 'ইদানীং এই প্রবণতা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ খুব ছোট করে দেখছে মাফিয়াকে।'

'পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাহায্য, প্রশ্নই ওঠে না,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল আমপালা।

আমপালা বা তার সঙ্গীদের দিকে নয়, একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে রোনাল্ড হার্ডি। ওদের মধ্যে এই রকম একটা প্রতিক্রিয়া হবে তা যেন সে আগে থেকেই জানত, এখন রানার ভাবটা বুঝতে চাইছে সে।

ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছে ফিরোজাও।

উত্তেজিতভাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল সা'দুল্লা, একটা হাত উঠিয়ে তাকে থামিয়ে দিল রানা। সবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওর ওপর। 'তাহলে আর কোন আলোচনা নয়,' বলল ও। শান্ত চেহারা, কিন্তু কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক কঠোর। 'রোনাল্ডের সাথে আগেই কথা হয়েছে আমার, ধরে নিয়েছিলাম তোমরাও তার কাছ থেকে জেনেছ।' চেয়ার

ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। দেখাদেখি সা'দুল্লাও।

ভাঁজ করা হাত দুটো বুক থেকে নামাল আমপালা। ঘরের পরিবেশ থমথম করছে। সাড়ে ছয় ফিট শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াতে শুরু করল বেলুচি পিয়ানো। 'বসো!' আমপালার কড়া ধমক খেয়ে আবার বসে পড়ল সে।

মুহূর্তের জন্যেও রানার ওপর থেকে চোখ সরায়নি আমপালা। 'ব্যাপারটা তুমি বোঝার চেষ্টা করো, খালেদ,' নরম সুরে বলল সে। 'কাজটা তুমি এনেছ তা ঠিক, কিন্তু আমাদের সাহায্য ছাড়া···।'

'আমাদের কোট, আমপালা,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

আরও পাঁচ সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল আমপালা। হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকাল সে, সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। 'ঠিক আছে, বসো। আমি তোমার প্রস্তাবটা শুনতে চাই।'

বসল না রানা। 'তুমি পাবে এক লাখ। তোমার লেফটেন্যান্টরা পাবে পঞ্চাশ হাজার করে। রোনাল্ডও তাই পাবে। তোমাদের যদি সহকারী লাগে, তাদের জন্যে মাথা পিছু দশ হাজার করে। সব খরচ আমার।'

'হাসব, না কাঁদব?' চেহারা বিকৃত করে পিয়ানোর দিকে তাকাল দোয়াম। 'মাত্র পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড—পাগল নাকি!'

'পাউন্ড নয়,' বলল রানা। 'ডলার।'

নিজের কপালে ঠাস করে একটা চাপড় মেরে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল পিয়ানো, চোখ বুজে ভান করল যেন জ্ঞান হারিয়েছে।

'একশো টন সোনার দাম কত, খালেদ?' আবার থমথমে হয়ে উঠেছে আমপালার চেহারা।

কথাটা মাটিতে পড়তে দিল না রানা, সাথে সাথে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমার চল্লিশ দিনের মজুরি কত, আমপালা?'

লালচে হয়ে উঠল আমপালার মুখ। দুই লেফটেন্যান্ট তার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন কোন আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধতে থাকল।

'দোয়াম, পিয়ানো,' বলল আমপালা, 'এসো তোমরা। নিজেদের মধ্যে কথা বলব।' স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল সে, তার পিছু নিল দুই লেফটেন্যান্ট। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফিরোজা। দরজার কাছে গিয়ে থামল সে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। এবার তার চোখের ভাষা স্পষ্ট পড়তে পারল রানা। তিরস্কার।

সুযোগ মত পুরো একশো টন সোনা মেরে দেয়া হবে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দশ মিনিট পর আবার চারজন ফিরে এল স্টাডিতে। রানা তার সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। সোজা এগিয়ে এসে তার কাঁধে একটা হাত রাখল আমপালা। চোখের কোণ দিয়ে রানা লক্ষ করল, ওক প্যানেল খুলে ট্রে-তে আবার ড্রিঙ্ক সাজাচ্ছে ফিরোজা।

'তুমি যা দিতে চাইছ, তার দ্বিগুণও যদি দাও,' বলল আমপালা, 'ওটা আমাদের জন্যে কোন টাকা নয়। তোমার খ্যাতি আছে, বিদেশী মানুষ, কাজেই আমাদের

কর্তব্য তোমার অসম্মান না করা। তোমার প্রতি সৌজন্য দেখিয়ে কাজটা আমরা করব বলে ঠিক করেছি, কোন লাভের আশায় নয়। তবে হাত-খরচা বলে একটা ব্যাপার আছে, সেটা যদি না দাও আমাদের অসম্মান করা হবে। অঙ্কটা দ্বিগুণ করে দাও, আমরা ধরে নিই কোন লাভ ছাড়াই তোমার একটা উপকার করে দিচ্ছি।'

ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, কেউ বসেনি, লক্ষ করছে রানাকে। ট্রে নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল ফিরোজা। রানার সাথে চোখাচোখি হয়ে যাবে এই ভয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। 'ধন্যবাদ, আমার আর চলবে না,' বলে আমপালার দিকে ফিরল রানা। বলল, 'আমার পার্টনারের সাথে আলাপ না করে আমি কিছু বলতে পারি না।' সা'দুল্লাকে নিয়ে স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল ও।

লাউঞ্জে ঢুকল ওরা। 'কি করা উচিত?' জানতে চাইল সা'দুল্লা।

'যা দিতে চাইব তার দ্বিগুণ চাইবে ওরা, এ আমি জানতাম। তাই কম করে বলেছি।'

'তাহলে আলাপ করতে এলে কেন, বললেই তো পারতে রাজি।'

'তাহলে ওদের মন খুঁতখুঁত করত,' বলে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল রানা।

পাঁচ মিনিট পর স্টাডিতে ফিরে এসে রানা বলল, 'ঠিক আছে, তাই। কিন্তু তোমার একটা কথা ফিরিয়ে নিতে হবে, আমপালা। তোমরা বিনা স্বার্থে আমাদের কোন উপকার করছ না।'

'আরে ভাই,' সরল হাসি ছড়িয়ে পড়ল আমপালার মুখে, 'ওটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ডের কথা মনে রেখে বলা। ঠি-ই-ক আছে, নিলাম ফিরিয়ে। নো ইল ফিলিংস, রাইট?'

'রাইট।' বসল রানা। ব্রীফকেস খুলে নোটের তাড়া ওর হাতে ধরিয়ে দিল সা'দুল্লা। 'ঘাম শুকোবার আগেই মজুরি, এটা আমাদের ধর্মীয় নির্দেশ। কিন্তু আমার নীতি, কাজ শুরুর আগেই টাকা। অর্ধেক টাকা এখুনি পেয়ে যাচ্ছ তোমরা সবাই, বাকি অর্ধেক কাজ শেষ হলে পাবে। প্রথমে আমপালা এদিকে এসো, নিয়ে যাও।'

এগিয়ে এল আমপালা, বলল, 'সত্যি, মানুষের মন ভোলাতে পারো বটে!' হাজার ডলারের নোট, প্রতি বান্ডিলে একশোটা করে।

রানার হাত থেকে একটা বান্ডিল নিয়ে ডেস্কের কাছে ফিরে গেল সে।

'এবার রোনাল্ড,' ডাকল রানা।

একে একে সবাইকে ডলার দেয়া হলো। সবশেষে ডাক পড়ল ফিরোজার। 'এসো, ফিরোজা।'

কিন্তু নিজের চেয়ার ছেড়ে নড়ল না ফিরোজা। রানার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

'কি হলো, খালেদের কথা শুনতে পাচ্ছ না তুমি?' ধমকের সুরে বলল আমপালা।

কলের পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল ফিরোজা। এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। তার হাতে নোটের একটা তাড়া ধরিয়ে দিল রানা। বলল, 'তোমাকে টাকা দিচ্ছি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই অপারেশনে তোমার থাকার ব্যাপারে আমার অনুমোদন আছে। বাধাও দিচ্ছি না, কারণ ব্যাপারটা তোমার আর

আমপালার ব্যক্তিগত।'

দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল ফিরোজা, কিন্তু তার ভিজে ওঠা চোখ রানার কাছ থেকে লুকাতে পারল না সে।

'দেখো না, কাজের সময় সবাইকে কেমন তাজ্জব করে দেয় ও,' ফিরোজার দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপে বলল আমপালা।

প্রসঙ্গটার ইতি টানতে চাইল রানা, বলল, 'কাজের কথা শুরুর আগে আমি শুধু জানতে চাই আমার সরল ব্যবহার, উদারতা আর খোলা মন দেখে কেউ ভেবো না আমি দুর্বল। যদি কেউ বেঈমানী করে, তাকে শাস্তি পেতে হবে—এমন শাস্তি, যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।' আপত্তি জানাবার ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছিল আমপালা, তাকে থামিয়ে দিল রানা, আবার বলল, 'আমি বলছি না, তোমরা কেউ বেঈমানী করবে। কিন্তু তবু কথাটা এই জন্যে বলা যে অনেক সময় ভুল ধারণা থেকে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে মানুষ।'

রানা থামতে আমপালা বলল, 'আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে, খালেদ। তা না হলে…'

'বিশ্বাস যে করি সেটা আমি প্রমাণ করিনি?'

ডলারের বান্ডিলটা নাড়াচাড়া করছিল আমপালা, সেটার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা করেছ। আশা করি আমরাও প্রমাণ করতে পারব ভুল লোকের কাছে সাহায্য চাওনি তুমি।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কাগজ-কলম নাও, আমপালা।'

ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসল আমপালা, দেরাজ থেকে একটা প্যাড আর কলম বের করল। প্যাডের প্রথম পাতায় লিখল, ষোলোই অক্টোবর।

কয়েকটা গোপন তথ্য ছাড়া বাকি সব কথা খুলে বলল রানা। আমপালা শুনছে আর নোট করছে। রানার কথা শেষ হতে চেয়ার ছেড়ে উঠল আমপালা, একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'ব্যাংক থেকে সরাবার পর কোথায় ওগুলো নিয়ে যাব, এর উত্তর এখুনি আমি দিতে পারি। কিন্তু তারপর কি হবে, সেটা মস্ত বড় একটা সমস্যা। একশো টন সোনা, কোথায় তুমি বিক্রি করবে? আমি বলতে চাইছি, এ-ব্যাপারেও আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব, খালেদ। ড্রাগসের ব্যবসা এখন জমজমাট, পুঁজির একশো গুণ হয়ে ফিরে আসবে লাভ।'

মেজাজ শান্তই রাখল রানা। কিন্তু দৃঢ় সুরে বলল, 'তুমি অনধিকার চর্চা করছ। ওগুলো ইংল্যান্ড থেকে বেরিয়ে যাবার পর তোমার দায়িত্ব শেষ।'

জানালার দিকে পিছন ফিরল আমপালা। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। ফিরে গেল ডেস্কের পিছনে। চেয়ারে বসে কলমটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'এরকম বড় মাপের অপারেশনের জন্যে চাই নিখুঁত একটা ডিটেইলড প্ল্যানিং। ইংল্যান্ড থেকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও ওগুলো, খালেদ?'

'সৌদি আরবে।'

'কিন্তু রাজতন্ত্রের আইন খুব কড়া,' ভুরু কুঁচকে বলল আমপালা। 'ওরা তোমার গর্দান নেবে।'

মুচকি একটু হাসল রানা। 'ওখানে আমার লোক আছে, কানেকশন আছে।

রিয়াদ এয়ারপোর্টে একবার শুধু পৌঁছুতে পারলে আমার আর কোন সমস্যা নেই।'

'একটু খুলে বলবে?'

'রিয়াদে আমরা পৌঁছুবার আগেই দুনিয়া জেনে যাবে, লন্ডন থেকে একশো টন সোনা লুঠ করা হয়েছে। প্লেন ল্যান্ড করার সাথে সাথে পুলিস সেটাকে ঘিরে ফেলবে। সারেন্ডার করতে বলা হবে আমাদের, আমরা সারেন্ডার করব। কিন্তু পরে পুলিস জানাবে, তাদের হাত থেকে আমাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'কিন্তু সোনা? ওগুলো তো প্লেনে রয়ে যাবে...'

'চেক করার জন্যে যারা প্লেনে উঠবে,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'তারা তাদের রিপোর্টে লিখবে, এক ছটাক সোনাও প্লেনের কোথাও দেখতে পায়নি তারা। এবার বলো, আয়োজনটা কেমন?'

তিন সেকেন্ড কথা বলতে পারল না আমপালা। তারপর মাথা ঝাঁকাল সে। 'সত্যি যদি এধরনের আয়োজন টেকে, ভালই বলতে হবে।'

'এর পেছনে বস্তা বস্তা রিয়াল খরচ করেছি, টিকবে না মানে!'

'কিন্তু এ তো গেল তোমার নিজের নিরাপত্তার দিকটা,' বলল আমপালা। 'আমাদের ব্যাপারে কি ভেবেছ?'

'পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমরা একটা প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপে যাব,' বলল রানা। 'সেখানে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে একটা প্লেন। ওতে চড়ে যেখানে খুশি যেতে পারবে তোমরা। প্লেনে ওঠার আগেই তোমাদের পাওনা বাকি অর্ধেক টাকা পেয়ে যাবে তোমরা।'

নিঃশব্দে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল আমপালা। 'এ ব্যবস্থা আমরা মেনে নিতে পারি না, খালেদ। তুমি আমাদের ঠকাবে, তা বলছি না, কিন্তু ধরো যদি টাকা না দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলো আমাদেরকে?' হেসে উঠল রানা। 'না, খালেদ, এতে আমরা রাজি নই। আমার পাল্টা একটা প্রস্তাব আছে।'

'শুনতে আপত্তি নেই।'

'সিসিলিতে আমার জন্ম, সেখানে আমার লোকজন আছে,' বলল আমপালা। 'রিয়াদ এয়ারপোর্টে নামলে তুমি যে-সব সুযোগ-সুবিধে পাবে, সিসিলি এয়ারপোর্টে নামলে আমি তারচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধে পাব। কাজেই সিসিলিতে নামব আমরা, পাওনা টাকা নিয়ে বাড়ির পথ ধরব। প্লেন সম্পর্কে বেশি কিছু আমি জানি না, সম্ভবত রিফুয়েলিঙের জন্যে কোথাও না কোথাও নামাতে হবে প্লেন, সিসিলিতেই নামুক। আমাদেরকে বিদায় করে দিয়ে যেখানে খুশি যেতে পারবে তোমরা।'

'কিন্তু, ধরো, তোমরা যদি যেতে না দাও? আমাদেরকে মেরে ফেলে ওগুলো যদি হজম করে ফেলার প্ল্যান করো?' মিটিমিটি হাসছে রানা।

'তোমার জায়গায় গেলে আমার বিপদ, আমার জায়গায় গেলে তোমার বিপদ, কেউ আমরা কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না,' বলল আমপালা। সে-ও হাসছে। 'এটা, এই সতর্কতা, খারাপ নয়, যেহেতু আমরা প্রফেশন্যাল। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কি?'

পিয়ানো বলল, 'ইংল্যান্ড থেকে কাছে পড়ে সিসিলি। যুক্তি যদি খাটে, তাহলে সিসিলিতেই আগে নামা উচিত।'

'খণ্ডন করো, খালেদ,' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল আমপালা।

হার মানল রানা, বলল, 'একটা ব্যাপারে এত বেশি সময় দেয়া ঠিক হচ্ছে না। ঠিক আছে, তাই। সিসিলিতেই বিদায় নেবে তোমরা।'

'ধন্যবাদ, খালেদ,' দ্রুত বলল আমপালা। 'ভাল কথা, ব্যাংকে তোমরা গেছ নাকি?'

'ভেতরে ঢুকিনি,' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তবে বাইরে থেকে দেখার লোভটা সামলাতে পারিনি। এখানে আসার পথে ব্যাংকের সামনে দিয়েই তো এলাম।'

'কি রকম দেখলে বলো।'

'পুরানো একটা বিল্ডিং, উইগমোর স্ট্রীটের আর সব বাড়ির মতই। সেন্ট ক্রিস্টোফার'স প্যালেস-এর কাছ থেকে বেশি দূরে নয়, রাস্তার উল্টোদিকে। পাঁচতলা। ব্যাংকটা যে আকারে খুব বড় হবে তা নয়। কত বড় হবে···ধরো, একটা টেনিস কোর্টের মত। গাড়ি থেকে নেমে উঁকি দিয়ে ভেতরটাও দেখেছি। আসবাব-পত্র সব আধুনিক। ফোলা পকেট নিয়ে দরজার বাইরে একজন গার্ড আছে।'

'মাত্র একজন? আর, ওগুলো রাখা আছে নিচে, একটা ভল্টে?'

'হ্যাঁ। তবে নিচে নিশ্চয়ই আরও গার্ড আছে।'

'কাজেই, প্রথম কাজ ওই ভোল্ট সম্পর্কে সম্ভাব্য সব জানা,' বলল আমপালা। 'সঠিক পজিশন, ভল্টের আকৃতি, ওটার সামনে পৌঁছুতে হলে ক'টা গেট পেরুতে হয়, কি ধরনের গেট, প্রতি গেটে গার্ড আছে কিনা, এই সব। তারপর জানতে হবে, একশো টন সোনা কতটা জায়গা দখল করে। যতদূর বুঝতে পারছি, পরিবহনই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে।'

অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল দোয়াম ম্যানচিনি, 'ভেতরে ঢোকা, ওটা আমার দায়িত্ব। যে-সব তথ্য দরকার হবে, কোথায় পাব?'

'ব্যাংকের একজন লোককে কিডন্যাপ করলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করল পিয়ানো।

'না,' বলল আমপালা। 'এরই মধ্যে লন্ডনে ইসরায়েলিরা ওদের একজন অফিসারকে হারিয়েছে···'

'ব্যাপারটা নিয়ে এখুনি ওরা উদ্বিগ্ন হবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'শুক্রবারে হিথ্রো থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি ওদের দূতাবাসে, ন্যাট ম্যানারের নামে। সোমবারে আরেকটা মারবেলা থেকে। দুটোতেই বলা হয়েছে, জরুরী কাজে স্পেনে ক'টা দিন থাকতে হবে তাকে। দূতাবাস ধরে নেবে, কোন মেয়ের পাল্লায় পড়েছে ম্যানার। মেয়েদের পিছনে ছোটা, এটা তার পুরানো রোগ।'

'ভেরি গুড,' বলল আমপালা। 'তবে বেশিদিন ওদেরকে তুমি বোকা বানাতে পারবে বলে মনে হয় না। ম্যানার টেলিফোন করছে না দেখে সন্দেহ হবে ওদের। এরপর যদি ব্যাংকের একজন কর্মচারী নিখোঁজ হয়, দুইয়ে দুইয়ে যোগ মিলিয়ে ফেলবে ওরা। সাথে সাথে পা গজাবে সোনার।'

'তাহলে তথ্যগুলো পাবার উপায় কি?' দোয়াম জানতে চাইল।

রানা বলল, 'এটা তেমন কোন সমস্যা না। একটা ব্রীফকেস নিয়ে ব্যাংকে যাব আমি। ব্রীফকেসের সাথেই ফিট করা থাকবে ক্যামেরা, কেউ জানবে না।'

'ভেরি গুড,' খুশি হলো আমপালা। 'সবার আগে অ্যাকশন দেখাবার সুযোগ পেয়ে গেছ তুমি, খালেদ।' তীক্ষ্ণ চোখে ফিরোজার দিকে তাকাল সে, চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। 'ব্যাপার কি, এখানে দেখছি কোন সিগার নেই। যাও, নিয়ে এসো—লাউঞ্জে পাবে।'

কোন প্রতিবাদ না, কোন ইতস্তত না, বাধ্য মেয়ের মত স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল ফিরোজা। এই প্রথম নয়, আগেও লক্ষ করেছে রানা, ফিরোজার সাথে প্রায়ই অভদ্র ব্যবহার করে আমপালা, মেয়েটা যেন তার কেনা দাসী। ফিরে এসে ডেস্কের ওপর সিগারের একটা বাক্স রাখল ফিরোজা। তারপর আবার তার চেয়ারে মাথা নিচু করে বসল।

সিগার ধরাচ্ছে আমপালা, রানা বলল, 'আমার একটা আইডিয়া। শুনে বলো, কাজে লাগবে কিনা। লন্ডনের হারিয়ে যাওয়া নদী সম্পর্কে তোমরা কেউ কিছু জানো?'

মাথা নাড়ল সবাই, আমপালা বলল, 'না, ব্যাপারটা কি?'

'যতদূর জানি, দুশো বছর আগে মোট আটটা নদী ছিল এখানে, সবগুলো টেমস-এ এসে মিলেছিল,' বলল রানা। 'লন্ডন শহরটা ধীরে ধীরে ওগুলোর ওপর গড়ে উঠেছে। তারপর যখন ইটের সিউয়ার তৈরি করা শুরু হলো, নদীগুলো বেশিরভাগই ওই সিউয়ার সিস্টেমের ভেতর চলে আসে। তখন সবচেয়ে বেশি নাম শোনা যেত ফ্লীট নদীর, ওটার নামেই নামকরণ করা হয়েছে ফ্লীট জেলখানার। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ভাবছি অন্য একটা নদী, টাইবার্নের কথা। হামস্টেড থেকে শুরু হয়ে মার্বেল আর্কের কাছে অকফোর্ড স্ট্রীট পেরিয়েছে ওটা, তারপর বোধহয় উইগমোর স্ট্রীটের তলা দিয়ে গেছে—হয়তো আমাদের ব্যাংকের কাছ থেকে বেশি দূর নয়।'

উৎসাহী হয়ে উঠল আমপালা। 'এত সব তুমি জানলে কিভাবে?'

'আন্ডারগ্রাউন্ড লন্ডন সম্পর্কে রিডার্স ডাইজেস্টে একটা ফিচার বেরিয়েছিল,' বলল রানা।

'কি ছিল ফিচারে?'

'সিউয়ারেজ সিস্টেম কিভাবে কাজ করে, কিভাবে পেল আজকের এই চেহারা, এই সব। শহরের নিচেটা ছোট বড় টানেলের জটিল একটা গোলকধাঁধা। সবগুলো একই স্তরে নয়। আবার; এতটুকু জায়গা নেই যা কাজে লাগানো হয়নি' রেলওয়ে ব্যবহার করেছে, বড় ধরনের সবগুলো সার্ভিস কোম্পানী ব্যবহার করছে। মাঝেমধ্যে দেখা যায়, এক কোম্পানীর এলাকায় আরেক কোম্পানী কিভাবে যেন ঢুকে পড়েছে। তখন ভুল বের করে যার যার সীমানা ঠিক করে নেয়া হয়। একজন ঠিকাদার হয়তো দেখল তার বাড়ির ভিত সরাসরি সিউয়ারেজ সিস্টেমের ভেতর ঢুকে গেছে। কিংবা সিউয়ারেজ পাইপ না সরালে কাজ চালু রাখতে পারছে না সে।'

'সন্দেহ নেই, তোমার এই জ্ঞান আমাদের সাহায্যে আসবে।'

'টাইবার্নের যে অংশটাকে সিউয়ারেজ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে আমরা নামতে পারি,' বলল রানা। 'একটু ঘুরে ফিরে দেখলে হয়তো মাটির তলা দিয়ে ব্যাংকের কাছাকাছি পৌঁছুবার একটা রাস্তা পেয়েও যেতে পারি। যেটুকু পথ বাকি থাকবে, নিজেরাই একটা টানেল তৈরি করে নেব।'

'চমৎকার, খালেদ, চমৎকার!' বলল আমপালা। 'দেরি না করে কাজ শুরু করে দাও।'

'ভল্ট সম্পর্কে নাহয় জানলাম, কিন্তু,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'তাতে কি জিরো আওয়ারে, কারও চোখে না পড়ে ব্যাংকের ভেতর ঢোকা সম্ভব হবে?'

'চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা থাকলে সম্ভব নয়। তাছাড়া, আমাদেরকে হয়তো বিস্ফোরক ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে দু'চারজনকে মেরেও ফেলতে হতে পারে। ব্যাপারটা ঘটতে হবে চোখের পলকে, হুড়মুড় করে সব ভেঙে পড়ে বিশাল একটা ধ্বংসস্তূপের আকার নেবে। সব কথা এখুনি আমি বলছি না,' মুচকি একটু হাসল আমপালা, 'কারণ ধারণাটা এখনও আমার কাছেই পরিষ্কার নয়।'

আমপালা কথা বলছে, আর ফিরোজার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। লক্ষ করল, ধ্বংস আর খুনের কথা উঠতেই আগ্রহের সাথে মুখ তুলে তাকিয়েছে মেয়েটা। তার চোখ জ্যান্ত হয়ে উঠল, কথাগুলো যেন গোগ্রাসে গিলছে। ফিরোজা সম্পর্কে আমপালা যা বলেছে, তা মিথ্যে নয়, উপলব্ধি করল রানা।

খাওয়াদাওয়ার পর আরও ঘণ্টাখানেক আলোচনা করল ওরা। ধীরে ধীরে একটা প্ল্যান আকার পেতে শুরু করল।

## চার

হিটলারী গোঁফ, চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা, মুখের ভেতর দুই গালে আঠা দিয়ে সাঁটা কাগজ, পেটে তুলোর প্যাড। গালফোলা পেটমোটা একজন ব্যবসায়ী সেজেছে রানা। ট্যাক্সি থেকে নামল তেল আবিব ক্রেডিট ব্যাংকের সামনে। চকচকে কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। একটু থেমে চারদিকে তাকাল একবার, হাতবদল করল ব্রীফকেসটা। কোটের ওপরের দুটো বোতাম খুলতে সিল্কের ব্লু ক্লাব টাই উঁকি দিল। বোতাম খোলার সময় কোটের আস্তিন সরে যাওয়ায় ঝিক্ করে উঠল সোনার ঘড়ি।

কমলা আর সাদা রঙে রাঙানো ব্যাংকের ভেতরটা। কমলা রঙের হেসিয়ান দিয়ে মোড়া দেয়াল, একই রঙের কার্পেটের ওপর সাদা লেদার চেয়ার। টেবিলগুলোয় চকচকে ক্রোমিয়াম। রানার সামনে লম্বা, সাদা, সামনের অংশ লেদার মোড়া কাউন্টার, এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে। পুরো সিলিঙে আয়না বসানো। কাউন্টার টপ থেকে ছ'ইঞ্চি পর পর চকচকে পিতলের বার উঠে গেছে সেই সিলিং পর্যন্ত। পিতলের বারের তিন জায়গায় ফাঁকগুলো

জানালা আকৃতির। তার পিছনে বসেছে কেরানী আর ক্যাশিয়াররা। তাদের পিছনে ছ'টা ডেস্ক, তার মধ্যে চারটেতে লোক আছে।

একটা জানালা বেছে নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ছোকরা কেরানী, বিশ-বাইশ বছর বয়স। 'ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে চাই,' ভারিক্কি একটা ভঙ্গি করে বলল রানা।

'ইয়েস, অফকোর্স,' টেনে টেনে উচ্চারণ করল যুবক, বোঝাই যায় ইসরায়েলি ইহুদি। 'কি জন্যে দেখা করতে চান, স্যার?'

'একটা অ্যাকাউন্ট খুলব,' বলল রানা।

'এক মিনিট, প্লীজ।' পাশের একটা দরজার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল যুবক। রানা ভাবল, অনভিজ্ঞ, ওর নামটা পর্যন্ত জানতে চাইল না। এক মিনিট পর ফিরে এসে রানার বাঁ দিকের একটা দরজা দেখাল যুবক, বলল, 'ম্যানেজার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, স্যার।'

দরজার দিকে এগোচ্ছে রানা, সেটা খুলে গেল। স্যুট পরা মধ্যবয়স্ক এক লোককে দেখা গেল। রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে স্মিত হাসল সে। 'ওয়েলকাম, স্যার। ম্যানেজার, পিয়েরী বর্গ।'

হ্যান্ডশেক করল রানা। 'কার্টজেন সাবির। হাউ ডু ইউ ডু।'

'হাউ ডু ইউ ডু। প্লীজ, ভেতরে আসুন, মি. সাবির।'

অফিসটা মনোরম ভাবে সাজানো। ডেস্কে ম্যানেজারের পারিবারিক ফটো। ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টারের বড় একটা রঙিন পোর্টরেট দেয়ালে। রানাকে বসতে ইঙ্গিত করে ডেস্কের পিছনের চেয়ারটায় বসল ম্যানেজার। 'বলুন, স্যার, আপনার কি খেদমত করতে পারি?'

নিজের সামনে ডেস্কের ওপর ব্রীফকেস রেখে খুলল রানা। একটা ম্যানিলা এনভেলাপ বের করে ব্রীফকেস বন্ধ করল, এনভেলাপটা রাখল সেটার ওপর। 'আপনাদের ব্যাংকে আমি একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই। ছোট একটা অ্যাকাউন্ট, তবে খুব তাড়াতাড়ি ক্যানাডা থেকে মোটা অঙ্কের টাকা এসে জমা হবে এতে।'

'কে...?'

'রিকমেন্ড করেছে?' ম্যানেজারের প্রশ্নটা নিজেই শেষ করল রানা, এর জন্যে তৈরি ছিল ও। একজন ইসরায়েলি ব্যবসায়ীর নাম বলল, দিন কয়েক আগে মারা গেছে যে।

'ও, হ্যাঁ, আচ্ছা, সত্যি দুঃখজনক,' সহানুভূতি প্রকাশ করল পিয়েরী বর্গ। 'কতই বা আর বয়স হয়েছিল। আপনার বুঝি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন উনি?'

'খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে শোক পালন করল ম্যানেজার, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, তা অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে...'

এনভেলাপ থেকে এক তাড়া নোট বের করল রানা। 'এ শুধু অ্যাকাউন্ট খোলার জন্যে। পাঁচ হাজার ডলার।'

রানার হাত থেকে ডলারের তাড়াটা নিল ম্যানেজার, কিন্তু গুনল না। একটা বোতামে চাপ দিল সে, জানতে চাইল, 'এক্সটারন্যাল, ন্যাচারালি?'

'ন্যাচারালি। ফুললি কনভার্টিবল। ফি মাসে টাকা তোলার দরকার হবে।'

যুবক কেরানীর হাতে ডলারগুলো তুলে দিল ম্যানেজার। 'চেক করে রেখে দাও। পাঁচ হাজার আছে।' যুবক চলে যেতে দেরাজ খুলে একটা ফর্ম বের করল সে। 'এটায় সই করুন। আপনার পাসপোর্ট, মি. সাবির?'

কোটের পকেট থেকে একটা পাসপোর্ট বের করল রানা। এটা একটা মার্কিন পাসপোর্ট, প্রচুর টাকা খরচ করে ম্যানেজ করেছে রানা। ফর্মটা সই করে পাসপোর্টসহ সেটা ম্যানেজারের হাতে ধরিয়ে দিল। ম্যানেজার ফর্ম পূরণ করল।

'লন্ডনে কোথায় আপনার সাথে যোগাযোগ করা যাবে?' পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল ম্যানেজার।

জাল পাসপোর্টের নাম নিয়ে হোটেল কিং'স প্যালেসে উঠেছে রানা, রুম নাম্বারটা জানিয়ে দিল ও।

'ফাইন।' লিখে নিল পিয়েরী বর্গ। 'কবে নাগাদ আমরা ট্রান্সফার আশা করব, মি. সাবির?'

'খুব বেশি দেরি হলে হপ্তা দুয়েকের মধ্যে। ব্যাংক ড্রাফট কিংবা টেলেক্স, দুটোর একটা হবে।'

'ডলার?'

'হ্যাঁ। প্রথম পর্যায়ে আসবে...এই ধরুন, ছয়শো হাজার ডলার বা কাছাকাছি।'

ম্যানেজারের চেহারা নির্বিকার থাকল। 'বেশ মোটা টাকা, হ্যাঁ।' উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে।

চেয়ার ছাড়ল না রানা। 'আরও একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

হাত টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বসে পড়ল ম্যানেজার। 'দুঃখিত। বলুন...'

'আমি ধরে নিচ্ছি আপনাদের এখানে সেফ-ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। তবে শুধুমাত্র বাছা বাছা কিছু ক্লায়েন্টের জন্যে।'

ব্রীফকেস খুলে কাগজ-পত্র পড়ার ভান করল রানা। সতর্ক থাকল এক কোণের বিশেষ কমপার্টমেন্টটা যেন ম্যানেজারের চোখে না পড়ে। 'কিছু দামী পাথর কিনছি আমি। ঠিক কবে, দেখে নিচ্ছি।' আরও কিছুক্ষণ কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করল ও। 'এই যে পেয়েছি। কাল বাদে পরশু। লন্ডনের কাজ কারবার একটা ব্যাংকেই সারার ইচ্ছে আমার। আপনাদের এখানে একটা বক্স ভাড়া নিতে পারব কি?'

'নিশ্চয়ই,' রাজি হলো ম্যানেজার। সাধারণ ক্লায়েন্টদের এ সুবিধে দেয়া হয় না তা সত্যি, কিন্তু ছয়শো হাজার ডলার জমা রাখতে চায় এমন একজন লোককে ঠিক সাধারণ ক্লায়েন্ট বলা যায় না।

'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি—এখানে আমাকে কেউ চেনে না, অথচ চেক না করে ঢুকতে দেয়া হলো,' বলল রানা, 'ব্রীফকেস খুলে আমি তো পিস্তলও বের করতে পারতাম? কাজেই আপনাদের সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে জানতে হবে আমার।'

মুচকি একটু হাসল ম্যানেজার। 'পিস্তল বের করলেও কোন লাভ হত না।' উঠে দেয়ালের সামনে দাঁড়াল সে। 'আপনি সৎ মানুষ, কাজেই আপনার

সমালোচনায় খুশি হয়েছি আমি। হ্যাঁ, এত টাকা যখন আমাদের ব্যাংকে রাখবেন সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে জানার অধিকার আছে আপনার।' একটা-বোতামে চাপ দিল সে। হেসিয়ান মোড়া দেয়ালের একটা অংশ, একটা আয়নাসহ, একপাশে সরে গেল। ভেতরে একটা টুলে বসে থাকতে দেখা গেল সশস্ত্র এক গার্ডকে। আয়নার দিকে আঙুল তুলল ম্যানেজার। 'দু'মুখো একটা আয়না। আমার এই অফিসে যে-ই ঢুকবে, গার্ড তাকে দেখতে পাবে। কেউ যদি কিছু করতে যায়, আয়নার ভেতর দিয়ে সরাসরি গুলি করবে ও।'

'ধন্যবাদ।'

'এখন আমরা নিচে যাব,' বলল ম্যানেজার। 'আমাদের সেফ-ডিপোজিট এরিয়া দেখার পর বুঝবেন আপনার টাকা আর মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদেই থাকবে এখানে।'

দরজা পেরিয়ে ম্যানেজারের পিছু পিছু ফোয়ায়ে চলে এল রানা, সেখান থেকে নিচে নামতে শুরু করল। বেসমেন্টে নামছে ওরা, একটু পরই সোনার কাছাকাছি আসার সুযোগ ঘটবে।

সিঁড়ির নিচেই মার্বেল পাথরের একটা হলঘর। বাঁ দিকে, সামনে ডেস্ক নিয়ে একজন গার্ড বসে আছে, তার পিছনে সাত ফিট লম্বা আর সাড়ে তিন ফিট চওড়া ইস্পাতের দরজা, দরজার দুটো তালায় চাবি ঢোকানো রয়েছে। ওদের দু'জনের সামনে, বিশ ফিট দূরে, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু আয়রন বার। বারের সামনে আরেকজন গার্ড চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আরও বিশ ফিট সামনে ইস্পাতের দেয়াল, দেয়ালের গায়ে বিশাল এক দরজা, দরজার নিচের দিকে তিনটে স্পোক লাগানো হুইল আর গায়ে এক জোড়া কমবিনেশন লক।

হার্টবিট বেড়ে গেছে রানার। তাহলে এখানেই রাখা হয়েছে সোনা!

একজন গার্ডকে কি যেন বলল পিয়েরী বর্গ, লোকটা ডেস্কের পিছনে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে সেফ-ডিপোজিট রুমের সামনে থামল সে, দরজার চাবি ঘোরাল। ব্রীফকেসটা হাতবদল করার সময় চামড়ার ভেতর লুকানো খুদে একটা বোতামে চাপ দিল রানা। পথ দেখিয়ে পিয়েরী বর্গ ওকে স্ট্রং রুমে নিয়ে যাবার আগে ছটা ফটো তুলল ও। স্ট্রং রুমের ভেতরটা আর সব ব্যাংকের যেমন হয়, তেমনি। মেটাল বক্সের দুটো পাঁচিল, প্রতিটি বক্সের গায়ে দুটো করে কী হোল।

'মি. সাবির, এবার বলুন, আপনি সন্তুষ্ট?'

চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে গাম্ভীর্যের সাথে মাথা ঝাঁকাল রানা। কাজে লাগতে পারে ভেবে স্ট্রং রুমেরও দুটো ছবি তুলল ও।

'ইচ্ছে করলে এখুনি আপনি বক্স নাম্বার পেতে পারেন,' বলল ম্যানেজার। 'একটু যদি অপেক্ষা করেন।'

'না, তার কোন দরকার নেই,' বলে স্ট্রং রুম থেকে বেরিয়ে এল ও, হলঘরের আরও কয়েকটা ছবি তুলল। 'পরশু আসছি আমি, নাম্বারটা তখনই নেব, সেদিন কিছু পাথরও রাখব বাক্সে।' সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে ওরা, ম্যানেজারকে থামাবার জন্যে তার কাঁধে একটা হাত তুলে দিল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও, দেখাদেখি ম্যানেজারও। আয়রন বারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওরা।

'সাংঘাতিক মজবুত, সন্দেহ নেই।'

সগর্বে হাসল ম্যানেজার। 'মজবুত হওয়ার দরকার আছে, মি. সাবির, দরকার আছে।'

ওপরে উঠে, বিদায় নেয়ার সময়, বাকি ফিল্মগুলোও কাজে লাগাল রানা। রাস্তায় বেরিয়ে এল গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি মাথায় করে। গলা পর্যন্ত কোটের বোতাম এঁটে দাঁড়িয়ে থাকল ও। ভাগ্য ভাল মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটা ট্যাক্সি এসে থামল সামনে।

আজ অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল ফিরোজার। গভীর রাত পর্যন্ত মাইকেল আমপালার শরীর ম্যাসেজ করতে হয়েছে তার, শুতে গিয়েছিল রাত তিনটের দিকে। ঘুম ভাঙার পর ঘড়ির দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠল সে। সাড়ে দশটা! আমপালার কড়া পড়া শক্ত হাতের মারের কথা মনে পড়তেই ভয়ে শিউরে উঠল সে।

মাঝে মধ্যে ফিরোজার ইচ্ছে হয় বাড়িতে যেখানে যত ঘড়ি আছে সব সে ভেঙে ফেলে। এই ঘড়িই তার জীবনটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ঘড়ির কাঁটা ধরে খেতে হয় তাকে, শুতে হয়, গোসল করতে হয়, দাঁড়াতে হয় আমপালার সামনে। এক-আধ মিনিট এদিক ওদিক হয়ে গেলে শাসন করে আমপালা, মাঝে মধ্যেই মারধর করে।

আমপালার কাছে আশ্রয় পাবার পর থেকেই এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে সে। তার নিজস্ব সময় বা স্বাধীন ইচ্ছে বলে কোন কিছু নেই। আমপালার বেঁধে দেয়া নিয়ম মেনে বেঁচে থাকতে হচ্ছে তাকে। কারও দিকে তাকানো নিষেধ, কোথাও যাওয়া নিষেধ। বিশেষ দু'একটা পরিস্থিতি ছাড়া প্রতি আধ ঘণ্টা পর পর আমপালার সামনে দাঁড়াতে হয় তাকে। এই বন্দী জীবনের ওপর ঘৃণা ধরে গেছে ফিরোজার। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হয় আত্মহত্যা করে। অনেক বার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়েও পারেনি। মনের ভেতর থেকে কে যেন তাকে বারণ করে, বলে এভাবে পরাজয় স্বীকার কোরো না, নিজের কাছে ছোট হয়ো না। চোখ-কান খোলা রাখো, শয়তানটার কাছ থেকে পালাবার সুযোগ একদিন আসবেই।

পালাবার চেষ্টা যে করেনি ফিরোজা, তা নয়। দু'বার চেষ্টা করেছিল, দু'বারই ধরা পড়ে গেছে। তারপর সে কি মার! সে-সব মারের কথা মনে পড়লে আজ এতদিন পরও কাঁপুনি ধরে যায় শরীরে। কোন কোন রাতে ঘুমের মধ্যে আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসে গলা দিয়ে।

বাপের বয়েসী লোক, আমপালার কাছে আশ্রয় পাবার পর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল ফিরোজার মন। কিন্তু দু'চার দিন কাটতে না কাটতে আমপালার আচার-আচরণ লক্ষ করে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তখন সে কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে, নারী-পুরুষের সম্পর্ক একটু একটু বুঝতে শিখেছে, পুরুষদের লোভী চোখ দেখে বুঝতে পারে তার সাবধানে থাকতে হবে। এই সময় স্তম্ভিত হয়ে আবিষ্কার করল, খোদ রক্ষকই ভক্ষক হতে চাইছে।

ভাগ্যিস লোকটা অক্ষম, ভাবল ফিরোজা, তা না হলে শুধু মর্যাদা নয়, সবই

তার হারাতে হত।

প্রথম দিনের ঘটনা আজও মনে আছে ফিরোজার। সেদিনই প্রথম একটা নিয়ম জারি করল আমপালা। বলল, 'এখন থেকে আমিই তোমাকে গোসল করাব।'

বোঝেনি ফিরোজা। তারপর তার হাত ধরে যখন বাথরুমের দিকে এগোল আমপালা, ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল সে। বাড়িতে আর কেউ নেই, শুধু সে আর ওই নরপশুটা, কাজেই ধস্তাধস্তি আর কান্নাকাটি করেও কোন লাভ হয়নি। এক এক করে তার পরনের কাপড় খুলে নেয় আমপালা, তাকে ধরে বুকে তুলে নিয়ে বাথটাবের সামনে দাঁড়ায়।

শুরু হলো অসহায় একটা মেয়ের ওপর বিকৃত রুচি এক জানোয়ারের অত্যাচার। আজও সে নিয়ম চলছে। বাথটাবে গোসল করে ফিরোজা, একটা চেয়ারে বসে মদ খায় আমপালা, আর অপলক তাকিয়ে থাকে।

'কি করছ?'

আমপালার গলা শুনে ছ্যাঁৎ করে ওঠে ফিরোজার বুক। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে শরীরে জড়িয়ে নেয় সে।

'গোসল করবে না?' আবার জানতে চায় আমপালা।

কথা না বলে শুধু মাথা দোলায় ফিরোজা।

'আমার দিকে তাকাও!'

তাড়াতাড়ি তাকায় ফিরোজা। দেখে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে আমপালা। বমি পায় তার, কিন্তু অনেক কষ্টে মুখের চেহারা স্বাভাবিক করে রাখে।

'এতদিন তো তোমাকে আমি গোসল করিয়েছি,' সহাস্যে বলে আমপালা, 'আজ তুমি আমাকে গোসল করাবে। জানোই তো, হাতে কাজ এলে তোমাকে নিয়ে নতুন নতুন আইডিয়া গজায় আমার মনে।'

ফিরোজা শিউরে ওঠে।

'ভাল কথা, খালেদকে কেমন লাগছে তোমার?'

'ভাল।'

'ওকে নিয়ে কোন স্বপ্ন-টপ্ন দেখছ নাকি?' বলেই হো হো করে হেসে উঠল আমপালা।

ফিরোজা চুপ করে থাকলেও, মনে মনে বলল, যার জন্যে এতদিন অপেক্ষা করছি, ও তো সে-ই। দেখেই বুঝেছি, আমাকে উদ্ধার করার জন্যে খোদা পাঠিয়েছে ওকে।

'মুসলমান, একই এলাকার লোক, দেখতেও ভারি সুপুরুষ, জানি ওর সাথে পালাবার বুদ্ধি আঁটছ তুমি,' বলতে থাকে আমপালা। 'কিন্তু সেটি হবার নয়, ফিরোজা। তোমাদের ওপর আমার নজর রয়েছে।'

খোদা, প্রার্থনা করে ফিরোজা, খালেদই যেন এই লোকের কাল হয়।

'আমাকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করার কোন চেষ্টা করলে প্রথমে কি করব জানো?' জিজ্ঞেস করল আমপালা। 'দোষ কার সে বিচার আমি করব না। প্রথমে খালেদকে জবাই করব, তারপর তোমাকে দিয়ে ওর মাংস রান্না করিয়ে তোমাকেই খাওয়াব।' হাসতে লাগল সে। 'নতুন একটা আইডিয়া, তাই না?'

কাঠ হয়ে বসে রইল ফিরোজা।

'যেজন্যে এসেছি,' বলল আমপালা। 'খালেদকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না। ওর ওপর তোমাকে নজর রাখতে হবে। ওর সাথে কোথাও পাঠাতে চাইলে, যেতে হবে তোমাকে। ওর মনের কথা জানতে চেষ্টা করবে তুমি। কিন্তু সাবধান, কোন ষড়যন্ত্র নয়। আমার লোকেরা সারাক্ষণ তোমাদের ওপর নজর রাখবে।'

মনে মনে হাসল ফিরোজা। ভাবল, নিজের পায়ে নিজেই তুমি কুড়ুল মারছ আমপালা!

'সর্বনাশ! আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল!' খটাশ করে রিসিভারটা ক্রেডলে রেখে দিয়ে বলল কোয়ায়েল হেগেন, লন্ডনে ইসরায়েলি অ্যামব্যাসাডার। তার পুরুষ সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ন্যাট ম্যানার নামে কোন প্যাসেঞ্জার শুক্রবার মালাগায় যায়নি।'

'হয়তো প্রথমে তিনি অন্য কোথাও গিয়েছিলেন,' বলল সেক্রেটারি, শরীরের ভর এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপাল সে। নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে। 'আমরা স্পেন থেকে তার টেলিগ্রাম পেয়েছি সোমবারে।'

'সম্ভাবনা কম। আমার মন বলছে লন্ডন ছেড়ে কোথাও যায়নি ও।' দ্রুত আঙুলের গিঁট গুনল অ্যামব্যাসাডার। 'আজ ছ'দিন, এই ছ'দিনে মাত্র দুটো টেলিগ্রাম পেয়েছি। কেন, ফোন করেনি কেন?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'অসম্ভব, এ আমি বিশ্বাস করি না! ম্যানার নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে।' ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা টেলিগ্রাম দুটোর ওপর চোখ বুলাল সে। প্রথমটা হিথ্রো থেকে পাঠানো হয়েছে—'হঠাৎ জরুরী কাজ পড়ায় বাইরে যেতে হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করব। ম্যানার।' দ্বিতীয় টেলিগ্রামটা এসেছে মারবেলা, স্পেন থেকে— 'দেরি হচ্ছে বলে দুঃখিত। অপ্রত্যাশিত জটিলতা দেখা দিয়েছে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে টেলিফোন করব। ম্যানার।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যামব্যাসাডার, বলল, 'ননসেন্স, তাই না? কি এমন জরুরী কাজ থাকতে পারে আমি জানব না! আর, কোথায় সেই ফোন কল? বৃহস্পতিবার এসে গেল, অথচ একটা খবর পর্যন্ত নেই। মারবেলার সব বড় হোটেলে খবর নেয়া হয়েছে, নেই সে।'

খুক্ করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল সেক্রেটারি। 'কোন গার্ল-ফ্রেন্ড...'

'এখানে যে-সব মেয়ের সাথে মেলামেশা করে তাদের প্রত্যেককে টেলিফোন করেছি আমি,' বলল অ্যামব্যাসাডার। 'কেউ কোন খবর দিতে পারছে না।'

সেক্রেটারি চুপ করে থাকল, নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

'যে-কেউ ভুয়া টেলিগ্রাম পাঠাতে পারে, কিন্তু ফোন করলে ধরা পড়ে যাবে,' বলল অ্যামব্যাসাডার। আবার মাথা নাড়ল সে। 'উঁহুঁ, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। বোধ হয় কিডন্যাপ করা হয়েছে ওকে...'

'তাহলে কেউ কিছু দাবি করছে না কেন? ভুয়া টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ব্যাপারটাকে চেপে রাখার কি দরকার?'

উঠে দাঁড়াল অ্যামব্যাসাডার। মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে ক্লান্ত সুরে বলল, 'জানি না, জানি না!' পায়চারি শুরু করল সে।

'পুলিসকে একটা খবর…'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কোয়ায়েল হেগেন। 'প্রেসকে বলা ছাড়া ব্রিটিশ পুলিস আর কি করবে? তুমি তো জানো, এধরনের পাবলিসিটি আমি ঘৃণা করি। তাছাড়া, বেচারা ম্যানারকে যদি সত্যি কিডন্যাপ করা হয়ে থাকে, পাবলিসিটিতে তার লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে।' পায়চারি থামিয়ে খানিক চিন্তা করল সে, তারপর এগোল ডেস্কের দিকে। 'না, পুলিসকে আমি কিছুই জানাব না। তারচেয়ে ডুরেলকে বলি ব্যাপারটা।'

স্যার এডওয়ার্ড ডুরেল ফরেন অফিসের আন্ডার সেক্রেটারি, কোয়ায়েল হেগেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

কোন বাধা না দিয়ে কোয়ায়েল হেগেনের কথা শুনে গেলেন স্যার ডুরেল। তারপর বললেন, 'উহুঁ, ম্যানারের চরিত্রের সাথে একেবারেই মিলছে না। ওকে আমি যতটুকু চিনি, দায়িত্বজ্ঞানহীন কোন কাজ করার লোক নয় সে। ব্যাপারটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না, হেগেন। তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক। কেউ তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই পলিটিক্যাল।'

'সেরকমই দেখাচ্ছে, তাই না? কিন্তু তাহলে কোন খবর পাচ্ছি না কেন? টেলিগ্রাম পাঠানোরই বা কারণ কি?'

'বুঝতে পারছি না। তবে এধরনের লোকেরা অনেক সময় একটু বেশি সময় নেয়। এমন হতে পারে, আমাদেরকে নার্ভাস করার জন্যেই এটা করা হচ্ছে। হয়তো, খবরের কাগজে বড় বড় হেডিঙে খবরটা দেখতে চায়।' একটু বিরতি নিলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'আমার সাথে যোগাযোগ করে ভাল করেছ, হেগেন। এখুনি এর মধ্যে পুলিসকে টেনে আনা ঠিক হবে না।'

অন্যমনস্কভাবে প্যাডের কাগজে মানুষের আকৃতি আঁকছে অ্যামব্যাসাডার। 'প্রশ্ন হলো, কি করার আছে। সে ফিরে আসবে এই আশায় তো আর বসে থাকা চলে না। আজ ছয়দিন।'

'না, তা বসে থাকা চলে না। ভাবছ আমার সাহায্য পেলে ভাল হয়, ঠিক তো?'

'হ্যাঁ, জানি তুমি সাহায্য করবে, ডুরেল।'

'ভেরি গুড।' হঠাৎ করে স্যার ডুরেলের কণ্ঠস্বর প্রত্যয়ে দৃঢ় হয়ে উঠল। 'দু'জন লোককে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। স্পেশাল ব্রাঞ্চের চেয়ে হাজার গুণ ভাল। যোগ্য, সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী। গ্যারান্টি দিতে পারব না, তা সম্ভবও নয়, তবে কেউ যদি রহস্যটা ভেদ করতে পারে তো ওরা পারবে। সব কথা বলবে ওদেরকে। টেলিগ্রাম দুটো দেখাবে। ম্যানারের বাড়ির ঠিকানা দিতে ভুলবে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

আমপালার ডেস্কের ওপর কালার প্রিন্টগুলো ছড়িয়ে দিল রানা। এখনও ভাল করে শুকোয়নি ওগুলো। একবার চোখ বুলাল আমপালা, উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। 'চমৎকার, খালেদ, চমৎকার!' একটা প্রিন্ট তুলে নিয়ে আয়রন গ্রিল আর স্টীল ভল্ট দেখল সে। 'সাতরাজার ধন আর আমাদের মাঝখানে তাহলে এগুলোই বাধা।'

রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে। 'আমার একজন এক্সপার্টকে দেখাই।'

রানার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সা'দুল্লা, ওর কাঁধের ওপর দিয়ে প্রিন্টগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। দরজা খোলার আওয়াজে দু'জনেই ঘাড় ফেরাল।

শর্টস আর ঢোলা শার্ট পরে ঘরে ঢুকল ফিরোজা, হাত দুটো পকেটে। তার দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিলল সা'দুল্লা। সরাসরি রানার চোখে তাকাল ফিরোজা, মৃদু একটু হাসল। উত্তরে রানার ঠোঁটের কোণ দুটো প্রসারিত হলো সামান্য। সোজা এগিয়ে এসে রানার পাশে দাঁড়াল ফিরোজা, প্রিন্টগুলোর দিকে তাকাল। একে একে সবগুলো দেখে বলল, 'সুন্দর। আপনার ব্রীফকেস সত্যি কাজের জিনিস।'

টেলিফোনে কথা শেষ করে রানার দিকে তাকাল আমপালা। 'আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল দেখার জন্যে কবে যাচ্ছ, খালেদ?'

'ব্যাংক থেকে ফেরার পথে প্রথম কাজটা সেরে এসেছি,' বলল রানা। 'বলেছি, টানেল নিয়ে আমি একটা ফিচার লিখব। ইন্টারভিউ দিতে রাজি হয়েছে লোকটা।'

'কে?'

'টেমস ওয়াটার বোর্ডের একজন অফিসার। লোকটা সিউয়ার এক্সপার্ট। টানেলে কেউ নামতে চাইলে তার অনুমতি ছাড়া সম্ভব নয়। একজন এম. পি.-কে দিয়ে টেলিফোন করিয়েছি।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'সাড়ে তিনটের সময় ইন্টারভিউ।'

মাথা ঝাঁকি দিয়ে চুলগুলো ঘাড়ের পিছনে সরাল ফিরোজা। এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনছিল সে। রানা থামতেই বলল, 'আমার মনে হয়, আপনার সাথে আমারও যাওয়া উচিত।'

'কেন?'

'ফিরোজা ঠিকই বলছে, খালেদ,' সায় দিল আমপালা। 'ও সাথে থাকলে তোমার সুবিধেই হবে।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি,' মৃদু হেসে বলল ফিরোজা। 'স্বীকার করেন, একজনের চেয়ে দু'জনের বুদ্ধি বেশি? যে বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছেন, সেটা সাংঘাতিক জটিল—সব প্রশ্ন হয়তো আপনার মনেও পড়বে না। তাছাড়া, জানেনই তো, মেয়েরা ঠোঁটকাটা, যে প্রশ্ন করতে আপনার বাধবে আমি সেটা অনায়াসে জিজ্ঞেস করতে পারব।'

'তাছাড়া, সুন্দরী মেয়ে দেখলে তোমার ওয়াটার বোর্ড অফিসার গলে পানি হয়ে যাবে,' বলল আমপালা। তার মুখে সরল হাসি।

শ্রাগ করল রানা। 'ঠিক আছে, যাবে ও।' ফিরোজার দিকে তাকাল। 'তোমাকে তাহলে তিনটের দিকে এখান থেকে তুলে নেব। কি পরবে তুমিই ভাল জানো, কিন্তু দেখে যেন মনে হয় তুমি আমার সেক্রেটারি।'

হেসে উঠল ফিরোজা। 'সেক্রেটারি, নাকি কো-রাইটার? সেক্রেটারি কি বেশি কথা বলতে পারবে, যতটা পারবে একজন সহ-লেখিকা?'

হেসে ফেলল রানা। 'ঠিক আছে, সহ-লেখিকা।'
বিদায় নিয়ে আমপালার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সা'দুল্লা কি যেন বলল, রানার কানে ঢুকল না। ভাবছে, বিকেলে ফিরোজা ওর সাথে একা থাকবে।

লোকটার সব কিছুই ধবধবে। সাদা চুল, গোঁফ, টুইড জ্যাকেট, এমনকি কনুই মোড়া লেদারটুকুও। গুটানো প্ল্যান শীটে প্রায় ঢাকা পড়া বড় একটা ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, খোলা একটা প্ল্যান শীট ডেস্কের ওপর ফেলে ধরে আছে। ঠোঁটে একটা জ্বলন্ত সিগারেট, খানিকটা ছাই খসে পড়ল ডেস্কের ওপর। 'এগুলোই, বুঝলেন কিনা, লন্ডনের হারিয়ে যাওয়া নদী। এক সময় গ্রাউন্ড লেভেলে ছিল, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। ইয়ং চ্যাপ, শীটের একটা দিক একটু ধরবেন? ধন্যবাদ।'
কাগজের একটা প্রান্তে একটা আঙুল রাখল রানা। আঙুলের টোকা দিয়ে ছাইটুকু ফেলে দিল ওয়াটার বোর্ডের অফিসার। কাগজের গায়ে মোটা লালচে রেখার ওপর তর্জনী রাখল, এঁকেবেঁকে এগোল তর্জনী। 'এই যে, এটা ফ্লীট নদী, এটার কথাই সবচেয়ে বেশি শুনেছে মানুষ। অবশ্য সবগুলোই এখন সিউয়ারেজ সিস্টেমের ভেতর চলে এসেছে।'
সুতী কাপড়ের স্যুট পরেছে ফিরোজা, দু'ভাঁজ করা কোটটা কাঁধের ওপর ফেলা। প্ল্যানের দিকে চোখ রেখে জানতে চাইল, 'আর সব রেখা, ওগুলো কি?'
'লাল বিন্দু দিয়ে তৈরি রেখাগুলো মেইন সিউয়ার,' বলল অফিসার, 'সরলরেখাগুলো ইন্টারসেপটিং এবং আউটফল সিউয়ার। সবুজগুলো স্টর্ম-রিলিফ সিউয়ার।'
'স্টর্ম-রিলিফ?' সবুজ রেখাগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে রানা, হাইড পার্কের ভেতর দিয়ে চলে গেছে ওগুলো।
'ওগুলো না থাকলে তুমুল বৃষ্টির সময় বন্যা দেখা দেবে, বিশেষ করে নদীর কাছাকাছি এলাকায়। গরমের দিনে, যখন বৃষ্টি খুব কম হয়, ওগুলো শুকিয়ে যায়।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। 'এমন দিনে,' কাঁধ ঝাঁকাল '...বেশ জোরাল স্রোত বইছে ওখানে। বিপজ্জনক। কেউ যদি পড়ে, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে টেমসে।'
'সর্বনাশ। আর ওই কালো রেখাগুলো?'
'ব্লকড-অফ টানেল। ওগুলো ব্যবহার করা হয় না।'
'আচ্ছা।' একটা কালো রেখার ওপর আঙুল রাখল রানা। 'ধরুন এই জায়গাটা, এটাকে কি ফল-আউট শেল্টারে রূপান্তর করা যাবে?'
'সম্ভব। যদিও নির্দিষ্টভাবে ওটা নয়—কারণ ঢোকার পথ অত্যন্ত জটিল। এটা, এটা আর এটা,' আরও তিনটে রেখা স্পর্শ করল অফিসারের আঙুল, 'এগুলোয় সহজেই যাওয়া যায়, টানেলগুলো সারফেসের কাছাকাছিও বটে, কিন্তু যথেষ্ট গভীর।'
'প্ল্যান দেখে আপনি কিভাবে বলেন কোনটায় ঢোকা সহজ আর কোনটায় সহজ নয়?' জিজ্ঞেস করে মধুর একটু হাসল ফিরোজা। প্রৌঢ় অফিসারের চোখ

সুযোগ পেলেই তার শরীরের এখানে সেখানে বিঁধছে, লক্ষ করেছে সে।

'আসলে প্ল্যান দেখার আমার কোন দরকার করে না,' বলল অফিসার। 'গোটা সিস্টেমটাই আমার মুখস্থ। লে-ম্যানদের জন্যে এন্ট্রি পয়েন্টগুলো মার্ক করা আছে। সবুজ বাক্সগুলো দেখেছেন?' একটা বাক্সের ওপর আঙুল রাখল সে। 'এটা একটা আশ্চর্য এন্ট্রি পয়েন্ট। স্যাভয় হোটেলের কিচেন এই এন্ট্রি পয়েন্টের একেবারে গা ঘেঁষে।'

'মোস্ট ইন্টারেস্টিং,' বলল রানা। 'কিন্তু বলুন দেখি, সারফেসের সাথে এই প্ল্যান মেলাব কিভাবে? কিছু কিছু মিল বোঝা যায়। টেমস নদী পরিষ্কার দাগানো রয়েছে, মেইন রোডগুলোও চিনতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু আরও বিশদভাবে যদি বুঝতে চাই? ধরুন পুরানো নদী টাইবার্ন সম্পর্কে যদি লিখতে চাই আমরা?'

'টাইবার্ন, তাই না?' উৎসাহী হয়ে উঠল অফিসার। 'ইন্টারেস্টিং, দ্যাট ওয়ান।' প্ল্যানের কোণ থেকে আঙুল তুলে নিল সে, লাফ দিয়ে সেটা ফিরে গেল রানার হাতে। ঘরের এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল অফিসার, ওখানে একটা বাক্সে দাঁড় করানো রয়েছে গুটানো টিউব আকৃতির কাগজ। নাড়াচাড়া করে একটা রোল বেছে নিল সে। ডেস্কের কাছে ফিরে এসে মেলে ধরল কাগজটা। 'দেখতেই পাচ্ছেন, এটা আসলে সিটি আর ওয়েস্ট এন্ডের ম্যাপ, এর ওপর সিউয়ার আর টানেল আঁকা আছে, কাজেই কোত্থেকে কোথায় গেছে ওগুলো বুঝতে কোন অসুবিধে হবে না। এখানে, এটা হলো টাইবার্ন।' স্পষ্ট, সবুজ একটা রেখার ওপর আঙুল চালাল সে। পার্ক রোডের নিচ দিয়ে চলে গেছে রেখাটা, রিজেন্টস পার্কের কিনারা ঘেঁষে, বেকার স্ট্রীট ধরে খানিকটা অংশ এগিয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, একটা শাখা খানিকটা পুব দিকে বেঁকে গিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রীট পেরিয়েছে, তারপর সোজা এগিয়ে গ্রীন পার্কের নিচ দিয়ে টেমস নদীতে পড়েছে, ফক্সহল ব্রিজের কাছে। 'টাইবার্ন আমার প্রিয় নদী। এর একটা ঐতিহ্য আছে। মার্বেল আর্কে ফাঁসি দেয়ার একটা জায়গা ছিল, নদীর নামে নাম ছিল টাইবার্ন। নদীটার নাম এখন বদলে গেছে। এখন টাইবার্নকে আমরা কিং'স স্কলারস' পন্ড সিউয়ার বলি।'

চোখের পলক না ফেলে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে আছে রানা আর ফিরোজা, তথ্যগুলো মনের পর্দায় গেঁথে নিচ্ছে দু'জনেই। ডান দিকে বেঁকে গিয়ে পুরানো টাইবার্ন যেখানে উইগমোর স্ট্রীট পেরিয়েছে, সেখানে তাকাল রানা। ওই পয়েন্টের কাছাকাছি একটা কালো রেখাও দেখল ও। তারমানে পাশেই রয়েছে একটা টানেল যেটা ব্যবহার করা হয় না। ব্যাপারটা ফিরোজা-ও লক্ষ করল।

কালো রেখার ওপর লাল নখ ছোঁয়াল সে, জানতে চাইল, 'দেখতে পাচ্ছি টাইবার্নের পাশেই খালি একটা টানেল রয়েছে, সিউয়ার থেকে কি ওখানে পৌঁছানো সম্ভব?'

'খুব সম্ভব,' ফিরোজার পাশে দাঁড়িয়ে সেন্টের গন্ধ নিল অফিসার। 'ওখানে আপনি যে-কোন জায়গা থেকে যে-কোন জায়গায় যেতে পারবেন।'

'তাহলেই জিজ্ঞেস করতে হয়,' ডেস্কের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে অফিসারের গায়ে ফিরোজার গা ঠেকে গেল, 'আমরা নামব কিভাবে?'

'কেন, ম্যানহোল দিয়ে। নীল বাক্সগুলো দেখছেন? এই যে এখানে একটা,

ডিউক স্ট্রীটে। ওটা দিয়ে প্রায় সোজা আপনি নেমে যেতে পারবেন কিং'স স্কলারস' পন্ড সিউয়ারে। খালি টানেলটা আরও নিচু স্তরে, তবে ওটার কাছ থেকে বেশি দূরে নয়।'

'এখন ধরুন,' সোজা হলো ফিরোজা, সরাসরি অফিসারের চোখে তাকাল, 'রিসার্চের প্রয়োজনে আমরা যদি ওখানে নামতে চাই, তার কি ব্যবস্থা?' রানার দিকে তাকাল সে, ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি বলো, ডারলিং? টানেলে নামতে তোমার ভয় করবে?'

'ভয় করলেই বা কি, রিসার্চ ছাড়া তো আর ফিচারটা লিখতে পারছি না,' বলল রানা। 'আমার মনে হয়, ওই নিচে থেকেই কাজ শুরু করতে পারি আমরা।'

অফিসারের দিকে ফিরল ফিরোজা। 'মি. রিগ, ব্যাপারটা এখন আপনার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। আপনি কি পারবেন আমাদের নিচে নামার ব্যবস্থা করতে? নাকি আরও হোমরাচোমরা কারও পায়ে তেল মাখতে হবে?'

মাথার পিছনটা চুলকাতে শুরু করল অফিসার। 'কি জানি...ঠিক বুঝতে পারছি না। অনুমতির কথা যদি বলেন, সেটা আমি ছাড়া আর কারও দেয়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা...জায়গাটা মোটেও নিরাপদ নয়, বুঝলেন কিনা। দুর্গন্ধে মাথার মগজ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে চায়। তাছাড়া, এই আবহাওয়ায়, হঠাৎ যদি একটা ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়, টানেলগুলো খরস্রোতা পাহাড়ী নদী হয়ে উঠবে এক একটা। জানেন না, বহু মানুষ মারা গেছে...'

'কিন্তু, কিন্তু, মি. রিগ,' কোমরে হাত রেখে আবেদনের সুরে বলল ফিরোজা, 'ওখানে যে আমার যেতেই হবে। প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা না হলে আমরা লিখব কি, বলুন? আপনি বলতে চাইছেন, নির্দিষ্ট ওই পয়েন্টে বিপদের ভয় খুব বেশি?'

চেহারায় চিন্তার ভাব নিয়ে ম্যাপের দিকে ফিরে তাকাল অফিসার। 'না, তা নয়। কিং'স স্কলারস' অত্যন্ত গভীর আর চওড়া। ওটা পানিতে ভরে যাবে, তা সম্ভব নয়, কারণ কাছেপিঠে স্টর্ম-রিলিভ সিউয়ার রয়েছে। তাছাড়া, প্রচুর জায়গা, কাজেই ঝাঁঝও অতটা থাকবে না। ছোট, ইন্টারসেপটিং টানেলে তো টেকাই দায়। তবে ইঁদুর আছে।'

চোখে রাজ্যের মিনতি ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকল ফিরোজা। 'প্লীজ?'

'আসল কথা আবহাওয়ার ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করে,' বলল অফিসার। 'আপনারা সামান্য একটু ঝুঁকি নেন, তাও আমি চাই না। তা কখন নামতে চান?'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কি উপকার যে হবে আমাদের! নামতে চাই...যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আরও কত কাজ, এই ঝামেলাটা আগে সারতে চাই। কাল হলে কেমন হয়?'

'দাঁড়ান, দেখি,' বলে ডেস্ক থেকে একটা নোট বুক তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাল অফিসার। 'না, কাল সম্ভব নয়। মীটিং আছে। আবহাওয়া ভাল থাকলে পরশুদিন। চলবে তো?' উত্তর দিচ্ছে রানার কথার, কিন্তু তাকিয়ে আছে ফিরোজার দিকে।

'চলবে,' বলল ফিরোজা। 'সময়টাও জানিয়ে দিন, প্লীজ।'

'এগারোটায় চলে আসুন এখানে। ওয়াটার বোর্ডের একটা ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা। ইকুইপমেন্ট যা যা দরকার হবে, সব পাওয়া যাবে ওতে।

প্রোটেকটিভ হ্যাট, ড্রেস। ব্রিদিং অ্যাপারাটাস লাগবে না। তাহলে সেই কথাই রইল? পরশু এগারোটায়।'

হ্যান্ডশেক করার সময় অফিসারকে অনেকক্ষণ ওর হাত ধরে রাখার সুযোগ দিল ফিরোজা।

বাইরে বেরিয়ে এসে মার্সিডিজের দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা, গাড়িতে ওঠার আগে অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল ফিরোজা, কিন্তু কিছু বলল না। দরজা বন্ধ করল রানা, মার্সিডিজের নাক ঘুরে আরেক দিকের দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড়, তবু রানার চোখে ধরা পড়ে গেল কালো বুইকটা। পিছু নিয়েছে। না তাকিয়েও বুঝল, ওর দিকে চেয়ে আছে ফিরোজা। বাকিংহাম প্যালেস রোডে পৌছুল মার্সিডিজ, তারপর বাকিংহাম গেট রোডে। ভিড় একটু কম এদিকে। 'লক্ষ করলাম,' আরবীতে বলল রানা, 'দু'বারই গাড়ির দরজা খুলে ধরায় অবাক হয়ে তাকালে আমার দিকে। ব্যাপারটা কি বলো তো?'

একটু যেন অপ্রতিভ দেখাল ফিরোজাকে। আরবীতেই জবাব দিল সে, 'না…মানে, আমপালা কখনও তা করে না…'

কোন মন্তব্য করল না রানা। খানিক পর জানতে চাইল, 'এতক্ষণ বকবক করে তোমার নিশ্চয় গলা শুকিয়ে গেছে?'

কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করছে ফিরোজা। 'উঁ? না।'

গ্রসভেনর প্যালেস পেরিয়ে এল মার্সিডিজ, হাইড পার্ক কর্নারের দিকে এগোচ্ছে। আবার মুখ খুলল রানা, 'কাজ বেশ একটু এগিয়েছে, কি বলো? আমপালা খুশি হবে।'

'হ্যাঁ,' বলল ফিরোজা। এখনও অন্যমনস্ক সে। 'ফোন করে সব জানাতে বলেছে।'

'ফোন করবে? মানে?'

'ও, আপনি তাহলে…'

'ওখানে ডারলিং বললে, এখন আবার আপনি কেন?'

সলজ্জ একটু হাসি দেখা গেল মেয়েটার ঠোঁটে।

'আমপালা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'এতক্ষণে বোধ হয় রওনা হয়ে গেছে সে,' বলল ফিরোজা। 'সিসিলিতে যাচ্ছে ও, কাল রাতের আগে ফিরবে না।'

খবরটা শুনে একটু গম্ভীর হলো রানা। 'তোমাকে তাহলে আমপালার বাড়িতে পৌছে দিই?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ,' বলল ফিরোজা। পরমুহূর্তে রানার হুইল ধরা একটা হাত খামচে ধরল সে। ঝট করে ফিরল রানা। নার্ভাস, অস্থির দেখাল ফিরোজাকে। তার নখ রানার মাংসে ঢুকে যাচ্ছে। 'খালেদ, দূরে কোথাও নিয়ে যাবে আমাকে? নিরিবিলি কোথাও? তোমার সাথে আমার জরুরী কথা আছে…'

'কি কথা? কোথায় যেতে চাও?' অবাক হলো রানা।

'আগে দূরে কোথাও নিয়ে চলো আমাকে,' কিছুই ঘটেনি অথচ হাঁপাতে শুরু

করেছে ফিরোজা। 'তুমি টের পাওনি, আমপালার লোকেরা আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'ওদেরকে ফাঁকি দেয়া কঠিন নয়,' বলল রানা। 'কিন্তু আমপালার কানে কথাটা যাবে। তখন?'

'এর আগে দু'একবার ওদের চোখ ফাঁকি দিয়েছি আমি,' বলল ফিরোজা, 'কিন্তু আমপালা আমাকে কিছু বলেনি। তারমানে ওর লোকেরা নিজেদের ব্যর্থতার কথা ওকে জানায় না।'

'সব সময় চোখে চোখে রাখে তোমাকে? কেন?'

'যদি পালিয়ে যাই, তাই। আমি ওর হাতে বন্দী, খালেদ।'

কৌতূহল চেপে রাখল রানা, আগে কালো বুইকটাকে খসাতে হবে। সন্ধে হয়ে আসছে, বেশি সময় নষ্ট করা যায় না, কাজেই ওদেরকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে সহজ একটা উপায় বেছে নিল ও। একটা রেস্তোরাঁর সামনে মার্সিডিজ দাঁড় করাল, দ্রুত নেমে পড়ে ফিরোজাকে নিয়ে ঢুকল ভেতরে। বসল না, পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সরু একটা গলিতে। মেইন রাস্তায় এসে ট্যাক্সি নিল ওরা, ড্রাইভারকে বলল, 'ওয়ালটন স্ট্রীট।' ফিরোজার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ডিনার খেতে আপত্তি নেই তো? আমার খিদে পেয়েছে।'

মিটার চালু করে দিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

'আপত্তি—না। তোমার গাড়ির কি হবে?'

'ডিনার খেয়ে তোমাকে আগে পৌঁছে দেব বাড়িতে, তারপর মার্সিডিজ আনতে যাব।'

'ওরা যদি তোমাকে…'

'আমার সাথে লাগতে এলে ওদের আমি পিটিয়ে তক্তা বানাব।'

ফিক করে হেসে ফেলল ফিরোজা। আমপালার লোককে কেউ মারতে পারে, শুনতেও ভাল লাগল তার।

খাবারের দাম খুব বেশি, তাই স্টারলিট রেস্তোরাঁয় ভিড় হয় না। ভেতরে ঢুকে এক কোণের একটা টেবিলে বসল ওরা। 'তুমি যা খাবে আমিও তাই খাব,' বলল রানা, কাজেই অর্ডার দিল ফিরোজা।

রেস্তোরাঁর ভেতরটা প্রায় অন্ধকারই বলা যায়, দু'একটা টেবিলে শুধু একজোড়া করে মোমবাতি জ্বলছে। বেশিরভাগ টেবিলে লোকও নেই, মোমও জ্বলছে না। জরুরী কথা বলবে বলে এল বটে, কিন্তু রেস্তোরাঁয় ঢোকার পর থেকে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ফিরোজা। চেহারা দেখে মনে হলো, কথা বলার মূড নেই।

'কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঁ?'

'কি যেন বলবে বলছিলে না?'

'ভাবছি তোমাকে আবার বিপদে ফেলা হবে না তো? কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না, শুধু শুধু কেন তোমাকে…'

'তোমার ব্যাপারে কৌতূহল আছে আমার,' বলল রানা। 'সাহায্য না-ই

চাইলে, কৌতূহলটা মেটাতে পারো।'

মুখ তুলল ফিরোজা। 'কি জানতে চাও তুমি?'

'সেদিন তোমার কথা যা বলল আমপালা, সব সত্যি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিস মেরেছ?'

অসহায় একটু হাসি দেখা গেল ফিরোজার ঠোঁটে। 'মিথ্যে কথা,' বলল ও। 'শুনলে না, বলল, গোলাগুলিতে আমরা দু'জন ছাড়া আর সবাই মারা পড়েছে? তারমানে ঘটনার সত্যি মিথ্যে জানার কোন উপায় রাখল না। মানুষ আমি মেরেছি, সে ক্যাম্পে থাকতে। যাদের মেরেছি তারা আমার জন্ম-শত্রু ছিল, ইসরায়েলি। তবে লন্ডনে আসার পর থেকে আমপালার প্রতিটি কুকর্মে আমাকে থাকতে হয়, ও আমাকে জোর করে রাখে।'

'সেদিন তাহলে প্রতিবাদ করোনি কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ফিরোজা, তারপর বলল, 'আমি আর মার খেতে চাই না, খালেদ।'

'তোমাকে···?'

'আমার পিঠ দেখতে চাও?'

কঠোর হয়ে উঠল রানার চেহারা। একটু পর বলল, প্রায় আদেশের মত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর, 'সব আমাকে খুলে বলো তুমি।'

'ওয়েটার আসছে,' ফিসফিস করে সাবধান করে দিল ফিরোজা।

টেবিলে ডিনার সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল ওয়েটার।

খেতে শুরু করল ওরা, কেউ কথা বলছে না। প্লেটে লেগে কাঁটা-চামচ আর ছুরি টুং-টাং আওয়াজ করছে শুধু। তারপর হঠাৎ করেই নিচু গলায় শুরু করল ফিরোজা, 'লেবাননের ক্যাম্প থেকে চল্লিশ হাজার ডলার দিয়ে আমাকে কিনে নিয়ে আসে আমপালা···।'

প্রায় আধঘণ্টা ধরে বলে গেল ফিরোজা। বলতে বলতে কখনও সে রাগে কেঁপে উঠল, কখনও তাকে অসহায়, দিশেহারা দেখাল, আবার কখনও ছলছল করে উঠল চোখ।

প্যালেস্টাইনী রিফিউজিদের একটা ক্যাম্পে জন্ম ফিরোজার। ছোটবেলাটা তার ওই ক্যাম্পেই কেটেছে। এগারো বছর বয়সে গেরিলা ট্রেনিং নেয় ও। ওর মা আর ওকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল বাবা। আশপাশের গ্রাম থেকে খাবার চুরি করে আনত ওর মা, তা না হলে মা-বেটির বেঁচে থাকাই দায় হত। ক্যাম্পের আশপাশে লম্পট লোকের অভাব ছিল না, গভীর রাতে তারা ওর মাকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যেত, সকাল বেলা হাতে কিছু খুচরো পয়সা নিয়ে ফিরে আসত মা। ফিরোজা তখন খুব ছোট, তাই রাতে বিছানা ছেড়ে মা উঠে গেলে মনে মনে খুশি হত ও, জানত কাল সকালে কিছু একটা পড়বে পেটে।

ফিরোজার ট্রেনিং শেষ হয়েছে মাত্র, এই সময় ফিরে এল বাবা। লোকজন জড়ো করল সে, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে বলল, সীমান্ত পেরিয়ে ইসরায়েলি সীমান্ত রক্ষীদের ঘাঁটিতে হামলা চালাবে তারা। ওদের বারো জনের সাথে ফিরোজাও গেল।

সীমান্ত পেরিয়ে ইসরায়েলে ঢুকল ওরা, ঘাঁটিতে হামলাও চালাল, কিন্তু পিছু হটে ফিরে আসার সময় দু'ভাগ হয়ে গেল দলটা। তিনজন পুরুষ গেরিলার সাথে ইসরায়েলে আটকা পড়ে গেল ফিরোজা। সীমান্ত পেরিয়ে লেবাননে ফেরা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ভেতর দিকে সরে গেল ওরা। কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকল এক পাহাড়ে।

প্রাণের ওপর তখন ওদের মায়া ছিল না, চারজনের দলটা সুইসাইড স্কোয়াড হিসেবে কাজ শুরু করল। পাহাড়ের একটা গুহাকে আস্তানা বানিয়ে ওখান থেকে প্রতিদিনই ওরা বেরুতে লাগল। একের পর এক অপারেশন চালাল ওরা। অনেক পুলিস, রক্ষী, আর স্থানীয় রাজনীতিককে মারল ওরা, ব্যাংক লুঠ করল চারটে, তিনটে গুদামে আগুন ধরিয়ে দিল, সব বলে শেষ করা যাবে না। পরের বছর সীমান্ত পেরিয়ে আবার ইসরায়েলে ঢুকল ওর বাবা, মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে। ফেরার সময় ইসরায়েলি সীমান্ত রক্ষীদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হলো ওদের। বাবাকে হারাল ফিরোজা। ক্যাম্পে ফিরে এসে শুনল মাস তিনেক আগে ক্যাম্প ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে মা। কেউ কেউ বলল, সে বেঁচে নেই। এই ক্যাম্পেই প্রথম আমপালাকে দেখে ফিরোজা।

'প্যালেস্টাইনীদের ক্যাম্পে আমপালা কি করছিল?' জানতে চাইল রানা।

ফিরোজা জানল, আমপালার কাছ থেকেই ওর বাবা গেরিলাদের জন্যে অস্ত্র আর গোলা-বারুদ কিনেছে। ফিরোজার সাথে দেখা করে আমপালা তাকে বলল, 'তোমার বাবার কাছে চল্লিশ হাজার ডলার পাই আমি।' ফিরোজা খুব ঘাবড়ে গেল। আমপালাকে সে বলল, এত টাকা কোত্থেকে বাবা যোগাড় করবে বলে ভেবেছিল আমি জানি না। খেতেই পায় না, গেরিলারাই বা কোত্থেকে টাকা ম্যানেজ করবে!

না, ফিরোজার কথা শুনে রাগ করেনি আমপালা। কাঁধ ঝাঁকাল সে, বলল, 'তোমার বাবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সে যখন মারা গেছে, তার কাছে আমি টাকা চাইতে পারি না। কিন্তু ইসরায়েল থেকে তোমাকে আনতে যাবার সময় সে যে আমাকে বলে গিয়েছিল, তার কিছু হলে আমি যেন তোমাকে দেখি, তার কি হবে?' কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে ছিল ফিরোজা। আমপালা আবার তাকে বলল, 'তুমি আমার মেয়ের মত। তোমাকে তো আমি এই জঘন্য পরিবেশে একা ফেলে রেখে চলে যেতে পারি না। আমি বিয়ে করিনি, আত্মীয়-স্বজন নেই, যা রোজগার করেছি সাত পুরুষ বসে খেলেও ফুরাবার নয়, তুমি মা আমার সাথে লন্ডনে চলো।' ফিরোজা কিছু বলছে না দেখে আমপালা আবার বলল, 'তুমি যদি যেতে না চাও, আমি তাহলে জোর খাটাব।' কথাটা সে বলল আদর করে, হাসতে হাসতে। ফিরোজা বোকার মত তাকিয়ে আছে দেখে আবার মুখ খুলল আমপালা, 'তুমি আমার সাথে গেলে মনে করব আমার চল্লিশ হাজার ডলার আমি পেয়ে গেছি। আর যদি না যাও, তাহলে দাবি জানাব টাকাটা তোমরা, গেরিলারা শোধ করবে। আমার কাছে কাগজ-পত্র আছে, প্রমাণ করতে পারব তোমরা আমার কাছ থেকে বাকিতে অস্ত্র কিনেছ।' এসব কথা সিরিয়াসলি বলেনি আমপালা, ফিরোজাও

সিরিয়াসলি নেয়নি। এরপর আমপালা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, এটা একটা অসম যুদ্ধ, প্যালেস্টাইনীরা কোনদিনই জিততে পারবে না, ওদের আলাদা একটা মাতৃভূমির স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্নই থেকে যাবে। ফিরোজা দেখল, তার কথায় যুক্তি আছে। ওর বাবা মারা যাওয়ায় গেরিলারাও আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছিল, চারদিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল বিশৃঙ্খলা আর রেষারেষি। ভেবেচিন্তে আমপালার সাথে লন্ডনে চলে আসবে বলেই ঠিক করল ফিরোজা।

লন্ডনে আসার কিছুদিন পরই প্রচণ্ড বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করল সে, আমপালা মানুষ নয়, আস্ত এক জানোয়ার। ফিরোজাকে সে জানাল, 'বছরে তোমার বেতন ধরা হলো পাঁচশো পাউন্ড। মানে প্রায় হাজার ডলারের মত। কিন্তু যতদিন না চল্লিশ হাজার ডলার শোধ হয় ততদিন তুমি কোন বেতন পাবে না, বেতনের সবটাই কেটে রাখা হবে। সোজা কথায়, চল্লিশ বছরের জন্যে তোমাকে আমি কিনে নিয়ে এসেছি।'

'সেই থেকে আমি বন্দী জীবন কাটাচ্ছি, খালেদ,' ম্লান গলায় বলল ফিরোজা। 'ঘড়ির কাঁটা ধরে বেঁচে থাকতে হয় আমাকে। হুকুম না মানলে মেরে পিঠের ছাল তুলে নেয়।'

'বাস্টার্ড!' হিস হিস করে উঠল রানার কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ আবিষ্কার করল ওরা, কেউই তেমন কিছু খায়নি, প্রায় সবই পড়ে আছে প্লেটে।

'এখন তুমি কি করতে চাও, ফিরোজা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'শুনেছি মা আবার ফিরে গেছে ক্যাম্পে,' বলল ফিরোজা। 'পঞ্চাশের ওপর বয়স, সারাদিন পাথর ভেঙে একবেলা খেতে পায়। খালেদ, মা ছাড়া আমার আর এ দুনিয়ায় কেউ নেই।'

'আমি আছি,' মনে মনে বলল রানা।

ফিরোজা বলে চলেছে, '...এই বন্দী জীবন থেকে কেউ যদি আমাকে মুক্তি দিতে পারত, মার কাছে ফিরে যেতাম আমি।' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে। 'জানি, এটা আমার দিবাস্বপ্ন, কেউ কারও নিয়তি খণ্ডাতে পারে না...'

ফিরোজার শেষের কথাগুলো শুনতে পেল না রানা। ওর কানে শুধু বাজছে—'কেউ যদি আমাকে মুক্তি দিতে পারত, মার কাছে ফিরে যেতাম আমি। কেউ যদি আমাকে...' একই কণ্ঠস্বর, বারবার। হঠাৎ বেসুরো গলায় জোর করে হেসে উঠে প্লেটের ওপর এক রকম ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করায় বিষম খাওয়ার মত অবস্থা হলো ওর। পানিতে ভরে উঠেছে চোখ, ফিরোজার কাছে ধরা পড়তে চায় না।

## পাঁচ

নরম গদি মোড়া চেয়ারে হেলান দিলেন স্যার এডওয়ার্ড ডুরেল, পায়ের ওপর পা

তুলে দিয়ে ক্ষুরধার ট্রাউজারের ভাঁজ ঠিকঠাক করে নিলেন। খোলা জানালাটা তাঁর বাঁ দিকে, সকালের বাতাস লাগা ইসরায়েলি পতাকার একটা প্রান্ত মাঝে মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। এই মুহূর্তে তাকিয়ে আছেন শক্ত-সমর্থ চেহারার জো ফিশারের দিকে। ডকুমেন্ট কেস থেকে একটা নোট বুক বের করল ফিশার।

ডেস্কের পিছন থেকে চুরুটের বাক্স নিয়ে এগিয়ে এল অ্যামব্যাসাডার কোয়ায়েল হেগেন, অফার করল স্যার ডুরেলকে। বাক্স থেকে একটা চুরুট তুলে নিলেন স্যার ডুরেল। হেগেন তাঁর চুরুটে আগুন ধরিয়ে দিল।

'হিথ্রো টেলিগ্রাম অফিসে গিয়েছিলাম আমি,' বলল ফিশার। 'শুক্রবারে একটা মেয়ের ডিউটি ছিল। তার সাথে কথা হয়েছে আমার। কিন্তু দূতাবাসে যে লোকটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে তার চেহারা মনে করতে পারেনি সে। মারবেলাতেও খবর নেয়া হয়েছে, চেহারার বর্ণনা তারাও দিতে পারেনি।'

'সংক্ষেপে সারো,' নির্দেশ দিলেন স্যার ডুরেল।

'দূতাবাসের ব্রিটিশ গার্ড জ্যাকব বলছে সেদিন পৌনে দশটার সময় ন্যাট ম্যানারকে দেখেছে সে,' বলল ফিশার। 'দূতাবাস পর্যন্ত হেঁটে এসেছিলেন তিনি, রোজ যেমন আসেন। পনেরো মিনিট আগে থেকে দূতাবাসের সামনে একটা ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে ছিল। মি. ম্যানার দূতাবাসের কাছে আসতে ক্যাডিলাক থেকে একজন শোফার বেরিয়ে এসে তাঁর সাথে কথা বলে। ক্যাডিলাকে একজন আরোহী ছিল কিন্তু তাকে জ্যাকব দেখতে পায়নি। শোফারের সাথে কথা বলার সময় মি. ম্যানারকে চিন্তিত বা সন্ত্রস্ত দেখায়নি, তাই ঘটনাটাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করে জ্যাকব। তবে শোফারকে তার চেনা চেনা লেগেছিল। কিন্তু তখন ঠিক চিনতে পারেনি।'

'তারপর?'

'ক্যাডিলাকে চড়ে মি. ম্যানার চলে যাবার পর ব্যাপারটা ভুলে যায় জ্যাকব,' বলল ফিশার। 'কিন্তু আমি তাকে ঘণ্টা দুয়েক জেরা করার পর, হঠাৎ তার মনে হয়, শোফারকে সে চেনে।'

'কে?'

'লন্ডনের এক কুখ্যাত গুণ্ডা,' বলল ফিশার। 'জ্যাকব পুরোপুরি নিশ্চিত নয়, তবে বলছে, লোকটার জ্যাক হার্ডি হবার সম্ভাবনা শতকরা আশি ভাগ।'

এবার স্যার ডুরেল কথা বললেন, 'জ্যাক আর রোনাল্ড হার্ডি দু'ভাই। জ্যাক মহাহারামী, রোনাল্ডও কম না। কিন্তু ওদের রেকর্ড বলছে, পলিটিক্যাল কোন ব্যাপারে নিজেদেরকে ওরা এর আগে জড়ায়নি।'

'ইচ্ছে করলে জ্যাককে কেউ ভাড়া করতে পারে?'

'তা তো পারেই,' বললেন স্যার ডুরেল। 'কিন্তু ম্যানারকে কিডন্যাপ করার জন্যে কেন কেউ ওকে ভাড়া করতে যাবে? ধরো, সম্ভাবনার কথা বলছি, প্যালেস্টাইনী কোন টেরোরিস্ট গ্রুপ ম্যানারকে কিডন্যাপ করতে চাইল। তারা কাউকে ভাড়া করতে যাবে কেন? এ-কাজে প্রফেশন্যালদের চেয়ে যোগ্য লোক রয়েছে না ওদের!'

'হ্যাঁ, তা রয়েছে।' হতাশায় ম্লান দেখাল হেগেনকে।

'দিনকাল যা পড়েছে, কেউ আর এখন নিরাপদ নয়। আমিও না।'

'তোমার এই সাহায্যের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, ডুরেল,' বলল অ্যামব্যাসাডার। 'কিন্তু ম্যানারের ব্যাপারে ঠিক কোথায় রয়েছি কিছুই ঠাহর করতে পারছি না।'

'আমার সহকারী ইস্ট এন্ডে খোঁজ-খবর নিচ্ছে,' বলল ফিশার। 'জ্যাক হার্ডির আস্তানাটা ওদিকেই। তাকে ধরতে পারলে আশা করি অনেক রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে।'

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি,' তাগাদা দিল হেগেন। 'এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, স্যার,' বলে উঠে দাঁড়াল ফিশার।

ব্রডওয়ে এস-ডব্লিউ-ওয়ান, টেমস ওয়াটার বোর্ড অফিস। ঠিক এগারোটায় পৌঁছুল ওরা।

আসার পথে আমপালার বাড়ি থেকে ফিরোজাকে তুলে নিয়েছে রানা। গাড়িতে ওঠার পর থেকে একটাও কথা বলেনি ফিরোজা। রানা লক্ষ করল, ওর চোখ লালচে হয়ে আছে। বোধহয় রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

সেদিন ডিনার খাওয়ার পর বাড়িতে না ফিরে রানার হোটেলে গিয়েছিল ফিরোজা। রাতটা রানার সাথে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব সে-ই দিয়েছিল। সারারাত ড্রইংরুমে বসে গল্প করেছে ওরা। গল্প মানে ফিরোজা তার জীবনী বলে গেছে, গভীর আগ্রহের সাথে শুনেছে রানা। ঠিকানাবিহীন প্যালেস্টাইনীদের দুর্দশা, পেট ভরে খেতে না পাওয়া একটা বাচ্চা মেয়ের কষ্ট, ট্রেনিং পিরিয়ডের কঠোর পরিশ্রম, এইসব শুনতে শুনতে বিষণ্ন হয়ে উঠেছিল রানার মন।

শেষের দিকে ওর সম্পর্কে এটা সেটা জানতে চেয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিল ফিরোজা, পরিষ্কারভাবে কিছু না বলে বেশিরভাগ প্রশ্নই এড়িয়ে গেছে রানা।

ঘুমে যখন চোখ বুজে আসছে, ফিরোজাকে বেডরুমে পাঠিয়ে দিয়ে ড্রইংরুমে থেকে গিয়েছিল রানা। বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করেনি ফিরোজা। বিছানায় শুয়েছিল বটে, কিন্তু নিজেও ঘুমাতে পারছিল না, রানাকেও ঘুমাতে দিচ্ছিল না। ওখান থেকে খানিক পর পর একটা করে প্রশ্ন করছিল, উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছিল রানা। 'তোমার মা বেঁচে আছেন?' কিংবা, 'পানি কোথায়?' ফিরোজার এ-ধরনের প্রশ্ন শুনতে শুনতে রানার একবার মনে হয়েছিল, মেয়েটা বোধহয় ওকে বেডরুমে চাইছে। কিন্তু যায়নি রানা, যাবার কোন ইচ্ছেও জাগেনি মনে। হয়তো রোদ না ওঠা পর্যন্ত একের পর এক প্রশ্ন করেই যেত ফিরোজা, যদি না রানা এক সময় উত্তর দেয়া বন্ধ করত।

সকাল বেলা গাড়ি করে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল রানা। বিদায়ের সময় মুখ হাঁড়ি করে রেখেছিল ফিরোজা, একটা কথাও বলেনি। তারপর আর দেখা হয়নি ওদের।

আজ আসার পথে মন খারাপের কারণ কি জানতে চেয়েছে রানা, কিন্তু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে ফিরোজা বলেছে, কিছু হয়নি তার।

ওয়াটার বোর্ড অফিসে পৌঁছে রানা দেখল, অফিসার রিগ ওদের জন্যে তৈরি

হয়ে বসে আছে, বাইরে অপেক্ষা করছে ভ্যান। ওখানে আর দেরি না করে বাইরে এসে ভ্যানে চড়ল ওরা, ভ্যানের পিছনে বেঞ্চ-সীটে বসল অফিসার আর রানা, ফিরোজা বসল ড্রাইভারের পাশে। অফিসারের নির্দেশ পেয়ে ডিউক স্ট্রীটের দিকে ভ্যান ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

নির্দিষ্ট ম্যানহোলের কাছে পৌঁছে ওরা দেখল, ওয়াটার বোর্ডের কর্মীরা এরই মধ্যে ওটার চারদিকে একটা তাঁবু টাঙিয়েছে, তাঁবুর চারদিকে ব্যারিকেড তৈরির কাজও শেষ। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ বৃষ্টি হবে না। সিউয়ারে পানির স্রোত খুব একটা বেশি হবে না বলে অফিসার ভারি খুশি।

তাঁবুর ভেতরে ঢুকেই কমলা রঙের প্রোটেকটিভ স্যুট, হালকা প্লাস্টিক হেলমেট আর রাবার বুট পরে নিল অফিসার। ম্যানহোলের সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে গেল সে, সাথে কিছু ইকুইপমেন্ট নিয়েছে, নিচের পরিবেশ পরীক্ষা করবে।

রানার দেখাদেখি ফিরোজাও প্রোটেকশন স্যুট পরে নিল। তার রোগা-পাতলা একহারা শরীরে স্যুটটা ঢল ঢল করতে লাগল, মৃদু হেসে এগিয়ে এল রানা, বেল্টটা টেনে বেঁধে দিল কোমরে। সকাল থেকে এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসির রেখা দেখা গেল ফিরোজার ঠোঁটে। জানতে চাইল, 'সত্যি কথা বলবে, কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?'

'ঢাউস,' বলেই ফিরোজার কিল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দ্রুত পিছিয়ে গেল রানা।

ম্যানহোলের মুখ থেকে উঠে এল অফিসার রিগের মাথা। গাল্‌ভরা হাসি দিল সে। রিঙরোজ ল্যাম্প আর লিড-অ্যাসিটেট পেপার রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'সব ঠিক হ্যায়, ইয়ং লেডি। ভয়ের কোন কারণই নেই। এক্সপ্লোসিভ বা অ্যাস্ফিকসিয়েটিং গ্যাস, কোনটারই আভাস পাইনি। একটু গন্ধ আছে, ও কিছু না। রেডি? অয়েল-ল্যাম্প আর লাইফ-লাইনের কথা কেউ ভুলবেন না কিন্তু। এবার, নেমে আসুন।'

অফিসারের পিছু পিছু নামতে শুরু করল রানা। ওকে অনুসরণ করল ফিরোজা। এক মিনিট পর ওরা তিনজন দাঁড়াল বিশাল টিউব আকৃতির অন্ধকার টানেলে। টানেলের ইঁটের গা ভেজা ভেজা, ওদের পায়ের বুট তিন ইঞ্চি ডুবে আছে পচা, দুর্গন্ধময় পানিতে, ঢালু মেঝে দিয়ে কল কল শব্দে নেমে যাচ্ছে স্রোতটা।

মাথার ওপর রাস্তার যানবাহন ছুটছে, গম গমে আওয়াজ ভেসে আসছে ম্যানহোলের মুখ দিয়ে, টানেলের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে একটানা। মাটির নিচের একটা অন্ধকার জগৎ, কোমরে লটকানো ল্যাম্পের আলোয় তার সামান্যই দেখতে পেল ওরা।

নাক দিয়ে ফোঁৎ ফোঁৎ শব্দ করল ফিরোজা। 'এই আপনার একটু গন্ধ, মি. রিগ? আমি না বমি করে ফেলি!'

'করতে পারেন, অনেকেই করে, আমরা কিছু মনে করব না।' বলেই হেসে উঠল অফিসার। এক পা পিছিয়ে এসে ফিরোজার একটা হাত শক্ত করে ধরল সে। 'আমি থাকতে আপনার কোন চিন্তা নেই। গন্ধ··· দেখবেন, একটু পরেই সয়ে

যাবে। আমরা যেন কোথায় যাব? কিং'স স্কয়্যারস' পন্ড সিউয়ারে, ঠিক? ইয়ং ম্যান, পিছু নিন। দেয়ালে একটা হাত রাখুন, আর সাবধান।'

পানির নিচে, ওরা অনুভব করল, নরম কিসে যেন ওদের বুট দেবে যাচ্ছে। কেউ যদি পা পিছলে পড়ে যায়, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রসঙ্গটা তুলতে অফিসার ব্যাখ্যা করল, 'ওগুলো ডেট্রিটাস, বুঝলেন কিনা। কয়েক বছর ধরে জমেছে। মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করা দরকার, তা ঠিক। ভারি কঠিন কাজ। বছর তিনেক আগে শেষবার পরিষ্কার করা হয়েছে।' তার কণ্ঠস্বর আরও জোরাল হয়ে ওদের কানে ফিরে এল, গা ছমছমে ভৌতিক হয়ে উঠল পরিবেশ।

টানেলের একটা তে-মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা। রিগ ওদেরকে পথ দেখিয়ে এগোল বাঁ দিকের টানেল ধরে। যত গভীরে নামছে ওরা, যানবাহনের আওয়াজ ততই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। সেই সাথে বুটের চারপাশে পানির স্রোত ধারাল হয়ে উঠছে, আওয়াজটাও আগের চেয়ে ভারী আর ব্যস্ত শোনাচ্ছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠল সামনের অন্ধকার থেকে উঠে আসা একটা গম্ভীর শব্দ। যেন বিশাল একটা স্রোত মরিয়া হয়ে ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ছে নিচে কোথাও।

কথা বলার সময় চিৎকার করতে হলো রানাকে, তা না হলে শুনতে পাবে না, 'এন্ট্রি পয়েন্ট হিসেবে এটা খুব একটা সুবিধের নয়। যেখানে যাচ্ছি, ওটাকে যদি ফল-আউট শেলটার হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, অ্যাটমিক বম্ব এলার্টের সময় মানুষজনকে তো তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছুতে হবে? দু'পা এগোতে তিন বার যদি আছাড় খেতে হয়, তাহলে? ওদের ক'জনের পায়েই বা বুট থাকবে।'

'আমি একমত,' জবাব দিল রিগ। 'টানেলের গায়ে, নরম্যাল সিউয়েরেজ লাইনের ওপরে, একটা কার্নিস মত তৈরি করা দরকার, লোকে যাতে হাঁটতে পারে। দেখাই যাচ্ছে, স্পেসের কোন অভাব নেই। ছাদটা তো সাড়ে আট ফুট উঁচু।' স্রোতের একটানা প্রবাহ বিস্ফোরণের মত বাজছে কানে, প্রতি মুহূর্তে গলা আরও চড়াতে হলো অফিসারকে। 'তবে বৃষ্টির সময় ওই কার্নিস কোন কাজে আসবে না। তখন পানি ফেঁপে উঠে ছাদে গিয়ে ঠেকে।'

অফিসারের পিছনে রয়েছে ফিরোজা। এখন আর অফিসার নয়, ফিরোজাই তার হাত ধরে আছে। কথাগুলো শুনে শিউরে উঠল সে, বলল, 'গড, আজ যেন বৃষ্টি না হয়!'

'এতটুকু সম্ভাবনা থাকলেও আপনাদেরকে নিয়ে আসতাম না,' বলল রিগ। 'পৌঁছে গেছি আমরা। এই সামনেই। আপনাদের জন্যে ছোট একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে।'

হঠাৎ করেই ওরা একটা গভীর খাদ আকৃতির টানেলে এসে পড়ল, দাঁড়িয়ে আছে শুকনো, চওড়া একটা কার্নিসে। ওদের নিচে নর্দমার জলস্রোত, যার ওপর দিয়ে এইমাত্র হেঁটে এসেছে ওরা। এখন স্রোতটা নিচে, বিশ ফিট চওড়া খরস্রোতা একটা নদীতে পড়ছে। কিন্তু রিগ যে বিস্ময়ের কথা বলল এটা সেটা নয়। দশ ফুট উঁচু একটা পানির পাঁচিলের কথা বলেছে সে, টানেলের এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত চওড়া, সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্রোতস্বিনী নদীতে। বিস্ফোরণের আওয়াজ আসছে ওটা থেকেই—ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল একটা জলপ্রপাত।

'এরকম আরও আছে নিশ্চয়ই?' জানতে চাইল রানা।

'আছে বৈকি,' পাল্টা চিৎকার করল রিগ। 'মনে রাখবেন, শুধু মেইন সিউয়ারই চারশো বিশ মাইল লম্বা। তবে এমনি সময়ে এভাবে তেড়ে আসে না। দিন কয়েক ধরে তুমুল বৃষ্টি হয়ে গেল যে, বুঝলেন না! এটা একটা স্টর্ম-রিলিফ সিউয়ার। জলপ্রপাতটা হলো কিং'স স্কলারস এর উপচে পড়া পানি। ধাপ বেয়ে আরও ওপরে উঠে আসুন, সাবধান, হ্যান্ড-রেইল ছাড়বেন না।'

ওপরে উঠে এল ওরা, একেবারে পানির পাঁচিলের কিনারায়। সবার পিছনে রানা, এক হাতে হ্যান্ডরেইল ধরে আছে, আরেক হাত পেঁচিয়ে রেখেছে ফিরোজার কোমরে। আরেকটা টানেলে চলে এল ওরা, ডায়ামিটারে এটা বারো ফিট। ওখান থেকে চলে এল সরু একটা কার্নিসে, ওদের ঠিক পায়ের নিচ দিয়েই ঘোলা পানির একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, শুধু এই নদীটাই ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লন্ডন শহরের ছয় বর্গ মাইল আবাসিক আর শিল্প এলাকার আবর্জনা। এখানে গন্ধটা অন্য রকম, কিন্তু একই রকম উৎকট।

নাকে একটা হাত দিল রানা। 'আপনি না বলেছিলেন সয়ে আসবে?'

'আসবে, আসবে। অন্য রকম গ্যাস, বুঝলেন না। এটা মেইন সিউয়ারের একটা।'

দূষিত বাতাস ফুসফুসে আঘাত করায় কেশে উঠল ফিরোজা। তারপর থুথু ফেলতে শুরু করল। 'গড, কি পচা দুর্গন্ধ! মি. রিগ, খালি টানেলটা আর কদ্দূর?'

রিগের নাকে দুর্গন্ধ ঢুকছে বলে মনে হলো না। 'দুর্গন্ধ এরচেয়ে তিন গুণ বেশি তীব্র হলে ব্রিদিং অ্যাপারেটাস দরকার হয়। না, আর বেশি দূরে নয়। পঞ্চাশ গজের মত। আসুন।'

দেয়ালের গায়ে গাঁথা হাতল ধরে সরু কার্নিসের ওপর দিয়ে অতি সাবধানে এগোল ওরা। একটা খোলা মুখের সামনে এসে থামল। তারপর অত্যন্ত সরু আর খাড়া কয়েকটা ধাপ টপকে রিগের পিছু পিছু উঠে এল একটা প্যাসেজে। প্যাসেজটা একটা টানেলের মাথায়। উল্টোদিকে আরও কিছু ধাপ দেখা গেল, অতটা খাড়া নয়। সেগুলো বেয়ে নিচু ছাদের শুকনো একটা কালভার্টের ভেতর চলে এল ওরা। দশ গজ এগিয়ে রানা আর রিগকে মাথা নিচু করতে হলো, পুরানো একটা লোহার খোলা গেট পেরোল ওরা, সামনেই বিশাল গুহা আকৃতির খালি একটা জায়গা। ইঁটের দেয়াল ঘেরা একটা পাতালপুরী, সবগুলো ল্যাম্পের আলো শুধু প্রবেশ পথটাকেই ভেদ করতে পেরেছে। রিগ বলল, 'কেমন দেখছেন? হাজার কয়েক লোকের জায়গা হবে না?'

'তা হবে,' বলল রানা। মুখ তুলে ওপরদিকে তাকাল ও। ভাবল, তেল আবিব ক্রেডিট ব্যাংক এখান থেকে ক'হাত দূরে হতে পারে? রিগের অফিসে দেখা ম্যাপটা বিশদ ভাবে স্মরণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও। লোকটা নিজের জ্ঞান ফলাতে পছন্দ করে, কাজেই প্রশ্ন করলে ক্ষতি নেই। 'বলুন তো, ঠিক কোথায় আমরা রয়েছি? আমাদের মাথার ওপর কোন্ রাস্তা?'

'হেনরিয়েটা প্যালেস। কোথায়, জানেন? ওখান থেকে ক্যাভেনডিশ স্কয়ারে যাওয়া যায়।' নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রিগ। 'শুনন।' ভারী ঘরঘরে একটা

আওয়াজ, অস্পষ্ট, ওদের সামান্য নিচে আর বাঁ দিক থেকে ভেসে এল। ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল আওয়াজটা, তারপর মিলিয়ে গেল। হাসল রিগ। 'টিউব ট্রেন, বুঝলেন না! সেন্ট্রাল লাইন। অক্সফোর্ড সার্কাস থেকে বন্ড স্ট্রীট। মজার ব্যাপার, তাই না?'

চিন্তা করছে রানা। হেনরিয়েটা প্যালেস। হ্যাঁ, চেনে ও। তারমানে ব্যাংকের তলা থেকে একশো বা তার কিছু বেশি গজ দূরে রয়েছে ওরা। রানা কি ভাবছে, ধরতে পারল ফিরোজা। রিগের দিকে তাকাল সে। জিজ্ঞেস করল, 'প্রতিটি অফিস ব্লক নিজস্ব এস্কেপ রুট তৈরি করে এখানে লোক নামাতে পারবে? যাতে কাজের দিনে অ্যাটমিক অ্যাটাক হলে খুব তাড়াতাড়ি আশ্রয় পেতে পারে মানুষ?'

ল্যাম্প তুলে ফিরোজার দিকে আলো ফেলল রিগ। 'সম্ভব, হ্যাঁ। কারণ প্রতিটি অফিসেরই বেসমেন্ট কোন না কোন টানেলের খুব কাছে হতে বাধ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাবে কয়েক ফিট মাটি খুঁড়লেই টানেল পাওয়া যাচ্ছে।'

'সারফেস থেকে ঠিক কতটা নিচে এখন আমরা?' জানতে চাইল রানা।

'অনেক, অনেক। প্রায় ষাট ফিট। কিন্তু এখান থেকে সব ধরনের টানেল চারদিক থেকে ওপর দিকে উঠে গেছে, সেগুলোর যে-কোন একটা ধরে অফিস ব্লকের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারবেন আপনি।'

'আমার আর সহ্য হচ্ছে না!' অভিযোগ করল ফিরোজা।

'হ্যাঁ, তাজা বাতাস দরকার এবার,' সায় দিল রানা।

ফিরতি পথ ধরল ওরা। ম্যানহোলের কাছাকাছি এসে রানা বলল, 'মি. রিগ, আপনি যে কষ্ট করলেন, কোন দিন ভুলব না।'

রিগ কিছু বলার আগেই ফিরোজা বলল, 'কষ্ট আরেকটু আপনাকে করতে হবে, মি. রিগ। ফিচারটা শুরু করতে হলে আপনার অফিসে গিয়ে আরেকবার ম্যাপটা আমাদের দেখতে হবে। সোমবারে আসি?'

'কষ্ট? কোন কষ্ট না। তরুণদের সাহায্য করতে পারছি, লোকে শহরের একটা আলাদা জগৎ সম্পর্কে জানবে, এগুলোই তো বড় কথা। আসুন না সোমবারে। দরকার হলে ম্যাপের একটা কপি নিয়ে যাবেন।'

'সত্যি, আপনার মত মানুষ হয় না। ফিচারটা ছাপা হোক, একদিন আমার বাড়িতে দাওয়াত খেতে হবে আপনাকে।'

'সে হবে'খন, সে হবে'খন...' এত খুশি হলো রিগ, অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না।

মার্সিডিজ নিয়ে ফিরছে ওরা। 'কোথায়? আমার হোটেল, না তোমার জেলখানায়?'

কি যেন ভাবছে ফিরোজা, জবাব দিল না।

'আবার মন খারাপ?'

রানার দিকে ফিরল ফিরোজা। মায়া ভরা চোখে প্রশ্ন। 'আবার মানে?'

'সেদিন আমার হোটেলে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা মুখ হাঁড়ি করে ফিরে গেলে, কারণটা বুঝিনি,' বলল রানা। 'তারপর আজ সকালে দেখা, ভাল করে কথা পর্যন্ত বললে না। এখন আবার...'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল ফিরোজা, 'উত্তরে সত্যি কথাটা বলবে?'

'বলব।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্নটা করল ফিরোজা, 'তুমি আমাকে ঘৃণা করো, না?'

স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। 'একি কথা বলছ!'

'লম্পট এক লোকের কাছে থাকি, সবাই তো আমাকে ঘৃণাই করবে। তুমিও নিশ্চয়ই করো।'

'না, ফিরোজা…'

'মিথ্যে কোথা বোলো না!' অভিমানে ফিরোজার গলা বুজে এল। 'ঘৃণাই যদি না করো, তোমার হোটেল কামরায় আমাকে তাহলে এড়িয়ে গেলে কেন তুমি? জেগে শুয়ে ছিলে, অথচ আমার কথার উত্তর দাওনি, কেন? কেন আসোনি আমার কাছে?' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল সে। বলতে লাগল, 'যদি ভেবে থাকো ওই শয়তান আমার…ভুল…যার কেউ নেই তার খোদা আছে। আমপালা একটা অক্ষম…'

গাড়ির স্পীড কমিয়ে আনল রানা, প্রথম সুযোগেই একটা পার্কিং এরিয়ায় ঢুকে পড়ে মার্সিডিজ থামাল। হুইল থেকে একটা হাত উঠিয়ে ফিরোজার কাঁধে রাখল ও। 'লোকে দেখলে হাসবে। শান্ত হও। এভাবে ভুল বুঝে কষ্ট পায় বোকারা। তোমাকে তো আমার বোকা বলে মনে হয়নি একবারও।'

চোখ থেকে হাত নামাল ফিরোজা, হাতব্যাগ খুলে রুমাল বের করে মুখ মুছল, কিন্তু রানার দিকে তাকাল না। বলল, 'আমি বাড়ি যাব।' চোখ থেকে পানি ঝরছে এখনও।

'যাবে বৈকি,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'কিন্তু ভুল ধারণা নিয়ে নয়। সেদিন রাতে তোমার কাছে যাইনি, তার কারণ তোমার সাথে আমার সম্পর্কটাকে লোভ-লালসার পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চাইনি আমি। আমপালা তোমার ক্ষতি করতে পারেনি, শুনে খুশি হলাম। কিন্তু যদি করত, তবু তোমাকে ঘৃণা করার কথা আমার একবারও মনে হত না। শরীরটা আমার কাছে বড় নয়, ফিরোজা, বড় মনটা। তোমাকে আমার সরল, নিষ্পাপ, পবিত্র ছোট একটা মেয়ে বলে মনে হয়েছে। আমার কোন নিকটাত্মীয় নেই, আপনজন নেই, থাকলে তার প্রতি আমার যে দুর্বলতা জন্মাত, তোমার সব কথা শোনার পর আমি উপলব্ধি করেছি, সেরকম একটা দুর্বলতা জন্মেছে আমার মধ্যে…' আরও অনেকক্ষণ ধরে আরও অনেক কথা বলতে চাইল রানা, কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হলো কান্না ভুলে ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ফিরোজা। 'কিছু বলবে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল ফিরোজা। 'ন্‌না! ভু-ভুল হয়েছে,' মাথা নিচু করে নিল সে, '…এরকম ভুল আর কখনও হবে না…।'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

একটু পর ফিরোজা বলল, 'কাল মাঝরাত পর্যন্ত আমাকে জেরা করেছে আমপালা।'

'কেন?' ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রানা।

'সে-রাতে তোমার হোটেল কামরায় ছিলাম, সিসিলি থেকে দু'বার ফোন করেছিল আমপালা। লং ডিসট্যান্স কল, লাইন পাওয়া কঠিন। আমাকে না পেয়ে খেপে ছিল। এক রাতের জন্যে গিয়ে ফোন করবে জানলে তোমার সাথে থাকতাম না...'

'কি বললে তুমি?'

'বললাম, বাড়ি ছেড়ে কোথাও আমি যাইনি। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে শুনতে পাইনি, তা নয়তো রং নাম্বার হয়েছিল তার।'

'নিশ্চয়ই তোমার কথা বিশ্বাস করেনি?'

'না করে উপায় কি! যদিও মুখের ওপর মিথ্যেবাদী বলল। অনেক দিন হলো সন্দেহের কোন কারণ ঘটাইনি, তবু আমাকে একবিন্দু বিশ্বাস করে না।'

'বোঝা গেল, ওর লোকেরা আসল ঘটনা রিপোর্ট করেনি ওকে,' বলল রানা। 'আমপালা আমাকে কোন রকম সন্দেহ করে না তো?'

'আমার ব্যাপারে? মনে হয় না,' বলল ফিরোজা। 'তবে কাজটার ব্যাপারে তোমাকে সে মোটেও বিশ্বাস করে না। তোমার ওপর নজর রাখার জন্যেই তো এত ঘন ঘন আমাকে বাইরে বেরুতে দিচ্ছে।'

'এমন কিছু কোরো না যাতে আমাকে ওর সাথে এখুনি লাগতে হয়,' বলল রানা। 'সময় হোক, তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হাতের কাজটা আগে সারতে চাই, ফিরোজা।'

'ঠিক আছে।'

'ম্যাপটা পেলে টানেলে আবার নামব আমি,' বলল রানা। 'রিগকে ছাড়াই। ব্যাংকের ঠিক নিচটা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।'

'আমিও থাকব তো সাথে?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'না। তোমাকে নিতে চাইলে, আমপালার সন্দেহ হতে পারে।'

'কিন্তু তোমাকে দেখতে না পেলে রাতে যে আমার ঘুম আসে না!' কথাটা মুখ ফস্কে বলে ফেলে লজ্জায় লাল হয়ে গেল ফিরোজা।

# ছয়

রাস্তার পাশে ছোট একটা মনিহারী দোকান, কাঁচ লাগানো জানালায় খেলনা পুতুল থেকে শুরু করে হাঁড়ি-পাতিল, সব একসাথে গাদা করা। অনেক দিন কারও হাত পড়েনি, জিনিস-পত্রে ধুলো জমেছে। কাঠের কপাট বন্ধ, তিন দিন আগেও একটা তোবড়ানো সাইনবোর্ড ঝুলছিল—'দোকান সহ এই বাড়ি বিক্রয় হইবে।' দোকানের পিছনে ছোট্ট একটা পাঁচিলঘেরা উঠান, দিনের বেলাও ভাল করে আলো ঢোকে না। সিঁড়িটা নড়বড়ে, হঠাৎ ভেঙে পড়লে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ওপরতলায় একটাই মাত্র মাঝারি আকারের ঘর। রাস্তার দিকের জানালায় তারের

জাল লাগানো। জানালার সামনে দাঁড়ালে উইগমোর স্ট্রীট বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

দোকান আর বাড়ির মালিক ছিল এক বুড়ি। সুবেশ এক স্বাস্থ্যবান যুবক বুড়ির দামেই নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে বাড়িটা। লেন-দেনের পর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে বুড়ি।

অক্টোবরের পঁচিশ, সকাল। দোতলার ঘরে রানা আর আমপালা। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। রাস্তা, লোকজন, তেল আবিব ক্রেডিট ব্যাংক এই সব দেখছে। গলায় ঝুলছে একটা ক্যামেরা, এতক্ষণ ব্যাংকের ছবি তুলেছে ও। ওর পিছনে একটা টেবিলের ওপর বসে ফ্লাস্ক থেকে কাপে কফি ঢালছে আমপালা। 'তোমার কফি, খালেদ।'

রাস্তার ওপর, জানালার ঠিক নিচেই সবুজ রঙ করা একটা বেডফোর্ড ভ্যান এসে থামল। নিচে নামল ড্রাইভার, পিছন দিকে গিয়ে টেনে-হিঁচড়ে কাঠের ভারী একটা বাক্স নামাল সে।

জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা, গলা থেকে ক্যামেরা নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'গাড়ি এসে গেছে।'

নিচে নেমে দোকানে ঢুকল ও। ভেতরটা অন্ধকার, তবু আলো জ্বালল না। অন্ধকারে হাতড়ে দোকানের তালা খুলে পিছিয়ে এল এক পা। ভারী বাক্সটা নিয়ে ভেতরে ঢুকল ড্রাইভার। সাথে সাথে দরজায় আবার তালা লাগাল রানা, আলো জ্বালল। কেনা-কাটার জন্যে দোকানে কেউ আসবে না, বাইরে লিখে রাখা হয়েছে, 'নতুন করে সাজানোর জন্যে দোকান এখন বন্ধ।'

হাত থেকে ছেড়ে দিতেই পাকা মেঝেতে দড়াম করে পড়ল বাক্সটা। হাঁপাতে হাঁপাতে সিধে হলো ড্রাইভার। কোমর ডলতে শুরু করল। কাউন্টারের পিছন থেকে ওয়্যার কাটার আর হাতুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল রানা, ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'খোলো। তুমি থাকতে থাকতে কি আছে দেখে নিতে চাই।'

'ভ্যানে আরও একটা বাক্স আছে...'

'আমি দরজা খুলছি, তুমি ওটা নিয়ে এসো।'

আবার তালা খুলল রানা, কবাট দুটো সামান্য ফাঁক করল, যাতে লোকটা শুধু কোনমতে গলতে পারে। খানিক পর দ্বিতীয় বাক্স নিয়ে ভেতরে ঢুকল ড্রাইভার। বাক্স খোলার দায়িত্ব তার উপর চাপিয়ে দরজায় তালা লাগাল রানা।

এক এক করে সবগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও। প্রতিটির বোর-এ চোখ রাখল, বোল্ট টানল, ফায়ারিং মেকানিজমের কাজ দেখল। আনকোরা নতুন তিনটে অটোমেটিক রাইফেল, চকচক করছে। বাক্সের নিচের দিকে রয়েছে ছত্রিশটা অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগাজিন, প্রতিটিতে রয়েছে ত্রিশ রাউন্ড সেভেন পয়েন্ট সিক্স-টু ক্যালিবার অ্যামুনিশন। হঠাৎ শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট জিভের ডগা দিয়ে ভিজিয়ে নিল রানা। রাইফেলের চেহারা আর গন্ধ উত্তেজিত করে তুলেছে ওকে। বাক্সের ভেতর নামিয়ে রাখার সময় প্রতিটি অস্ত্রকে হাত বুলিয়ে আদর করল ও। আফ্রিকা, জিম্বাবুইয়ের কথা মনে পড়ে গেছে ওর। রেবেকার একটা বিশাল সম্পত্তি আছে ওখানে, রেবেকা মারা যাবার পর উইল অনুসারে রানাই সেটার বর্তমান মালিক।

বুনো হাতি, গণ্ডার, বাঘ, সিংহ—হিংস্র পশু শিকার করতে হলে ওটার চেয়ে আদর্শ জায়গা আর হয় না। দু'একবার গেছে রানা, অধিকার ফলাবার জন্যে নয়, ওই শিকারের নেশায়।

দ্বিতীয় বাক্সটাও প্রচুর সময় নিয়ে পরীক্ষা করল রানা। আরও তিনটে রাইফেল, আরও এক হাজার আশিটা অ্যামুনিশন। অস্ত্রশস্ত্র ওদের যা দরকার, এগুলো তার অংশ মাত্র।

দোকান থেকে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার। দরজা বন্ধ করার আগে রাস্তার ওপারে খবরের কাগজের দোকানে চোখ পড়ল রানার, দোকানদার একটা ভ্যান থেকে ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি নিচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরোল ও, একটা কাগজ কিনে ফিরে এল তখুনি।

ওপর তলায় উঠে রানা দেখল, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমপালা। 'কেমন দেখলে?' কামানো মাথায় হাত বুলিয়ে জানতে চাইল সে।

'সব ঠিক আছে। আনকোরা নতুন, তেল মাখানো।'

'যা যা দরকার সব তিন দিনের মধ্যে পেতে হবে,' হাতঘড়ি দেখল আমপালা। 'এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট, ব্যাংকে যাবে না আজ?'

'যাব,' বলল রানা। 'কাগজে কি লিখেছে শোনো। লিখেছে—শেষ আলোচনাটাও ভেঙে গেছে, পুলিস বাহিনী ধীরে-চলো নীতিতে অটল।'

'ভেরি গুড,' বলল আমপালা। 'আমিও খবর পেয়েছি, সরকারের সাথে ওদের সমঝোতা হবে সে ভয় নেই।'

'তবু, খুব বেশি সময় নেই হাতে,' বলল রানা। 'অথচ কাজ পড়ে রয়েছে অনেক।'

'তিন হপ্তা, গুছিয়ে নেয়া যাবে সব।'

আমপালার পিঠের দিকে চোখ রেখে ফিরোজার কথা ভাবছে রানা। সোমবারের পর ওর সাথে তার আর দেখা হয়নি। সেদিন ওয়াটার বোর্ড অফিসে গিয়ে ম্যাপটা নিয়ে এসেছিল ওরা, তারপর একটা রেস্তোরাঁয় বসে দুপুরে লাঞ্চ খেয়েছে। তখনই আভাস দেয় ফিরোজা, রানাকে বোধহয় একটু একটু সন্দেহ করতে শুরু করেছে আমপালা। ফিরোজাকে সে বলে দিয়েছে, রানার সাথে কথা বলার সময় হাসতে পারবে না।

আজ আমপালার সাথে এটা সেটা নিয়ে কথা বলার সময় ইচ্ছে করেই ফিরোজা প্রসঙ্গ তোলেনি রানা। শুধু শুধু লোকটাকে খোঁচাতে চায় না ও।

জানালার দিকে পিছন ফিরল আমপালা। 'আজ বিকেলেই না তোমার আবার টানেলে নামার কথা?'

'হ্যাঁ,' সানগ্লাসের ওপর চোখ রেখে বলল রানা।

'আমাদের প্ল্যানে এই টানেলের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি,' বলল আমপালা। 'তোমার কি মনে হয়, টানেল ধরে ব্যাংকের তলায় পৌঁছুতে পারবে?'

'আশা তো করি। ম্যাপটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি। সারফেস ম্যাপ আর সিউয়ার প্ল্যান, দুটো মিলিয়ে, মাপজোক করে বের করেছি টানেলের ঠিক কোথায় হতে পারে ব্যাংক। হিসেবের সাথে খুব একটা গরমিল হবে না।'

'রিগকে নিয়ে কি করবে বলে ভেবেছ?' জানতে চাইল আমপালা। 'আমি বলি, উটকো ঝামেলা হতে পারে, শিকড় উপড়ে ফেলাই ভাল।'

কঠোর দেখাল রানাকে, দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'রিগ সাহায্য না করলে এই অল্প সময়ে এতটা আমরা এগোতে পারতাম না। ওকে মেরে ফেলার কথা মুখেও এনো না আর। অকারণ খুন-খারাবি আমি পছন্দ করি না।'

'কাজটায় আমাদের সবার স্বার্থ জড়িত,' বলল আমপালা। 'তোমার একার পছন্দ-অপছন্দের দাম কতটুকু? ব্যাংক লুঠ হবার সাথে সাথে রিগ বুঝতে পারবে ঘটনার জন্যে কারা দায়ী। পুলিসকে সব বলবে সে, আমরা সোনা নিয়ে টানেল থেকে বেরিয়ে আসার আগেই ম্যানহোলে পৌঁছে যাবে ওরা। তখন?'

'যাতে ক্ষতি করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা যায়,' বলল রানা। 'ওকে কোথাও আটকে রাখলেই চলবে। মেরে ফেলতে হবে, এটা কি কথা!'

মুচকি একটু হাসল আমপালা। কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি এতটা নরম তা কিন্তু ভাবিনি আমি।'

ব্যঙ্গটুকু হজম করল রানা। ব্রীফকেস খুলে হিটলারী গোঁফ, প্যাড, তুলো ইত্যাদি বের করে ছদ্মবেশ নিতে শুরু করল।

'যা যা দরকার সব যোগাড় হয়েছে?' কাজের কথায় ফিরে এল আমপালা।

'রোনাল্ড হার্ডির সবুজ ভ্যানটাকেই কাজে লাগাচ্ছি,' বলল রানা। জানে, রোনাল্ডকে দলে নেয়ায় মনে মনে এখনও রেগে আছে আমপালা। ঝোঁকের মাথায় লোকটাকে আরও একটু চটাবার ঝুঁকি নিয়ে বসল ও, বলল, 'আমার সাথে ফিরোজারও যাওয়া উচিত।'

ঝট করে মুখ তুলে আমপালা বলল, 'না!'

শ্রাগ করল রানা। 'তুমিই ওর মালিক, তুমি যা বলো!'

'হ্যাঁ, কথাটা মনে রেখো—ও আমার। প্রয়োজন মনে করলে তোমার সাথে পাঠাব ওকে, কিন্তু আজ তোমার সাথে টানেলে গিয়ে হামাগুড়ি দেয়ার ওর কোন প্রয়োজন নেই। পিয়ানোকে নিয়ে যাও।'

'আমি চললাম,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ওর পিঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল আমপালা।

প্রায় এক ঘণ্টা পর। জানালার সামনে আমপালা আর সা'দুল্লা দাঁড়িয়ে আছে। তেল আবিব ক্রেডিট ব্যাংক থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা, হাতে ব্রীফকেস। ওকে দেখে আমপালার পাঁজরে কনুই দিয়ে মৃদু একটা গুঁতো মারল সা'দুল্লা। 'ওই আমাদের হিরো আসছে।'

প্রচণ্ড রাগে নিঃশব্দে দাঁতে দাঁত চাপল আমপালা, রক্তচক্ষু মেলে তাকাল সা'দুল্লার দিকে। কিন্তু তার এই প্রতিক্রিয়া লক্ষই করল না সা'দুল্লা। কৌতুক, বিস্ময় আর প্রশংসা ভরা হাসি নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

রাস্তা পেরিয়ে সেন্ট ক্রিস্টোফার'স প্যালেসের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল রানা।

তিন মিনিট পর বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ওপর তলায় উঠে এল ও। কথা না বলে গোঁফ জোড়া খুলল, মুখের ভেতর থেকে কাগজ বের করল, পেট

থেকে নামাল তুলোর প্যাড। কারও দিকে না তাকিয়ে রাস্তা থেকে কেনা খবরের কাগজটা মেলে ধরল চোখের সামনে, বসে পড়ল একমাত্র চেয়ারটায়।

ধীরে ধীরে জানালার দিকে পিছন ফিরল আমপালা। সরাসরি তাকাল রানার দিকে। চেহারায় রাগের লেশমাত্র নেই,সারা মুখে সরল হাসি। 'কি ঘটল ওখানে, রানা?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল সে।

কাগজ থেকে মুখ তুলল রানা। 'মঙ্গলবারের মতই—একই সময়ে একই ঘটনা।'

'আমাদেরও জানাও,' আবেদনের সুরে, কৌতুক করল আমপালা, 'সব নিজের ভেতর চেপে রেখো না।'

'ছবিগুলো ডেভেলাপ না করে দেখাতে পারছি না,' বলল রানা। 'সেদিনের মত ঠিক বারোটার সময়, ঠিক আমি যখন ডিপোজিট বক্স স্ট্রং রূম থেকে বেরিয়ে আসছি, আয়রন গ্রিল আর ভল্টের দরজা খুলল ওরা। দু'জন গার্ডের পালাবদলের সময় ওটা, ঘটনাটা চোখের পলকে ঘটে গেল। কিন্তু ভল্টে নতুন একজন গার্ড ঢোকার সময় মুহূর্তের জন্যে চোখ গেল ভেতরে।'

'কি দেখলে!' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল সা'দুল্লা।

রানার দিকে আমপালাও এগিয়ে এল এক পা।

'মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু হয়ে আছে,' বলল রানা।

'কি?'

'কি আবার, সোনা।'

'ম্যানেজার ব্যাটা দেখছি এক নম্বরের বুদ্ধু,' মন্তব্য করল আমপালা। 'তোমাকে দেখার সুযোগ দিল! তুমি দেখেছ, সেটা কি লক্ষ করেছে সে?'

'না। বললাম না, মাত্র মুহূর্তের জন্যে সুযোগটা পেয়েছিলাম।' ক'সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'লোকটার আমাকে ভাল লেগে গেছে। বলেছে, তার সাথে একদিন আমার লাঞ্চ খেতে হবে।'

'অতিরিক্ত গার্ড, ভল্টের ভেতর ডিউটি দেয় যে, সে হয়তো বীমা কোম্পানী লয়েডের লোক।'

'আমিও তাই ভেবেছি,' বলল রানা। 'অবশ্য যদি ওগুলো বীমা করা থাকে।'

'অস্ত্রপাতি কি দেখলে?'

'আগের মতই। হ্যান্ডগান। কোমরে ঝুলছে হোলস্টার, ফ্ল্যাপ খোলা নয়। ফটো দেখে বুঝতে পারবে।'

'অ্যাকশনের জন্যে সারাক্ষণ তৈরি হয়ে আছে, তা নয়।'

'না,' বলল রানা। 'ওদের হাবভাব দেখে মনে হয়নি বিপদের আশঙ্কা করছে ওরা।'

'ভেতরে যখন গার্ডদের পালা বদল চলছে,' জানতে চাইল আমপালা, 'বাইরের দরজা, গ্রিলের দরজা বন্ধ করেনি? দুটো দরজাই একই সময়ে খোলা ছিল, সেদিনের মত?'

'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণের জন্যে?'

'ভল্টের দরজা খোলা ছিল মাত্র কয়েক সেকেন্ড,' বলল রানা। 'একজন লোক বেরুল, আরেকজন ঢুকল, যতক্ষণ সময় লাগে। সাত সেকেন্ড।'

'মাত্র!' চিন্তিত দেখাল আমপালাকে। 'সেক্ষেত্রে ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ সারতে হবে আমাদের।'

'সাত সেকেন্ড যথেষ্ট সময়, আমপালা,' আশ্বস্ত করল রানা। 'অস্ত্র দাও, যোগ্য লোক দাও, সারপ্রাইজ দেয়ার সুযোগ থাকুক, সেই সাথে সাতটা সেকেন্ড দাও—বাকিংহাম প্যালেস লুঠ করে আনব আমি।'

দুশো সাতাশ নম্বর ম্যানহোল, গত হপ্তায় এটা দিয়েই টানেলে নেমেছিল রানা। সবুজ রঙের ভ্যানটা চালিয়ে নিয়ে এল রোনাল্ড হার্ডির এক চেলা। ভ্যানের পিছন থেকে লাফ দিয়ে প্রথমে নামল রানা, তারপর পিয়ানো। দু'জনেই কমলা রঙের বয়লার স্যুট আর প্রোটেকটিভ হ্যাট পরে আছে। ডিউক স্ট্রীটের কিছু পথিক কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তাদের দিকে ওরা ফিরেও তাকাল না। ভ্যানের পিছন থেকে হালকা মেটাল ব্যারিয়ার নামানো হলো, পিয়ানো আর ড্রাইভার সেটা ম্যানহোলের চারপাশে দাঁড় করাল। একটা তাঁবু নিয়ে এল রানা, সেটা ধরাধরি করে ব্যারিয়ারের ভেতর দ্রুত টাঙানো হলো। রানার ইঙ্গিত পেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার। ইতোমধ্যে ম্যানহোলের ঢাকনি খুলে ফেলেছে রানা, ওর পিছু পিছু ধাপ বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল পিয়ানো।

টানেলে নর্দমার পানি গত হপ্তার চেয়ে কম দেখল রানা। বুটের ইঞ্চি দুয়েক মাত্র ডুবল। কিন্তু তীব্র, ঝাঁঝাল দুর্গন্ধ আগের চেয়ে বেশি লাগল নাকে। নরম, পিচ্ছিল আবর্জনায় বুট দেবে গেল ওদের, পা ফেললেই একগাদা করে বুদ্বুদ উঠছে। নাকে রুমাল চেপে ধরে খুব সাবধানে এগোল পিয়ানো। রিগ যে পথ ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেই পথেই এগোল রানা। স্টর্ম-রিলিফ সিউয়ারের কাছে পৌঁছে লক্ষ করল ও, সামনে থেকে জলপ্রপাতের গম্ভীর আওয়াজ আসছে না আজ। বিশাল খাদের সামনে পৌঁছে দেখল, জলপ্রপাতের চিহ্নমাত্র নেই, তার জায়গায় ইঁটের দেয়াল দাঁত বের করে আছে। তবে নিচের নদীতে পানি আছে, স্রোত প্রায় মরে এসেছে। ধাপ বেয়ে উঠে এল ওরা, কিং'স স্কলারস' পন্ড সিউয়ারের কিনারা ঘেঁষা কার্নিস ধরে এগোল। সিউয়ারে পানির লেভেল দু'ফিটের মত নেমে গেছে, লক্ষ করল রানা। সবশেষে টানেলের মাথার ওপর দিয়ে চলে এল ওরা বিশাল গুহা আকৃতির ফাঁকা জায়গায়, এটাকেই ফল আউট শেলটার হিসেবে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিল রানা। ল্যাম্পের আলো ফেলে টানেলটার ভেজা ভেজা, পিচ্ছিল গা পরীক্ষা করল ও। আওয়াজ শুনে বুঝল, কাছাকাছি কোথাও দিয়ে একটা পাতাল ট্রেন যাচ্ছে। মুখের ভেতর এক জায়গায় জড়ো করে খানিকটা থুথু ফেলল ও। ভাবল, এ গন্ধ কোনদিনই সইবার নয়।

'সারফেস থেকে ষাট ফিট নিচে রয়েছি আমরা,' পিয়ানোর প্রশ্নের উত্তরে বলল রানা। 'হেনরিয়েটা প্যালেসের সরাসরি নিচে।' অন্ধকার গুহায় বুম বুম প্রতিধ্বনি তুলল ওর কণ্ঠস্বর। 'এখান থেকে বেশি দূরে নয়, খুব বেশি হলে শ দুই গজ, আমাদের ব্যাংক।' পকেট থেকে সিউয়ার প্ল্যানের একটা ফটোকপি বের করল ও,

সঠিক দূরত্ব সুপারইমপোজ করা আছে এতে। ভাঁজ খুলে হাঁটুর ওপর প্ল্যানটা রাখল, সতর্ক মনোযোগের সাথে চোখ বুলাচ্ছে। ম্যাপের এক কোণে একটা কম্পাস রাখল ও, তারপর ম্যাপটা একপাক ঘোরাল। পিছনে দাঁড়িয়ে রানার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে পিয়ানো, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে তার।

'এখানে রয়েছি আমরা।' প্ল্যানের ওপর একটা আঙুল রাখল রানা। 'ব্যাংকের বেসমেন্ট এখান থেকে একশো ষাট গজ দূরে—এটা সারফেস ডিস্ট্যান্স, এই পয়েন্ট থেকে উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে।' ল্যাম্পের আলো ইঁটের গাঁথুনির উপর ফেলল ও। 'তার মানে ওদিকে কোথাও। চলো, দেখি, ভল্টটা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।'

যে-কোন কারণেই হোক, রানার মত উৎসাহ বোধ করছে না সিসিলিয়ান পিয়ানো। সাড়ে ছয় ফিট লম্বা শরীর নিয়ে শীতে কাঁপছে সে, বমি ঠেকাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। আলোকিত দেয়ালটার দিকে বিতৃষ্ণা ভরা চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কিভাবে যেতে চাও, দেয়াল ফুঁড়ে?'

সিধে হলো রানা, ভাঁজ করে প্ল্যানটা রেখে দিল পকেটে। কম্পাসটা ওর হাতেই থাকল। 'ওপর দিকে, মানে সারফেসের দিকে ওঠার অনেকগুলো রুট আছে, ঠিক রুটটা বেছে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে। এসো।' মরচে ধরা লোহার গেট পেরোবার সময় মাথা নিচু করতে হলো ওদেরকে। কালভার্টে ঢুকে ঢালু পথ ধরে এগোল। এ-পথে এই প্রথম যাচ্ছে রানা।

পিছু নিয়ে কাশতে শুরু করল পিয়ানো। দূষিত বাতাস ফুসফুস থেকে বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে লোকটা। 'কিন্তু সাবধান, পথ হারালে মারা পড়ব কিন্তু।'

হাঁটতে লাগল রানা। মৃদু একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, 'সেটি হবার উপায় নেই, বুঝলে। হাতে কম্পাস থাকলে আমি একজন এক্সপার্ট। জাঙ্গাল ওঅরফেয়ারে ট্রেনিং নেয়া আছে। রাতের বেলা জঙ্গলে ঢুকে একবার বেরুবার চেষ্টা করে দেখো না। একই জায়গায় চক্কর খেয়ে মরবে। কিন্তু আমি না।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও। সামনে টানেলটা তিন ভাগে ভাগ হয়ে তিন দিকে চলে গেছে। এক এক করে সবগুলো শাখা-মুখে ল্যাম্পের আলো ফেলল ও। একেবারে ডান দিকেরটা আশাপ্রদ বলে মনে হলো, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে ওপরদিকে, মোটামুটি ডানদিক বরাবর। 'এসো। এই পথে মনে হয় কাছাকাছি পৌছুতে পারব।'

ছাদটা নিচুই থেকে গেল, পাঁচ ফিটের বেশি না, কাঁধ আর মাথা নিচু করে থাকতে হলো ওদেরকে। পায়ের নিচে পিচ্ছিল একটা ভাব, উজ্জ্বল সবুজ এঁটেল মাটিতে পা ফেলছে ওরা। টানেলের ভেজা ভেজা আঠালো গায়ে দু'হাত ঠেকিয়ে প্রতি মুহূর্তে পতন রোধ করতে হচ্ছে। কয়েক পা ওপরে উঠে একটা কথা মনে পড়ল রানার। 'থামো,' বলল ও। পিয়ানোর দিকে ফিরে পকেট থেকে বড় সাইজের একটা সার্ভেয়ার'স টেপ মেজার বের করল, ধরিয়ে দিল তার হাতে। টেপের একটা প্রান্ত ধরে আবার এগোল ও। 'আমার গলা না পাওয়া পর্যন্ত এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।'

পঁচিশ গজ এগোল রানা। টেপটাও ওই পঁচিশ গজ লম্বা। একটা বাঁক ঘুরে পিয়ানোর চোখের আড়ালে চলে এসেছে ও। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, লম্বা

হয়ে এগিয়ে গেছে টানেল, শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ল্যাম্পের আলো পৌঁচাচ্ছে না।

'এসো!' আওয়াজটা দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে লাগল। টেপের প্রান্ত একটা আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে সাইড পকেট থেকে নোট বুক আর পেন্সিল বের করল ও। খুব সাবধানে ছোট্ট একটা স্কেচ আঁকল। পিয়ানো এসে পৌঁছুবার আগেই কাজটা শেষ করল, পিয়ানো এসে ওকে কম্পাসের রীডিং নিতে দেখল। 'মাত্র পাঁচ ডিগ্রী সরে এসেছি কোর্স থেকে,' বলল রানা।

পঁচিশ গজ করে আরও দু'বার মাপ নিল রানা। দ্বিতীয় বার মাপ নেয়ার পর নোট বুকে স্কেচ আঁকছে ও, এই সময় হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে স্থির হয়ে গেল হাত। পিয়ানো এখনও এসে পৌঁছায়নি দেখে অস্থির লাগল ওর। আওয়াজটা চিনতে পেরেছে, ছুটে আসা পানির স্রোত। সামনে তাকাল, কিছু নেই। অথচ শব্দটা দ্রুত বাড়ছে। প্রথমে দু'পায়ের মাঝখানে একটা সুড়সুড়ি মত লাগল। দেখতে দেখতে টানেলের এক দেয়াল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল পানি। উঁচু হতে শুরু করেছে। ডুবে যাচ্ছে বুট। দ্রুত হাঁটুর দিকে উঠে আসছে। দু'হাত দিয়ে কাছের দেয়ালটাকে আলিঙ্গন করল ও, চিৎকার করে সাবধান করল পিয়ানোকে। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে এক ফুট উঁচু হলো পানি। আওয়াজটা এখন গর্জনে রূপান্তরিত হচ্ছে, দ্রুত এগিয়ে আসছে কাছে। পরমুহূর্তে কোমর সমান উঁচু আবর্জনা আর পানির একটা স্রোত আঘাত করল ওকে। ডুবে গেল ল্যাম্প।

হঠাৎ এল হঠাৎ-ই চলে গেল পানির তোড়। প্রবাহটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল বলে রক্ষে, তা না হলে নির্ঘাত ভেসে যেত রানা। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আতঙ্কের ধাক্কাটা সামলে ওঠার চেষ্টা করছে ও, পানির লেভেল বুটের নিচে নেমে গেল। কিচ-কিচ, চিক-চিক আওয়াজ হলো, পা ঘেঁষে পশমী শরীর ভেসে যেতে দেখে সভয়ে পিছিয়ে এল ও। দূরে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, বাঁকের কাছে ক্ষীণ একটা আলো। বাঁচা গেল, পিয়ানোর ল্যাম্প নেভেনি। গলা ছেড়ে খবর নিল ও, 'পিয়ানো?'

'আমি ঠিক আছি,' এগিয়ে এল আলোটা। 'শালার বাচ্চা ইঁদুরের চোদ্দ গুষ্ঠী উদ্ধার করি! গোটা বিশেক, বুঝলে, আমাকে একা পেয়ে পিকনিক শুরু করতে চাইছিল। বুট দিয়ে একটার মাথা থেঁতলে দিয়েছি, এই সময় পানির তোড়ে ভেসে গেল শালারা!'

রানার ল্যাম্পটা জ্বালা হলো। সারাক্ষণ গজ গজ করছে পিয়ানো। 'ব্যাংক আর লুঠ করিনি? টানেলের ভেতর দিয়েই ভল্টে ঢুকতে হবে, এমন কোন কথা আছে?'

'থামো তো,' বিরক্ত হয়ে বলল রানা। 'আবার বন্যা আসতে পারে, কান খাড়া রাখো।'

মোট ছয়বার টেপটা ব্যবহার করল ওরা, একশো পঞ্চাশ গজ এগোল। নোট আর প্ল্যান পরীক্ষা করে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা। 'আর বেশি দূরে নয়। আমাদের মাথার ওপর কোথাও হবে।'

'কি করে বুঝলে?' রানার কথা বিশ্বাস করছে না পিয়ানো।

'এই টানেল বেশ খাড়া হয়ে উঠে এসেছে,' বলল রানা। 'আমার হিসেবে, ব্যাংকের ভল্ট খুব কাছে, আমাদের একটু বাঁ দিক ঘেঁষে...।'

সামনে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে টানেলটা, মেঝে এখন সমতল। ইতোমধ্যে দুটো জায়গা পেরিয়ে এসেছে ওরা যেখানে ওদের মাথার ওপর খোলা ছিল টানেল, ফাঁক দিয়ে উঠে গেছে মরচে ধরা লোহার ধাপ। পিয়ানোকে পাশ কাটিয়ে কাছের ফাঁকটার দিকে এগোল ও, অন্ধকারে উঁচু করে ধরল ল্যাম্পটা।

'এসো, ওপরে উঠি, দেখা যাক কোথায় নিয়ে যায় আমাদের।' লোহার ধাপে পা দিয়ে উঠতে শুরু করল রানা। টানেলের মাথা ছাড়িয়ে এল ওরা, এরপর একটা কুয়ার ভেতর দিয়ে উঠে গেছে ধাপগুলো, মাত্র ছ'ফিট লম্বা। কুয়া থেকে বেরিয়ে পড়ল আরেক টানেলে, এটার ছাদ অনেক উঁচুতে, নিচেরটার তুলনায় একটু বেশি ডান দিক ঘেঁষে এগিয়ে গেছে। পকেট থেকে প্ল্যান বের করে আবার চেক করল রানা। তারপর ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল, বলল, 'কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

কানের পিছনে একটা হাত রাখল পিয়ানো। 'তুমি বলতে চাইছ গাড়ির আওয়াজ?'

'ঠিক তাই। তারমানে সারফেসের কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। শুধু তাই না...' আবার প্ল্যানটা দেখল রানা। মাপ, কম্পাস মিলিয়ে নিতে এক মিনিট সময় নিল ও। 'আমার কোন সন্দেহ নেই। ব্যাংকের ভিত আর মাত্র কয়েক গজ দূরে। এই প্যাসেজের মাথার ঠিক ওপরে কোথাও।'

সামনে এগোল রানা। একশো আশি বছরের পুরানো ইঁটের গাঁথুনি, তার ওপর ল্যাম্পের আলো ফেলল ও। এগোনো খুব সহজ, কারণ মেঝেটা প্রায় সমতল। তবে পানির ক্ষীণ একটা ধারা ওদের বুট ইঞ্চি খানেক ডুবিয়ে রেখেছে।

দশ গজ এগিয়ে থামল রানা। কোমরের বেল্ট থেকে খুদে একটা হাতুড়ি টেনে নিয়ে দেয়ালে ছোট ছোট বাড়ি মারল। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল, একেবারে নিরেট।

এগিয়ে এসে রানার কনুইয়ের পিছনে দাঁড়াল পিয়ানো। 'এর পর কি?'

দেয়ালে হাতুড়ির বাড়ি দিতে দিতে একটু একটু করে সামনে বাড়ছে রানা। 'পৌঁছে গেছি, বুঝলে হাঁদারাম! এখানেই কোথাও, খুব কাছে।'

'দেয়ালে হাতুড়ি ঠুকছ কেন?'

হেসে উঠল রানা। 'ফাঁপা একটা জায়গা খুঁজছি, আবার কেন! বোকার মত কথা না বলে, আমাকে একটু সাহায্য করো না।'

কোমর থেকে নিজের হাতুড়িটা টেনে নিল পিয়ানো। লোভে, উৎসাহে চক চক করে উঠল তার চোখ জোড়া। এতক্ষণে রানার কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে তার। উল্টোদিকের দেয়ালে বাড়ি মারতে শুরু করল সে।

নিয়ম ধরে বিশ মিনিট আওয়াজ করার পর, একটা কিছু পেয়েছে বলে মনে হলো রানার। হাতুড়ি ঠোকার সাথে সাথে ফাঁকা আওয়াজ হলো, হুস শব্দে বেরিয়ে এল ফুসফুসে জমে থাকা গরম বাতাস। চারপাশে আরও কয়েক জায়গায় বাড়ি মারা হলো, দু'পাশে আর ওপর নিচে। দেয়ালের খানিকটা অংশ পাওয়া গেছে, যেখানে খুব বেশি পুরু নয় গাঁথুনি, বোধহয় মাত্র এক ইঁট চওড়া। পিছিয়ে এসে জায়গাটার ওপর ল্যাম্পের আলো ফেলল ও। টানেলের আর সব ইঁটের মত এগুলোও পুরানো, তবে হাতুড়ি ঠুকলে, দু'পাশে আর ওপরে-নিচে একটা করে

লাইন ধরে ফাঁপা, ভোঁতা আওয়াজ হচ্ছে। তারমানে এককালে টানেলের গায়ে এখানে একটা ফাঁক ছিল। অনেক দিন হলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দেয়ালে নয়, হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে ওর বুকে। 'এদিকে, পিয়ানো।' শান্ত সুরে ডাকল ও।

এবার ছেনি বের করে একটা ইঁট খসাবার চেষ্টা করল রানা। এক কোণে ছেনি ঢুকিয়ে চাড় দিল ও, একটু নড়ল ইঁটটা, কিন্তু সামান্যই।

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে পিয়ানো, সাবধান করে দিয়ে বলল, 'বেশি আওয়াজ করা উচিত হবে না। দেয়ালের ওপারে কি আছে জানি না আমরা।'

'সে জন্যেই তো দেয়াল না ভেঙে শুধু ঠোকর দিচ্ছি।'

চুন-সুরকি খসিয়ে ইঁটটাকে ঢিলে করে খোপ থেকে বের করে আনা হলো। গর্তের ভেতর একটা হাত ঢুকিয়ে দিল রানা। হাতে কিছু ঠেকল না, শুধু বাতাস। হাত বের করে নিয়ে স্যুটের ঢোলা আস্তিন দিয়ে ল্যাম্পের আলো আড়াল করল ও, ইঙ্গিতে পিয়ানোকেও তাই করার নির্দেশ দিল। 'কিছুক্ষণ অন্ধকার দরকার।' এবার ঝুঁকে পড়ে গর্তের মুখে একটা চোখ রাখল ও। উল্টোদিকে কিছুই দেখা গেল না, শুধু কালো অন্ধকার। নিজেদের নিঃশ্বাস, ক্ষীণ স্রোতের মৃদু কুলকুল, আর ট্রাফিকের অস্পষ্ট ঘরঘর ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সিধে হলো রানা, আস্তিন সরিয়ে আড়াল থেকে বের করল ল্যাম্প। 'ফাঁকটা বড় করি এসো।'

প্রথমটার চেয়ে ফাঁকের চারপাশের ইঁটগুলো সহজে বেরিয়ে এল। একটা হাত আর মাথা গলাবার মত হলো গর্তটা। বেল্ট থেকে ল্যাম্পটা খুলে গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে উল্টোদিকে ঝুলিয়ে দিল ও, তারপর মাথা গলাল।

টানেলের মেঝের চেয়ে ওপারের মেঝে দু'ফিট বেশি উঁচু। থকথকে কাদা, ছেঁড়া পুরানো কাগজ, জমাট বাঁধা সিমেন্টের ছোট বড় টুকরো, আধলা ইঁট, খোয়া আর ভাঙা টালি ছড়িয়ে রয়েছে। রানার বাঁ দিকে কংক্রিটের একটা থাম মেঝে থেকে উঠে আড়াআড়ি গাঁথা ইঁটের কয়েকটা এবড়োখেবড়ো গাঁথুনির আড়ালে হারিয়ে গেছে। হাতের ল্যাম্পটা আরও সামনে বাড়াল ও, আরও একটা থাম চোখে পড়ল। দূরে আরও কয়েকটার অস্পষ্ট আভাস টের পাওয়া যায়। গভীর একটা শ্বাস টেনে গর্ত থেকে ল্যাম্পসহ হাত আর মাথা বের করে আনল ও।

এবার পিয়ানোর দেখার পালা।

'কি দেখছ, জানো, পিয়ানো? একটা বিল্ডিঙের ভিত। হয়তো ব্যাংকেরই।'

ব্যস্ত হাতে আরও কিছু ইঁট সরাল ওরা। মানুষ গলার মত যথেষ্ট ফাঁক হতে রানার পিছু পিছু টানেল থেকে এদিকে চলে এল পিয়ানো। কোথাও কোথাও শিরদাঁড়া বাঁকা করে নিচু হতে হলো ওদেরকে। ল্যাম্পের আলোয় কংক্রিটের পিলার, ইঁটের গাঁথুনি পরীক্ষা করছে। কোন কোন আড়াআড়ি ইঁটের গাঁথুনি এক পিলারের মাথা থেকে আরেক পিলারের মাথায় গিয়ে ঠেকেছে, সামনে এগোবার পথ দিয়েছে বন্ধ করে—যদিও প্রায় সব দেয়ালের গায়েই ছোট-বড়-মাঝারি আকারের ফাঁক আছে, আসা-যাওয়া করা সম্ভব। এদিকের বাতাসে দুর্গন্ধ নেই বললেই চলে। খানিক পর শুকনো নরম মাটির ওপর বসল রানা, প্ল্যানটা খুলল দু'হাঁটুর মাঝখানে, তারপর কম্পাস দেখে বুঝতে চেষ্টা করল কোথায় রয়েছে ওরা।

'উঁহুঁ,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল রানা। 'আমার ভুল হয়েছে। এটা ব্যাংক বিল্ডিঙের ফাউন্ডেশন হতে পারে না। আধুনিক কংক্রিট পিলার নয়, আমরা পুরানো একটা বাড়ির ভিত খুঁজছি। তবে, কাছেপিঠে আছে কোথাও।' ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ প্ল্যানের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমার কি ধারণা শুনবে? এটা পাশের বিল্ডিংটা। নতুন, আটতলা না? ওটা না হয়েই যায় না। এই এলাকায় দু'একটাই তো নতুন বিল্ডিং। তাহলে…' থেমে এদিক ওদিক তাকাল, '…ওদিক। ওদিকে কোথাও।'

কংক্রিট পিলারগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোল ওরা। পায়ের বুট কাদায় দেবে যাওয়ার সময় প্যাচ প্যাচ আওয়াজ করছে। এরই মধ্যে এক একটা তিনগুণ ভারী হয়ে উঠেছে। সামনে একটা পাঁচ ফিট গভীর খাদ দেখা গেল, খাদের গা বেয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে এক লাইনে অনেকগুলো পিলার। মাথার ওপর আড়াআড়ি ইঁটের গাঁথুনিগুলো আর ওদের মাথার মাঝখানে এখন দু'ফিটের মত ব্যবধান। পিলারের লাইন ধরে এগোল ওরা। সামনে পড়ল এবার একটা খাড়া দেয়াল। দেয়ালের গায়ে তিন ফুটী একটা ফাঁক। ফাঁকের ভেতর ল্যাম্প ঢুকিয়ে ভেতরটা আগে দেখে নিল রানা। তারপর গলে বেরিয়ে এল আরেক দিকে। পিছু নিল পিয়ানো।

এখানেও ইঁটের গাঁথুনি আছে, খাড়া দেয়ালের গায়ে ফাঁক আছে, আড়াআড়ি দেয়াল আছে, টিউব আর পাইপ, কিন্তু কংক্রিটের কোন কাজ নেই। এটা কোন আধুনিক ভবনের ভিত হতে পারে না। আবার কাদার ওপর বসে পড়ল রানা। সাইড পকেট থেকে সাদা একটা চৌকো কাগজ বের করে দু'হাঁটুর ওপর ভাঁজ খুলল।

'ওটা কি জিনিস?'

'আমার তৈরি ব্যাংকের ভেতরের স্কেচ,' নিচু গলায় কথা বলছে রানা। স্কেচের একটা অংশের ওপর আঙুল রাখল ও। 'এই মোটা কালো দাগটা ভল্ট। যদিও সঠিক ডাইমেনশন এখনও আমরা জানি না।' ল্যাম্পের আলো ফেলে মাথার ওপরটা দেখল ও। 'তাহলে কোথায়? ওপরটা তো সবখানে একই রকম দেখাচ্ছে।'

সিধে হয়ে নিজের ল্যাম্পের আলোও মাথার ওপরদিকে ফেলল পিয়ানো। 'পুরো ছাদটা চেক করি এসো। কোন না কোন ধরনের একটা ক্লু পেয়ে যেতে পারি।'

চেক করা শুরু হলো। গর্ত দিয়ে গলে ইঁটের গাঁথুনি পিছনে রেখে এগোচ্ছে ওরা। আবারও সামনে রানা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও। 'ক্লু, তাই না? একটা ক্লু তো পেয়েইছি। ওই দেখো…' এক, দুই করে দশ পর্যন্ত গুনল ও, '…দশটা আনকোরা নতুন কংক্রিটের খুঁটি!'

রানার পিছন থেকে সামনে তাকাল পিয়ানো। এক, দুই করে সে-ও গুনল, হ্যাঁ, দশটা খুঁটি। খুঁটিগুলো সিমেন্টের একটা অমসৃণ সিলিংকে ঠেক দিয়ে রেখেছে। সিলিংটা লম্বা চওড়ায় সমান—আঠারো ফিট। খুঁটিগুলোর মাঝখান দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। আদর করার ভঙ্গিতে খরখরে, এবড়োখেবড়ো সিলিঙের গায়ে হাত বুলাতে শুরু করল রানা। 'কোন সন্দেহ নেই, এটাই! অতিরিক্ত ভার ঠেকাবার জন্যেই এই খুঁটিগুলো তৈরি করা হয়েছে।'

সিমেন্টের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বেশি দিনের পুরানো নয়। প্রশ্ন হলো, কতটা পুরু এই সিলিং, আর সিমেন্টের পর কি আছে? ইঁট, নাকি ইস্পাত?

বেশি শব্দ করলে ভল্টের ভেতর বসে থাকা গার্ড শুনতে পাবে। আবার পরীক্ষা না চালালেও নয়। ছেনিটা নিয়ে আবার কাজে নামল রানা। ছেনির ধারাল ডগা দিয়ে সিমেন্টের গা আঁচড়াতে শুরু করল। খুব হালকাভাবে, আস্তে আস্তে, প্রতি বার এক কণা এক কণা করে সিমেন্ট খসাচ্ছে ও।

# সাত

শনিবার বিকেলে মাইকেল আমপালার টেলিফোন পেল রানা। সন্ধ্যায় তার বাড়িতে জরুরী একটা মীটিঙে বসতে চায় সে। পিয়ানো আর দায়াম ছাড়াও তার ক'জন লোক থাকবে, ওদের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে রানাকে। আমপালা আরও আভাস দিল, আলোচনার সময় রোনাল্ড হার্ডি না থাকলেই ভাল হয়।

কোন কারণ ছাড়াই রানার মন খুঁত খুঁত করছিল, টেলিফোন পাবার পর সন্দেহ করল, আমপালার কোন বদ মতলব থাকতে পারে। রোনাল্ডকে টেলিফোন করল ও। বলল, 'তোমাকে আগেই জানিয়েছি, এই অপারেশনে প্রচুর লোক লাগবে। তাদের এক জায়গায় জড়ো করা তোমার দায়িত্ব। কিন্তু তারা কেমন লোক, আমার একটু জানতে হবে।'

'চাও তো দু'চারজনের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারি,' প্রস্তাব দিল রোনাল্ড।

'বেশ। আজ সন্ধে সাড়ে সাতটায় তাহলে আমপালার বাড়িতে ওদেরকে নিয়ে চলে এসো।' এরপর ফোনে সা'দুল্লার সাথে কথা বলল ও।

রানা পৌঁছল সাতটায়। আমপালার স্টাডিতে দু'জন নতুন লোককে দেখল ও। নীচ, পেশাদার খুনী, চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। রানাকে নীরব তাচ্ছিল্যের সাথে লক্ষ করল। আমপালা ওদের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা পেয়ে থেমে যেতে হলো তাকে।

রানা বলল, 'পরিচয় করার আমি কোন প্রয়োজন দেখছি না, আমপালা। তোমার কাছ থেকে আগে শুনতে চাই ওরা কি, কেন এসেছে, কি কাজে লাগবে। ওদের বের করে দাও, তারপর কথা বলো আমার সাথে।'

মুহূর্তে ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে উঠল পরিবেশ। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল দুই পেশাদার খুনী।

'ওর কথায় কিছু মনে কোরো না তোমরা,' দ্রুত বলল আমপালা। ফিরল রানার দিকে। সরল, ভালমানুষের হাসি তার মুখে। 'তুমি ভুলে গেছ, খালেদ,' বলল সে। 'আমাদের সহকারী লাগবে না?'

'লাগবে,' বলল রানা। 'কিন্তু তাদেরকে সব কথা জানাবার দরকার নেই।'

কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল আমপালা, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল সে, ফিরল তার নতুন সহকারীদের দিকে। 'ঠিক আছে, তোমরা লাউঞ্জে গিয়ে বসো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল লোক দু'জন। যাবার সময় বার কয়েক রানার আপাদমস্তক মেপে নিল।

'দরকার মত সহকারী নিতে পারো,' ওরা বেরিয়ে যেতে বলল রানা, 'কিন্তু তার আগে আমার অনুমোদন লাগবে, তাদেরকে আমার পছন্দ হতে হবে। এ তুমি কাদেরকে ধরে এনেছ, এরা তো স্রেফ ভাড়াটে খুনী। গায়ে জোর আছে এমন লোক দরকার আমাদের…'

'ওদেরকে তুমি দুর্বল বলো?'

'না। তবে ওরা নীচ, লোভী, সুযোগ সন্ধানী…

'তুমি আমাকে অপমান করছ, খালেদ!' ভারী গলায় সতর্ক করে দিল আমপালা।

নিঃশব্দে বসে আছে পিয়ানো আর দায়াম। সা'দুল্লা তাদের মুখোমুখি, অনেকটা দূরে একটা সোফায় বসে আছে। শিরদাঁড়া খাড়া।

'এখন থেকে তাহলে এরকম বোকার মত কাজ আর কোরো না,' বলল রানা। 'আর একটা কথা। কাজের লোক যোগাড় করার দায়িত্ব আমি রোনাল্ডকে দিয়েছি। ইতিমধ্যে লোক দিয়ে সাহায্য করেছে ও, তাদের সার্ভিসে আমি খুশি। লোকগুলোর চেহারা দেখেই আমি বুঝেছি, সব্যাই উপযুক্ত কিন্তু লোভী নয়।'

ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকল ফিরোজা। ঢুকেই বুঝতে পারল, আবহাওয়া গরম। বলল, 'রোনাল্ড হার্ডি এসেছে।'

রানার ধারণা হলো, খবরটা শুনে আমপালা খেপে যাবে। কিন্তু না, একটাও কথা বলল না সে। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বেঞ্চের পিছনে রিভলভিং চেয়ারটায় বসল। মাথা নিচু করে বোতল থেকে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে। হাত ঘড়িতে চোখ বুলাল।

ঘরে ঢুকল রোনাল্ড। জোর গলায় বলল, সবাই যাতে শুনতে পায়, 'চারজন লোক নিয়ে এসেছি, খালেদ। ওদের সম্পর্কে আগে শোনো, তারপর বলো কাজ করাবে কি না।'

'ওদের সম্পর্কে সবকিছু জানো তুমি?'

'ওদেরকে আমি পনেরো বছর ধরে চিনি,' বলল রোনাল্ড। 'আমার কথায় ওঠে, আমার কথায় বসে। পুলিসের খাতায় ওদের নাম নেই। খুন-খারাবির সাথে জড়িত নয়। চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে, হারকিউলিস। ভাল টাকা পেলে যে-কোন ঝুঁকি নিতে রাজি।'

'কি বলেছ ওদেরকে?'

'বলেছি ঝুঁকি আছে, খাটনি আছে, মাত্র কয়েক ঘন্টার কাজ, মাথা পিছু দশ হাজার পাউন্ড এনাম।'

'ঠিক আছে, খানিক পর ওদের সাথে আমি কথা বলব,' জানাল রানা।

'আমার লোকদের ব্যাপারে তোমাকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে বলছি আমি,

খালেদ,' বলল আমপালা। 'অন্তত ওদের দু'জনকে কাজে না লাগানো হলে...'

আমপালাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রানা বলল, 'ঠিক আছে, এত করে যখন অনুরোধ করছ, থাকুক ওরা।'

আমপালার পেশীতে ঢিল পড়ল। 'ফিরোজা, ড্রিঙ্ক দাও সবাইকে।' হাতঘড়ি দেখল সে, চেহারায় অস্থিরতা।

ফিরোজা পানীয় পরিবেশন শুরু করল। নিজের অজান্তেই বার বার রানার চোখ তার দিকে চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা আমপালা লক্ষ করল, গম্ভীর হলো চেহারা, কিন্তু কিছু বলল না সে।

'একটা সুখবর আছে,' হুইস্কির গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে বলল আমপালা। 'সিসিলি থেকে কনফারমেশন পেয়েছি, কোন হাঙ্গামা ছাড়াই আমাদের প্লেন কনসাইনমেন্ট নিয়ে ল্যান্ড করতে পারবে। আমাদের প্রাপ্য অংশ খালাস করার পর সাথে সাথে প্লেন নিয়ে চলে যেতে পারবে তোমরা।' রানা, তারপর পিয়ানোর দিকে তাকাল সে। 'তোমরাও একটা সুখবর দিয়েছ—আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল সত্যি আমাদের খুব কাজে আসবে। আমাকে যা বলেছ, সবার সেটা জানা দরকার। শুরু করো।'

রানা চুপ করে আছে দেখে পিয়ানোই শুরু করল, 'টানেল ধরে এগোই আমরা। একেবারে ব্যাংকের তলা পর্যন্ত যাবার একটা পথ আবিষ্কার করি। ভল্টের নিচের অংশ দেখে এসেছি।'

'মাই গড!' আনন্দে, উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে উঠল ফিরোজা। 'সত্যি, খালেদ? সব বলো আমাদের। কি রকম দেখতে?'

'ইঁটের গাঁথুনি আর কংক্রিটের একটা স্তর,' বলল রানা। 'পথটা সহজেই পেয়ে গেছি, সেটা আমাদের ভাগ্য। সহজ পথ, তবে দুর্গন্ধ আছে, পিচ্ছিলও। হঠাৎ করে বান ডাকতে পারে। কিছু ইঁদুরও আছে।'

'দুঃখ হচ্ছে, তোমার সাথে গেলাম না!' আফসোস করল ফিরোজা।

তার দিকে কটমট করে একবার তাকাল আমপালা।

'বড় একটা মেইন সিউয়ার থেকে ভল্টটা দুশো গজ দূরেও নয়,' বলল রানা, 'মেইন সিউয়ারের নাম, কিং'স স্কলারস' পন্ড সিউয়ার।'

'বৃহস্পতিবারে যে ব্যাপারটা আমরা আলোচনা করলাম?' জানতে চাইল আমপালা। 'বেরুবার সম্ভাব্য একটা পথ?'

'হ্যাঁ।'

দায়াম, ব্যাংক আর ভল্টের ব্যাপারে এক্সপার্ট, বলল; 'ভল্ট সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই আমি। শুধু কংক্রিট, নাকি ইস্পাতও আছে?'

'ইস্পাত না থেকে পারে! আমরা প্রথমে কংক্রিটের একটা স্তর দেখি, দেড় ইঞ্চি পুরু,' বলল রানা। 'এরপর রয়েছে ইঁট। একটা ইঁট সরাতে একনাগাড়ে দু'ঘন্টা খাটতে হয়েছে আমাকে। এরপর নিরেট ইস্পাত। কতটা পুরু, বলতে পারি না। ভল্টের দেয়ালের মতই হবে।'

জুলফির নিচেটা চুলকাতে শুরু করে দায়াম বলল, 'তোমার তোলা ফটো দেখে সেটা আমরা আগেই জেনেছি—আট ইঞ্চি পুরু।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল সে।

'নিচে ওখানে কোথাও পাওয়ার লাইনের সুবিধে পাওয়া যাবে?'

'প্রচুর পাইপ আর কেবল দেখেছি,' বলল রানা। 'পাওয়ার লাইন না থেকেই পারে না।'

দায়াম ঘাড় ফিরিয়ে আমপালার দিকে তাকাল। 'আমি নিজে একবার গিয়ে দেখে আসতে চাই।'

'খালেদ, কি বলো?' জিজ্ঞেস করল আমপালা। চোখ রয়েছে হাতঘড়ির ওপর।

'ঠিক আছে, নিয়ে যাব,' রাজি হলো রানা, 'কিন্তু অপারেশনের আগে আর মাত্র একবার ম্যানহোলটা ব্যবহার করতে চাই আমি। এবার নেমে সব কাজ সেরে আসব। কবে, সেটা আমি পরে জানাব, তবে বুধবারের আগে নয়।'

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়াল আমপালা। 'এক্সকিউজ মি,' বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল সে। তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা।

আলোচনার মাঝখানে বাধা। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। সা'দুল্লার সাথে একবার চোখাচোখি হলো ওর, ইশারায় তাকে ধৈর্য ধরার নির্দেশ দিল ও।

দশ মিনিট পর ফিরল আমপালা, ফিরল একেবারে নতুন মানুষ হয়ে। চেহারায় উত্তেজনা আর আনন্দ। রিভলভিং চেয়ারে বসার আগে দুই হাতের তালু এক করে ঘষল বার কয়েক, কি যেন একটা ব্যাপারে সাংঘাতিক সন্তোষ বোধ করছে সে। গাল দুটো ফুলে আছে, মুখে হাসি ধরে না। 'এবার তাহলে ওদেরকে ডাকি, খালেদ?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা। আমপালার ইঙ্গিত পেয়ে স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল পিয়ানো। খানিক পর পেশাদার খুনী দু'জনকে নিয়ে ফিরে এল সে।

রানার ঠোঁটে তির্যক একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। রোনাল্ডের দিকে ফিরল সে, বলল, 'তোমার লোকদেরও ডাকো।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল আমপালা, কিন্তু কি ভেবে চুপ করেই থাকল সে। বেরিয়ে গেল রোনাল্ড, একটু পর আরও চারজনকে নিয়ে ফিরে এল সে। এক এক করে ছয়জনের সাথেই রানার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। এরা কোন গোলমাল বা বেঈমানী করলে দায়ী করা হবে রোনাল্ড আর আমপালাকে, এই শর্তে দলে নেয়া হলো ওদের। যদিও কাজটা কি তা ওদেরকে জানানো হলো না। এরা প্রত্যেকে দশ হাজার পাউন্ড করে পাবে, রানার নির্দেশ পেয়ে ব্রীফকেস খুলে প্রত্যেককে পাঁচ হাজার করে অ্যাডভান্স করা হলো। ঠিক হলো, এরপর যত লোক লাগবে সব যোগাড় করবে রোনাল্ড। রানা বলতে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ছয়জনই।

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। আর কি বিষয়ে আলোচনা দরকার, ভাবছে সবাই।

'একটা ব্যাপারে নতুন করে ফয়সালা হওয়া দরকার,' হঠাৎ গম গম করে উঠল আমপালার ভারী গলা।

কড়ে আঙুলের ডগা দিয়ে নাকের একটা পাশ চুলকাল রানা, মুখ একটু উঁচু

করে তাকাল। 'বলো।'

উঠে দাঁড়াল সা'দুল্লা, ওভারকোটটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাথরুমের দিকে অলস পায়ে এগোল সে।

বাথরুমের দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল আমপালা। তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুমি চেপে গেছ, খালেদ। কাজেই মজুরি সম্পর্কে আগের সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেছে। মজুরি নয়, আমরা এখন ভাগ চাই।'

আশ্চর্য শান্ত আর ঠাণ্ডা দেখাল রানাকে। 'কি কি তথ্য চেপে গেছি?'

'এটা তোমার ব্যক্তিগত অপারেশন নয়,' বলল আমপালা, 'তুমি সৌদি আরবের হয়ে কাজ করছ। সোনাটা ইসরায়েলের, কিন্তু সৌদিদের ধারণা ওদের সোনা লুঠ করে ইসরায়েল এখানে নিজেদের ব্যাংকে জমা রেখেছে। তোমার টেরোরিস্ট গ্রুপের সাথে এই অপারেশনের কোন সম্পর্ক নেই, তাই ওদেরকে কিছু জানাওনি। আমি আরও জেনেছি, সা'দুল্লা সৌদি ইন্টেলিজেন্সের লোক।'

চট করে একবার রোনাল্ডের দিকে তাকাল রানা। 'এসব তুমি কোত্থেকে জানলে?' এখনও সম্পূর্ণ শান্ত ও।

'আমার চ্যানেল আছে, প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন চাইলেই পাই,' বলল আমপালা।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'তা কিভাবে ভাগাভাগি হলে খুশি হও?'

'তোমার অসুবিধে হোক তা চাই না,' বলল মাফিয়া চীফ, হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন উদারতা দেখাতে কার্পণ্য করছে না সে। 'যদি বলি চার ভাগের এক ভাগ পাবে সৌদি আরব, ওদেরকে তুমি রাজি করাতে পারবে না। তার দরকার নেই, একশো টনের অর্ধেকটাই দেব ওদেরকে। বাকি অর্ধেক আমরা সমান ভাগে ভাগ করে নেব।'

'আমরা মানে?'

'আমি, তুমি, রোনাল্ড, পিয়ানো, দায়াম, ফিরোজা আর সা'দুল্লা।'

সোফার পিছনে হেলান দিল রানা, বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এই অন্যায় প্রস্তাবে আমি যদি রাজি না হই?'

'তোমার সাথে আমার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কাজটা যাতে আর কারও সাহায্য নিয়ে করতে না পারো তার ব্যবস্থাও করব আমি—ক্রেডিট ব্যাংকে টেলিফোন করে সব কথা বলে দেব।'

পিয়ানো আর দায়াম বসে আছে পাশাপাশি দুটো সোফায়। সবার কাছ থেকে দূরে একটা আরামকেদারার হাতলে বসেছে ফিরোজা। সা'দুল্লা সেই যে বাথরুমে ঢুকেছে, এখনও বেরোয়নি। রোনাল্ড বসে আছে রানার পাশের একটা চেয়ারে। ফিরোজার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমপালা, পিয়ানো আর দায়ামের কাছে নির্ঘাত আছে। রানার বেল্টের নিচে একটা ল্যুগার পিস্তল।

সা'দুল্লাকে নিয়ে ওরা দু'জন। আর আমপালারা সংখ্যায় চার, ফিরোজাকে যদি ধরা হয়।

'তুমি তাহলে আমার দাবি মেনে নিচ্ছ, খালেদ?' রানাকে চুপ করে থাকতে

দেখে জানতে চাইল আমপালা।
'রোনাল্ড, তুমি কি বলো?' সোফার ওপর সিধে হয়ে বসল রানা।
আমপালার দিকে তাকাল রোনাল্ড।
'ভেবে দেখো,' রোনাল্ডকে বোঝাতে চেষ্টা করল আমপালা, 'ভাগাভাগি হলে এক একজনের ভাগে পড়বে সাত টনেরও কিছু বেশি সোনা। অথচ রানা তোমাকে মাত্র একলাখ ডলার দিতে চেয়েছিল।'
নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে রোনাল্ড, কি বলবে বুঝতে পারছে না।
'পিয়ানো, তুমি কি বলো?'
'আমি আমপালার সাথে আছি,' বলল পিয়ানো। 'ওর কথাই আমার কথা।'
'দায়াম?'
'ভাগ চাই।'
'ফিরোজা?'
ধীরে ধীরে রানার দিকে ফিরল ফিরোজা। সে কিছু বলার আগেই আমপালা বলল, 'ও কি বলবে। আমার কথাই ওর কথা।'
'আর আমার কথা হলো,' বলল রানা, 'কারও অন্যায় দাবি আমি মেনে নেব না। আগেও আমি সাবধান করে দিয়েছি, আমাকে তোমরা কেউ দুর্বল ভেব না। সব ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দিচ্ছ তুমি, তবু আমরা কাজটা করব। জানি, তার আগে তোমাদের সাথে লড়ে জিততে হবে আমাদের।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'উপায় যখন নেই, লড়ব। বলো তো এখুনি, এই ঘরেই ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলতে পারি।'
চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আমপালা। 'মানে?' তার হাতে একটা পিস্তল দেখা গেল।
পিস্তল বেরিয়ে এসেছে পিয়ানো আর দায়ামের হাতেও। আমপালার সাথেই দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা।
মুচকি হাসল রানা। 'বাথরুম থেকে তোমাদের সবাইকে কাভার দিচ্ছে সা'দুল্লা। ওভারকোটের ভেতর লুকিয়ে একটা কারবাইন নিয়ে এসেছে আজ ও। আর ব্রীফকেসে আছে কয়েকটা গ্রেনেড।'
রানার কথা শেষ হবার আগেই বাথরুমের দরজা সামান্য একটু ফাঁক হলো, বেরিয়ে এল কারবাইনের ব্যারেল। বাথরুমের ভেতর থেকে সা'দুল্লার গলা ভেসে এল, 'অর্ডার করো, খালেদ।'
'তথ্য চেপে রাখার অভিযোগ সত্যি নয়,' বলল রানা। 'আমি প্রথমেই জানিয়েছিলাম কাজটা আমার নয়, অন্য লোকের, আমি করে দিচ্ছি। আর, সোনাটা ইসরায়েলের নাকি সৌদি আরবের, সে-কথা তোমাদের বলিনি, কারণ বলার কোন প্রয়োজন দেখিনি আমি। সা'দুল্লা সৌদি ইন্টেলিজেন্সের লোক, খোঁজ নিলে যে-কেউ জানতে পারবে এটা, কাজেই তোমার শেষ অভিযোগও ধোপে টেকে না।' সুযোগের অপেক্ষায় ছিল রানা, পেয়েই সেটার সদ্ব্যবহার করল। আমপালা ছাড়া কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই, এই সময় তাকে উদ্দেশ্য করে একটা চোখ টিপল ও। তারপর বলল, 'সবাইকে ভাগ দিতে পারব না, এ-কথা আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছি। খুব কম লোককে দিয়ে যদি কাজটা সারা যেত, তাহলে অবশ্য আলাদা

কথা ছিল। কিন্তু সংখ্যায় আমরা অনেক, একজনকে ভাগ দিলে বাকি সবাই-ও চাইবে। কাজেই কাউকেই তা দেয়া যাচ্ছে না।'

মুখ নিচু করে চিন্তা করছিল রোনাল্ড, রানা থামতে মুখ তুলল সে, বলল, 'আমি রানার সাথে একমত। ও আমাদেরকে আগেই সব বলে নিয়েছে। আমরাও ওর শর্তে কাজটা করব বলে রাজি হয়েছি। ওর মনে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই, মজুরির অর্ধেক পেমেন্ট করে দিয়ে সেটা প্রমাণও করেছে ও। না, আমি ভাগ চাই না।'

সবাই আমপালার দিকে তাকিয়ে আছে। এই প্রথম সানগ্লাস খুলে ফেলেছে আমপালা। ভাটার মত টকটকে লাল চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

সুযোগ পেয়ে আরেকবার চোখ টিপল রানা।

আরও কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর কাঁধ ঝাঁকাল আমপালা, তাকাল পিয়ানো, দায়ামের দিকে। 'তোমরা কি বলো?'

'সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তোমার,' বলল পিয়ানো।

'ঠিক,' সায় দিল দায়াম।

আবার কাঁধ ঝাঁকাল আমপালা। বলল, 'দেখা যাচ্ছে, রানার সাথে শত্রুতা করে লাভ নেই। আমরা সহযোগিতা না করলে কাজটা হয়তো করতে পারবে না সে, কিন্তু আমরাও ওই সোনা ছুঁতে পারব না। তারচেয়ে ওর শর্তেই কাজটা করা ভাল। তা করলে আমরা ঠকব, সন্দেহ নেই, তবু আর কোন উপায়ও তো দেখছি না।'

'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল,' বাথরূমের ভেতর থেকে ফোঁড়ন কাটল সা'দুল্লা।

হেসে উঠল আমপালা, বেসুরো লাগল কানে। 'তা যা বলেছ! ওহে, বেরিয়ে এসো আমাদের ঝগড়া মিটে গেছে।'

'খালেদ বলুক।'

'মজুরি নিয়ে আর কোন অসন্তোষ নেই তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'দায়াম? পিয়ানো?'

দু'জনেই মাথা নাড়ল। রানার দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে আমপালা।

'চলে এসো, আবদুল্লা,' বলল রানা। 'ঝামেলা চুকেছে। এবার কাজের কথা হোক।'

বেশ কিছু সরঞ্জাম লাগবে। সেগুলো যোগাড় করা, তারপর সিউয়ারে নামানো ঝামেলা আর ঝুঁকির কাজ। আমপালাকে আশ্বস্ত করল রানা, বলল, 'রোনাল্ডের ভাই জ্যাকের সাথে আমার কথা হয়েছে, সে-ই সব যোগাড় করবে।'

'সিউয়ারে ওগুলো নামানো হবে কিভাবে?'

'পথ অনেকগুলোই আছে,' বলল রানা। 'রিগের সাথে আরেকবার কথা বলে নিরাপদ একটা বেছে নেব।'

'ভেরি গুড,' বলল আমপালা। একটা প্যাডে নোট নিল সে। 'এবার, সোনা

নিয়ে বের হওয়ার পথ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।'

এ-ব্যাপারে প্রচুর মাথা ঘামিয়েছে রানা। ম্যাপ আর প্ল্যান নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাপজোক করেছে, দিনের পর দিন ওয়েস্ট এন্ডের রাস্তাগুলো ধরে হেঁটেছে, প্ল্যানের সাথে মিলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে কোন্ রাস্তার নিচে ঠিক কি আছে। বলল, 'বেরুবার রাস্তা হিসেবে হাইড পার্ক কর্নারটা সবচেয়ে ভাল। রেলওয়ে স্টেশন পিকাডিলি লেনে, কাছেই। টাইবার্ন নদীটাও দূরে নয়। আগামী হপ্তায় আরও ভাল করে মাপজোক করে দেখে নেব। রিগের সাথে কথা বললেও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।'

'তাহলে তো আমারও যাওয়া দরকার,' এই প্রথম কথা বলল ফিরোজা। 'আমি কো-রাইটার, ওর সাথে আমাকে না দেখলে কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে লোকটা।'

বোধহয় রাগেই কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারল না আমপালা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, তা ঠিক।' দায়ামের দিকে ফিরল সে, জানতে চাইল, 'তোমার কি সত্যি সত্যি ষাট পাউন্ড বিস্ফোরক লাগবে, দায়াম? জিনিসটা বিপজ্জনক, যত কম লাগে ততই ভাল।'

মাথা নাড়ল দায়াম। 'ষাট পাউন্ডের কমে হবে না। ঠিকমত নাড়াচাড়া করতে জানলে ওটা বিপজ্জনক কিছু না।'

'তবু, আমার ভয় করে। কত লোককে দেখলাম, নিজেরাই মারা পড়েছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল দায়াম। 'অ্যামেচার।'

'ঠিক আছে, যা ভাল বোঝো,' বলল আমপালা। তাকাল রানার দিকে। 'সহকারী হিসেবে যাদের আনবে রোনাল্ড, তাদেরকে অস্ত্র দেয়া হবে?' জানতে চাইল সে।

'দিলেও বিপদ, না দিলেও বিপদ,' বলল রানা। 'অবশ্যই চাইবে ওরা। চিন্তা করে দেখি।'

'সিদ্ধান্তটা আমাকে জানিয়ো কিন্তু।'

'একটা ব্যাপার নিয়ে কেউ আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না,' বলল রানা। 'ব্যাংক থেকে সোনা নিয়ে রওনা হবার পর কি ঘটবে, ভেবে দেখেছ? দুনিয়ার সবার চোখ থাকবে আমাদের ওপর, তাই না?'

'তা থাকবে, কিন্তু কেউ আমাদের টিকিটিও ছুঁতে পারবে না।'

'ভুল। আমি বলতে চাইছি, আমরা যখন প্লেনে থাকব, তখন কি ঘটবে?'

'কি ঘটবে?'

'একশো টন সোনা মেরে দেব, আর ইসরায়েল চুপ করে বসে থাকবে বলে আশা করো তুমি?'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল আমপালা। 'তাই তো!'

'ইসরায়েলি এয়ারফোর্স সম্পর্কে আমরা জানি,' বলল রানা। 'অন্য দেশের ওপর দিয়ে উড়ে এসে হলেও আমাদেরকে ওরা বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে। ওদের মিরেজ আছে, আছে ফ্যান্টম।'

ভুরু কুঁচকে খানিক চিন্তা করল আমপালা। তারপর বলল, 'প্লেন, এয়ারফোর্স

এসব সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই, কিন্তু ইসরায়েল থেকে সিসিলি অনেক দূর, এতটা দূর কি আসবে ওরা? আসতে পারবে?'

'নিজের স্বার্থটাই শুধু দেখবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভুলে গেছ, তোমাদেরকে সিসিলিতে নামিয়ে দেয়ার পর আমরা রিয়াদে যাব?'

'দুঃখিত,' মাফ চাইল আমপালা। 'এর তাহলে সমাধান কি?'

'যতক্ষণ ইংল্যান্ডে থাকব ততক্ষণ আমরা নিরাপদ,' বলল রানা। 'কিন্তু ইংল্যান্ডের আকাশ-সীমা পেরোবার সাথে সাথে ইসরায়েলি এয়ারফোর্স আমাদেরকে বাধা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা সিসিলিতেও নামতে পারব না। এর সমাধান, কর্মকর্তা গোছের একজন ইসরায়েলিকে জিম্মি হিসেবে প্লেনে আটকে রাখা। এমন একজন লোক, যাকে হারাতে চাইবে না ওরা।'

'ফিরোজা, হুইস্কির একটা বোতল দাও আমাকে,' হুকুম করল আমপালা।

চেয়ার ছেড়ে উঠল ফিরোজা।

আমপালা রানার দিকে ফিরল। 'হ্যাঁ, এটাই একমাত্র সমাধান। তেমন বড় কোন সমস্যা নয়। কিন্তু তেমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে? ইংল্যান্ড থেকে আর কোন ইসরায়েলিকে কিডন্যাপ করা ঠিক হবে না। ওরা তাহলে বুঝে ফেলবে এসব কিডন্যাপিঙের সাথে একশো টনের একটা সম্পর্ক আছে। স্রেফ সরিয়ে ফেলবে, হলফ করে বলতে পারি।'

রানা বলল, 'ইসরায়েল থেকেও কাউকে ধরে নিয়ে আসা যাচ্ছে না, বড় বেশি ঝুঁকি।'

'রাইট।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দরজার কাছেই একটা চেয়ারে বসেছে সা'দুল্লা, এই প্রথম কথা বলল সে, 'স্পেন থেকে? হোমরাচোমরা দু'একজন মারবেলা-য় প্রায়ই থাকে।'

আমপালার সামনে ডেস্কের ওপর হুইস্কির একটা বোতল রাখল ফিরোজা। বোতল থেকে হাতটা সে সরিয়ে নেয়ার আগেই হাত বাড়িয়ে বোতলের গলাটা মুঠোর ভেতর চেপে ধরল আমপালা। দূর থেকে বোঝা গেল না কি করল, ব্যথায় উফ্ করে উঠল ফিরোজা। ডেস্কের দিকে পিছন ফিরল সে, রানা লক্ষ করল যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে আমপালার নাকে একটা ঘুসি মারে।

'সাজেশনটা মন্দ নয়,' বলল আমপালা। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'সা'দুল্লা, দায়িত্বটা তুমিই নাও না কেন?'

'বলো কি!' ঘাবড়ে গেল সা'দুল্লা। 'ইসরায়েলিদের সাথে বডিগার্ড থাকে…'

'আমি তোমাকে একটা বুদ্ধি বাতলে দেব,' বলল রানা। 'দেখবে, পানির মত সহজ হয়ে যাবে কাজটা। তবে, যাওয়া আসা একটা সমস্যা, বেশি সময় পাবে না তুমি।'

'দরকার মনে করলে আমি একটা লীয়ার জেট ধার দিতে পারি,' বলল আমপালা। 'ওটায় আমার শেয়ার আছে।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়। ফ্লাইট প্ল্যান দেখে যদি একটা ব্যবস্থা করতে

পারো, অনেক সময় বেঁচে যায়।'

ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে নিল আমপালা। চোদ্দ বার ডায়াল করল সে, তারমানে ইংল্যান্ডের বাইরে কল করছে। লাইন পেতে দেরি হলো না। মাতৃভাষায় কিছুক্ষণ কথা বলল সে। তারপর হাসি মুখে রেখে দিল রিসিভার। 'ব্যবস্থা হয়ে গেল। মঙ্গলবার দুপুরে, লোটিন এয়ারপোর্টে। খুব বেশি সময় পাবে না তুমি, সা'দুল্লা। মালাগা থেকে রওনা হবে, খুব বেশি দেরি হলে, মাঝরাতে। চক্কর মেরে একবার দেখে আসার জন্যে যথেষ্ট সময়, কি বলো?'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট।'

'আমি তোমাকে এক লোকের ঠিকানা দেব,' বলল রানা, 'রড গডউইল। সে তোমাকে সাহায্য করবে।'

খুঁটিনাটি আরও কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করল ওরা, তারপর মীটিং ভেঙে গেল। রানা বাদে, একে একে বিদায় নিল সবাই। এতক্ষণ রানাকে একা পাবার অপেক্ষায় ছিল আমপালা, প্রথম সুযোগেই প্রশ্নটা করল সে, 'তখন তুমি আমাকে কিসের ইঙ্গিত দিলে?'

উত্তর দেয়ার আগে চেহারায় আত্মসমর্পণের একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল রানা। 'সত্যি কথা বলতে কি, তোমার সাহায্য ছাড়া কাজটা আমরা করতে পারব না, কারণ এটা তোমার এলাকা। ভাগের জন্যে এতই যখন জেদ ধরছ, সেটা তোমাকে দেয়াই আমার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে, কিন্তু তাই বলে সবাইকে ভাগ দিতে আমি রাজি নই।'

'ঠিক আছে, আমার ভাগটা পেলেই আমি খুশি।' বলল বটে আমপালা, কিন্তু রানার এই নতুন প্রস্তাবে যতটা খুশি হওয়ার কথা ততটা খুশি তাকে দেখল না। 'ঠিক কতটা দিতে চাইছ আমাকে?'

'তুমি যা দাবি করেছ,' বলল রানা। 'পঞ্চাশ টনের সাত ভাগের এক ভাগ। সিসিলিতে নেমে বাকি টাকা দিয়ে সবাইকে বিদায় করে দেব, তারপর সাত টন নিয়ে নেমে যাবে তুমি।'

রানার পিঠ চাপড়ে দিল আমপালা। 'সত্যি আমি খুশি হয়েছি, খালেদ। ধন্যবাদ।'

উঁহু, খুশি তুমি হওনি, ভাবল রানা, সবটা মেরে দেয়ার তালে আছ।

আমপালার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইস্ট এন্ডের দিকে রওনা হলো রানা। রোনাল্ডের সাথে কথা বলবে ও, তারপর নিজের চোখে দেখে আসবে ন্যাট ম্যানারকে।

দিন কয়েক পরের ঘটনা। ওয়াটার বোর্ড অফিস থেকে বাড়ি ফিরল ফিরোজা। হল ঘরে দাঁড়িয়ে সোয়েটার খুলছে, আমপালা ঢুকতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে। আজ সারাটা দিনই উইগমোর স্ট্রীটের মনিহারী দোকানে থাকার কথা ছিল আমপালার।

সামনে এসে দাঁড়াল আমপালা। তার চোখে এমন কিছু একটা রয়েছে, ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল ফিরোজা। হাতঘড়ি দেখল আমপালা। 'চারটে পঁচিশ। তিনটে

থেকে বাড়িতে রয়েছি আমি। সকাল দশটায় বেরিয়ে এই ফিরলে? কোন্ জাহান্নামে ছিলে এতক্ষণ?'

'মি. রিগের সাথে সিউয়ারে, তুমি তো জানো।'

খপ্ করে ফিরোজার একটা কব্জি চেপে ধরল আমপালা। 'সাথে তোমার নাগর ছিল, তার নামটা বলছ'না কেন?'

ব্যথায় কুঁচকে উঠল ফিরোজার মুখ। হাত ছাড়িয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। 'ছাড়ো···লাগছে···।'

'আর কোথায় গিয়েছিলে?' জানতে চাইল আমপালা। ফিরোজার হাতে আরও জোরে চাপ দিল সে।

গুঙিয়ে উঠল ফিরোজা। চোখে পানি এসে গেল তার। 'খালেদের সাথে, একটা রেস্তোরাঁয়···আমরা লাঞ্চ খেয়েছি···'

হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল আমপালার শরীরে। ফিরোজার হাত ছেড়ে দিয়ে তার কাঁধ ধরল সে, আধ পাক ঘুরিয়ে নিজের দিকে পেছন ফেরাল তাকে। শার্টের চেইন ধরে একটা টান দিল, বেরিয়ে পড়ল ব্রেসিয়ার। আবার আধ পাক তাকে ঘোরানো হলো। এবার ফিরোজার জিনসে হাত দিল আমপালা। বোতাম খুলে চেইন ধরে টান দিল, হাঁটুর কাছে নেমে এল জিনস। তাল হারিয়ে ফেলে পড়ে যাচ্ছিল ফিরোজা, আমপালার মাথা ধরে ফেলে সামলে নিল কোনমতে। এই সুযোগে নিচু হলো আমপালা, ফিরোজার পেটে একটা কাঁধ ঠেকাল, তারপর সিধে হলো।

ফিরোজাকে কাঁধে তুলে নিয়ে লাউঞ্জে ঢুকল আমপালা। দানবটার চওড়া পিঠে দমাদম কিল মারছে ফিরোজা, কিন্তু কোন লাভ হলো না। হাতলহীন একটা কাঠের চেয়ারে বসল আমপালা। নিজের দুই ঊরুর ওপর উপুড় করে শুইয়ে রেখেছে ফিরোজাকে। ফিরোজার পা ঝুলে পড়েছে, ঝুলে পড়েছে মাথা। তার পিঠে একটা কনুই ঠেকাল আমপালা, যেন একটা পেরেক গাঁথল। অপর হাতটা দিয়ে ফিরোজার প্যান্টি হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে দিল। বলল, 'কতবার বলেছি, আমিই তোর জীবনে একমাত্র পুরুষ! কতবার বলেছি, আর কারও দিকে তাকাবি না! বেশ্যা হবার শখ হয়েছে, না? বেশ্যা মাগীদের কিভাবে শায়েস্তা করতে হয়, দেখ্।'

ফিরোজার ফর্সা পিঠ থেকে শুরু করে কোমর, নিতম্ব সহ হাঁটু পর্যন্ত কোথাও কোন আবরণ নেই। চাপড় মারতে শুরু করল আমপালা, প্রথমে ধীরে ধীরে, যেন আদর করছে। হাঁটুর উল্টো দিক থেকে ওপর দিকে উঠছে হাত, সেই সাথে চাপড়ের আওয়াজটাও বাড়ছে।

নগ্ন নিতম্বের ওপর উঠে এল শক্ত, চওড়া হাত। চাপড়ের আওয়াজ এখন পাশের ঘরগুলো থেকেও শোনা যাচ্ছে। লাল হয়ে উঠল চামড়া, মনে হলো ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসবে। ঢিল পড়েছে ফিরোজার পেশীতে, শুধু প্রতিটি আঘাতের সাথে শিউরে শিউরে উঠছে তার শরীর। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে মুখের চেহারা। বিস্ফারিত চোখ দুটো দিয়ে দরদর করে পানি গড়াচ্ছে। চিৎকার করে কাঁদতেও পারছে না সে, শক্তি পাচ্ছে না। আহত পশুর মত গোঙাচ্ছে শুধু।

এক সময় ক্লান্ত হয়ে থামল আমপালা। ফুলে উঠেছে তার আঙুলগুলো, ব্যথা করছে। তার ঊরুর ওপর নিঃসাড় পড়ে রয়েছে ফিরোজা।

'এই হলো বেশ্যার শাস্তি। তুই কার মেয়েলোক, সেটা বোঝালাম।' ফিরোজার চুলের গোছা ধরে তার মুখটা নিজের দিকে ফেরাল সে। 'কার মেয়েলোক তুই, ফিরোজা?'

এখনও জ্ঞান হারায়নি ফিরোজা, অস্ফুট কণ্ঠে সে মুখস্থ বুলি আওড়াল, 'তোমার, আমপালা, আমি তোমার মেয়েলোক।'

# আট

ইসরায়েলি দূতাবাস। অক্টোবরের ঝিরঝিরে, স্নিগ্ধ বাতাস ঢুকছে জানালা দিয়ে, পিঠে নরম রোদ নিয়ে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে অ্যামব্যাসাডার কোয়ায়েল হেগেন। ডেস্কের ওপর তার সামনে খোলা একটা ফাইল, কিন্তু তাকিয়ে আছে নাক বরাবর সাদা দেয়ালে। মনটা আজ খুশি তার, কারণ তেল আবিব থেকে খবর এসেছে নতুন মন্ত্রীসভায় জুনিয়র মন্ত্রী হিসেবে তাকে নেয়ার একটা প্রস্তাব তোলা হবে। দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে ন্যাট ম্যানারের কথা এই মুহূর্তে তার মনে নেই।

তিরস্কারের ঝাঁঝ নিয়ে খেঁকিয়ে উঠল প্রাইভেট টেলিফোনটা। বটল-গ্রীন রঙের রিসিভার কানের কাছে তুলল হেগেন। অপরপ্রান্তের কথা শোনার সময় খুশি খুশি ভাবটা মন থেকে উবে গেল। প্রথমে প্রচণ্ড একটা আঘাত পেল সে, তারপর কঠোর হয়ে উঠল চেহারা, সবশেষে শোকে কাতর দেখাল তাকে। নিজের পরিচয় দেয়ার পর একটা কথাও বলেনি, পাঁচ মিনিট ধরে শুধু শুনেই গেল। তারপর বলল, 'ধন্যবাদ, ডুরেল। খানিক পর তোমাকে আমি রিঙ করব।' খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রেখে দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকল সে।

দু'মিনিট পর নক করে তার সেক্রেটারি ঢুকল অফিস কামরায়। মুখ থেকে হাত সরিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকাল হেগেন। সেক্রেটারির অবাক চেহারা দেখে এদিক ওদিক মাথা নাড়াল সে, বলল, 'ওকে পাওয়া গেছে। ম্যানারকে পাওয়া গেছে।' ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখাল সেক্রেটারিকে। 'বসো। না, তার আগে আমাকে খানিকটা ব্র্যান্ডি দাও।'

ব্র্যান্ডির গ্লাসে ঘন ঘন কয়েকটা চুমুক দিল হেগেন। 'তরুণ এক দম্পতি তাদের কুকুরকে নিয়ে রাত কাটাতে এপিং ফরেস্টে গিয়েছিল। অক্টোবরের শেষ, এই সময় অনেকেই ওখানে তাঁবু ফেলে রাত কাটায়। ওদের কুকুর মাটি খুঁড়ে লাশের একটা হাত বের করে ফেলে।'

'গুড গড! কিন্তু কে? কেন?'

প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলে চলল হেগেন, 'বেচারা ম্যানারকে টরচার করা হয়েছে। পায়ের পাতায় ফুটো পাওয়া গেছে—পেরেক গাঁথা হয়েছিল। ধারাল কিছু দিয়ে তুলে ফেলা হয়েছে একটা চোখ।'

'মাই গড! মাই গড! চেনা গেছে…?'

'সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্যার ডুরেলের লোকজন লাশ দেখেছে। ওদের কাছে ফটো আছে। সনাক্ত করার জন্যে আমাকে ল্যাফটনে যেতে হবে, লাশটা ওখানে নিয়ে আসা হয়েছে। দেশে তুমি ওর আত্মীয়স্বজনদের দুঃসংবাদটা দেবে।'

'ঠিক আছে, কিন্তু উনি মারা গেলেন কিভাবে…'

'গুলি খেয়ে। ওর মাথার পিছনে গুলি করা হয়েছে। পুলিস বলছে, মাত্র দিন কয়েক আগে খুন করা হয়েছে ওকে।'

'কিন্তু কেন?'

চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে পায়চারি শুরু করল অ্যামব্যাসাডর। 'টরচার, খুন, তারপর গোপনে মাটি চাপা দেয়া—বুঝতে পারছ না? টাকার জন্য নয়। স্যার ডুরেল বলছেন, রোনাল্ড ভাইদের কাজ এরকমই হয়ে থাকে। ইনফরমেশন, ইনফরমেশন! ম্যানারের কাছ থেকে ইনফরমেশন আদায় করার জন্যেই তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। আমি বরং আবার কথা বলি স্যার ডুরেলের সাথে।' রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে।

ফোনে অনেকক্ষণ কথা বলার পর রিসিভার নামিয়ে রাখল হেগেন। আবার সে পায়চারি শুরু করল। 'এখন পুলিস ইনভেস্টিগেশন চালাবে। স্যার ডুরেল বলছে, এই কেসে কোথাও পৌঁছুতে পারবে না ওরা। রিপোর্টারদের কাছেও ব্যাপারটা গোপন রাখা যাচ্ছে না।'

'যদি টপ সিক্রেট ইনফরমেশন…'

'হ্যাঁ, আমাদের ধরে নিতে হবে খুন হবার আগে মুখ খুলেছিল বেচারা,' বলল হেগেন। 'স্যার ডুরেল আমাদের সোনার ব্যাপারে খুব বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বলছেন, কাজটা সৌদি ইন্টেলিজেন্সের হতে পারে। ওরা হয়তো ওদের সোনা ফেরত পাবার চেষ্টা করছে।'

'তাহলে উপায়?'

'এটা একটা সম্ভাবনা মাত্র,' বলল হেগেন। 'কাজটা কাদের তা না জানা পর্যন্ত বোঝা যাবে না ঠিক কি ধরনের ইনফরমেশন আদায় করেছে ওরা। তবু, সোনার ব্যাপারে আরও সতর্ক হব আমরা। এটাই এখন আমাদের টপ প্রায়োরিটি। আমি চাই এখুনি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করো তুমি।'

'ইসারায়েলি কূটনীতিকের লাশ উদ্ধার।'

প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হেডিঙে খবরটা ছেপেছে 'ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড'। গত শনিবার থেকেই এই রকম একটা কিছু আশা করছিল রানা, তাই খবরটা ওকে বিচলিত করতে পারল না।

গত শনিবার দিন আমপালার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রোনাল্ডের সাথে দেখা করেছিল রানা। রোনাল্ডকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, ও আসছে। ওর জন্যে বাড়িতে অপেক্ষা করছিল রোনাল্ড। তাকে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেনি রানা। খানিক আগে আমপালার বাড়িতে দেখা রোনাল্ডের সাথে এই রোনাল্ডের যেন কোন মিল নেই। চোখ দুটো টকটকে লাল, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, হাত দুটো শক্ত মুঠো

পাকিয়ে অস্থিরতার সাথে পায়চারি করছে ঘরময়। 'খালেদ, সর্বনাশ হয়ে গেছে! এই মাত্র খবর পেলাম, আমার দু'জন সহকারীকে খুন করে কারা যেন কিডন্যাপ করেছে ন্যাট ম্যানারকে।'

'কার সোনা, কি বৃত্তান্ত এসব আমপালা কোত্থেকে জেনেছে বোঝা গেল,' বলল রানা, কঠোর হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'কিন্তু এর জন্যে আমি তোমাকে দায়ী করছি, রোনাল্ড। একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে তুমি সেটা পালন করতে পারোনি।'

পায়চারি থামিয়ে দুম করে দেয়ালে একটা ঘুসি মারল রোনাল্ড। 'আমপালাকে আমি দেখে নেব···'

'যদি পারো নেবে বৈকি,' রোনাল্ডকে বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু আমার কোন সাহায্য তুমি পাবে না। এটা তোমার সাথে আমপালার ব্যক্তিগত শত্রুতা, এতে আমার কোন ভূমিকা নেই। আর, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, কাজটা উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ওর সাথে কোন গোলমাল করবে না।'

'কেন, তোমার সাহায্য পাব না কেন?' বিস্মিত দেখাল রোনাল্ডকে। 'আমপালা ম্যানারকে কিডন্যাপ করায় তোমার ক্ষতি হয়নি?'

'ক্ষতিটা তুমি করেছ। ম্যানারের দায়িত্ব আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম,' বলল রানা। 'প্রতিশোধ যদি নিতে হয়, তুমি নেবে।'

'তুমি বলতে চাইছ, আমপালার সাথে তোমার কোন ঝগড়া নেই?' পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রোনাল্ড।

'না,' তিক্ত একটু হেসে বলল রানা, 'তা বলতে চাইছি না। আমপালার সাথে আমারও শত্রুতা আছে, কিন্তু সেটার কারণ অন্য, তোমাকে এক হাত দেখিয়েছে বলে নয়।' এরপর ওখান থেকে চলে আসে রানা।

আজ উইগমোর স্ট্রীটের দোতলায় ওঠার সময় সম্পূর্ণ শান্ত দেখাল ওকে। ঘরে ঢুকে দেখল, চোখে বিনকিউলার তুলে তেল আবিব ক্রেডিট ব্যাংকের দিকে তাকিয়ে আছে আমপালা। ওর পায়ের শব্দে চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ঘুরল সে, সানগ্লাসটা পরল, হাসি হাসি মুখে জানতে চাইল, 'কি খবর, খালেদ?'

হাতের ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডটা আমপালার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা, কোন কথা বলল না।

'কি ব্যাপার?' বলে কাগজের ভাঁজ খুলল আমপালা। খবরটা পড়ার সময় ভুরু কুঁচকে উঠল তার। বার দুয়েক মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'সর্বনাশ! ছি-ছি, রোনাল্ড একি করল!'

'শনিবার সকালে একদল লোক রোনাল্ডের দু'জন সহকারীকে খুন করে ম্যানারকে কিডন্যাপ করে,' বলল রানা। 'রোনাল্ডের নয়, কাজটা তাদের।'

'রোনাল্ড বলল, আর তুমিও অর কথা বিশ্বাস করলে!'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা, বলল, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের হাতে তদন্তের ভার পড়েছে। দূতাবাসে ওরা সবাই আতঙ্কিত। গার্ডের সংখ্যা রাতারাতি দ্বিগুণ করা হয়েছে। প্রতিটি অফিসারকে পাহারা দিচ্ছে দু'জন করে বডিগার্ড। এসব দেখে বোঝা যায়, একশো টন সোনা নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে ওরা। বলা যায় না, ব্যাংক থেকে সরিয়েও ফেলতে পারে।'

'সরিয়ে ফেলবে?' মুহূর্তের জন্যে দিশেহারা দেখাল আমপালাকে, তারপর জোর দিয়ে বলল সে, 'আমার তা মনে হয় না। একজন অফিসার খুন হয়েছে বলে ওরা ধরে নেবে সোনা লুঠ করার প্ল্যান করছে কেউ, এটা সম্ভব না। তাছাড়া, সরানো কি চাট্টিখানি কথা—এ-ক-শো টন। সরিয়ে রাখবেই বা কোথায়, নিরাপদ একটা জায়গা লাগবে না?' খানিক চিন্তা করল সে। 'আজ রাতে সা'দুল্লা স্পেন থেকে ফিরছে, তাই না? তোমার কিছু কিছু কাজ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে কাল তুমি একবার ব্যাংকে যাও। ওখানে কিছু যদি বদলে থাকে, জানতে পারবে।'

'হুঁ।'

'আজ সকালে কেমন দেখলে সিউয়ার?' জিজ্ঞেস করল আমপালা। 'দেখে দায়াম কি বলল?'

'পাওয়ার লাইন আছে দেখে খুশি হয়েছে ও,' বলল রানা। 'খরচ কিছু বাড়বে আমার, কারণ ব্রিদিং অ্যাপারেটাস না কিনলেই নয়। গ্যাসের ঝাঁঝ আজ খুব বেশি ছিল, এক সময় ভয় হচ্ছিল, বোধ হয় ফিরতেই পারব না।'

'ভল্ট দেখে কি বলল দায়াম?'

'বলল, ওটা কোন সমস্যা নয়।'

'ভেরি গুড,' চেয়ারের ওপর একটা পা তুলে দিল আমপালা, কয়েক সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর ঠাণ্ডা সুরে বলল, 'তোমার সাথে একটা ব্যক্তিগত কথা ছিল, খালেদ।'

শ্রাগ করল রানা। 'শুনছি।'

'কাল ফিরোজাকে নিয়ে ওয়াটার বোর্ড অফিসে গিয়েছিলে তুমি,' শান্ত সুরে বলল আমপালা। 'বাড়ি থেকে দশটার সময় বেরোয় ও, ফেরে সাড়ে চারটের দিকে।'

'হ্যাঁ, সিউয়ার থেকে উঠে ওকে আমি লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম,' বলল রানা।

'সিউয়ারে তোমরা কতক্ষণ ছিলে?'

'ঘণ্টা তিনেক।'

'তিন ঘণ্টা ওই নোংরার মধ্যে থাকার পর কাপড় বদলাবার দরকার হলো না, লাঞ্চ খেতে রেস্তোরাঁয় যেতে পারলে তোমরা?' প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল আমপালা। তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেল রানা। 'খালেদ, তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। ফিরোজা আমার কাছে শুধু একটা মেয়ে নয়, ও আমার বেঁচে থাকার অবলম্বন, একটা ঐশ্বর্য। ওর ওপর কেউ যদি চোখ দেয়, আমি তার চোখ তুলে নেব।'

'বেঁচে থাকার অবলম্বন?' ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তাহলে ওকে মারধর করো কেন?'

'ও! এসব কথাও তাহলে তোমার কানে তুলেছে হারামজাদী?'

'না, কেউ বলেনি আমাকে। ওর সাথে তুমি যে ব্যবহার করো তা থেকেই আন্দাজ করে নিয়েছি।'

'শুধু ফিরোজার ব্যাপারেই নয়,' হুমকি দেয়ার সুরে বলল আমপালা, 'আমার

ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে তোমাকে আমি নাক গলাতে নিষেধ করছি, খালেদ।'

'কিন্তু আমার যে একটা কৌতূহল আছে?' মৃদু হাসি লেগে রয়েছে রানার ঠোঁটে, আমপালার হুমকি যেন স্পর্শই করেনি ওকে। 'ফিরোজা তোমার বন্ধুর মেয়ে, তাই না? বন্ধুর মেয়ে আর নিজের মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ফিরোজাকে নিয়ে তুমি যা করছ আর যা করতে চাইছ, সেটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'ফিরোজাকে আমি চল্লিশ হাজার ডলার দিয়ে কিনে এনেছি,' কঠিন সুরে বলল আমপালা। 'তার মানে ও আমার ক্রীতদাসী। কেনা বাঁদীকে নিয়ে যা খুশি করার অধিকার আমার আছে বৈকি।'

'চল্লিশ হাজার ডলার ফেরত পেলে ওকে তুমি মুক্তি দেবে, আমপালা?'

মুচকি হাসল আমপালা, বলল, 'বুঝেছি, ওকে তোমার মনে ধরেছে। হ্যাঁ, বিক্রি করতে পারি। কিন্তু চল্লিশ হাজার নয়, এখন ওর দাম চল্লিশ লাখ ডলার। কিনতে চাও, খালেদ? নগদ চল্লিশ লাখ ডলার দিয়ে?'

'তুমি ওর ন্যায্য দাম জানো না, তাই চল্লিশ লাখ চাইছ,' বলল রানা। 'আসলে ফিরোজার মত মেয়েকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না, আমপালা। টাকা দিয়ে নয়, শক্তি দিয়ে নয়, কিনতে হয় ভালবাসা দিয়ে।'

'ফাও পেলে সবচেয়ে খুশি হও, না?' গম্ভীর হলো আমপালা। 'আমি শক্তির পূজারী, খালেদ। শক্তি দিয়েই ফিরোজাকে রাখব। কেউ যদি পারে তো ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে দেখুক।'

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম, মনে মনে বলল রানা।

হাতে ব্রীফকেস নিয়ে ব্যাংকের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। ঢোকার সাথে সাথে একটা পরিবর্তন চোখে পড়ল, দরজার কাছে এর আগে একজন ইউনিফর্ম পরা গার্ড দেখে গেছে ও, আজ সাদা পোশাক পরা আরও দু'জনকে দেখল, দু'জনেরই জ্যাকেট বগলের কাছে বেঢপ ভাবে ফুলে আছে। রানাকে দেখেই তাদের একজন দ্রুত ওর দিকে পা বাড়াতে গেল, কিন্তু ইউনিফর্ম পরা গার্ড তার আস্তিন ধরে ফেলল। ভুরু কুঁচকে আগে সেই জানালার সামনে দাঁড়াল ও। কাউন্টারে ব্রীফকেস রাখার সময় ভেতরে তাকিয়ে আরও কিছু পরিবর্তন লক্ষ করল। গ্রিলের পিছনে, ডেস্কগুলোর মাঝখানে, তিনজন অপরিচিত লোক বসে আছে। পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়স, পরনে জ্যাকেট আর ট্রাউজার, শক্ত-সমর্থ চেহারা, চোখে সতর্ক দৃষ্টি। এরা কেউ ব্যাংকের কর্মচারী নয়। যুবক কেরানীকে বলল ও, ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চায়। কেরানীকে একটু নার্ভাস দেখাল। কয়েক সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করল সে, তারপর যেন অনিচ্ছা নিয়ে ম্যানেজারের চেম্বারে ঢুকল। ব্যাংকের ভেতরটা আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রানা। নতুন লোকজন এসেছে, বদলে গেছে পরিবেশ, কেমন যেন একটা থমথমে ভাব চারদিকে।

চেম্বারের দরজায় দেখা গেল ম্যানেজারকে। তার দিকে ধীর পায়ে এগোল রানা। ইচ্ছে, এখুনি অফিসে না ঢুকে পরিবর্তনগুলো আরও ভাল করে দেখে নেবে। 'গুড মর্নিং, মি. বর্গ। আশা করি আমার ক্রেডিট পৌঁছে গেছে?'

দুই হাতের তালু এক করে ঘষছে ম্যানেজার, যেন এটাই তার একমাত্র কাজ।

রানার সাথে কথা বলবে, তা না, অস্থির চোখ বুলিয়ে চারদিক দেখার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ব্যাংকের প্রতিটি কর্মচারীর ওপর চোখ বুলাল সে, নতুন লোকগুলোর ওপর কয়েক সেকেন্ড ধরে স্থির হয়ে থাকল দৃষ্টি, প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে একবার করে তাকাল দরজার দিকে। সবশেষে রানার দিকে ফিরল সে, ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, তারপর নিচু গলায় বলল, 'এই যে, মি. সাবির, আপনি এসেছেন খুশি হলাম। ইয়ে···না, ওটা এখনও এসে পৌঁছায়নি। এসব ব্যাপারে এই রকম দেরি হয়েই থাকে।'

চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি ফুটিয়ে তুলল রানা। 'ক্রেডিট ট্র্যান্সফারের সামান্য একটা ব্যাপার, এত দেরি হবার কারণ কি!' একটু থামল ও, চেহারা উজ্জ্বল হলো, ম্যানেজারের কব্জি চেপে ধরে বলল, 'না, না—আপনাকে দায়ী করছি না। আমেরিকায় টেলিফোন করে আমার ব্যাংককে আজই জিজ্ঞেস করব, এত দেরি করছে কেন ওরা।' কথা বলছে, কিন্তু চোখ রয়েছে ওয়ালক্লকের ওপর। বারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে গার্ডদের পালাবদল ঘটবে। ব্রীফকেসের গায়ে একটা টোকা দিল ও। 'আরও একটা খুদে ব্যাগ নিয়ে এসেছি, বক্সের ভেতর রাখতে হবে।' সিঁড়ির দিকে এক পা এগোল ও, কিন্তু ম্যানেজারের ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক খুক্ খুক্ কাশি শুনে থমকে দাঁড়াল। 'কি ব্যাপার?'

'অত্যন্ত দুঃখিত, মি. সাবির। আজকের মত সেফ-ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি বন্ধ হয়ে গেছে।'

'বন্ধ হয়ে গেছে? বন্ধ হয়ে গেছে মানে?' একাধারে বিস্মিত, বিরক্ত, ও বিচলিত দেখাল রানাকে। 'এ কি বলছেন আপনি? ওখানে আমার দামী সব পাথর রয়েছে। ধরুন, এখুনি যদি ওগুলো আমি নিয়ে যেতে চাই?'

'এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতি, মি. সাবির।···সেক্ষেত্রে আপনার হয়ে আমাকেই গিয়ে আনতে হবে ওগুলো।'

'এটা একটা কথা হলো?' চট করে আরেকবার ওয়ালক্লকের ওপর চোখ বুলাল রানা। কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজে। গার্ডদের পালা বদল শুরু হয়নি কেন? রাগ রাগ চেহারা করে ম্যানেজারের চোখে চোখ রাখল ও। 'ব্যাপারটা কি বলুন তো? কি ঘটেছে এখানে? আমার সম্পত্তি, আমি যদি দেখতে যেতে চাই, কোন্ অধিকারে আপনি আমাকে বাধা দেন?'

আবার খুক্ খুক্ করে কাশল ম্যানেজার। 'প্লীজ, মি. সাবির। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করুন। শুধু এইটুকু জানাতে পারি আপনাকে, সিকিউরিটি সিস্টেম নতুন করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। সেটা ক্লায়েন্টদের স্বার্থেই। বক্সে আপনি যদি কিছু রাখতে চান, আমাকে দিন, আমি রেখে আসি।'

আর বক্স খুলে নুড়ি পাথর আবিষ্কার করো তুমি, ভাবল রানা। 'এমন কথা বাপের কালেও শুনিনি,' বলল ও। 'আপনারা কি ডাকাতির ভয় করছেন?'

'না-না,' তাড়াতাড়ি বলল ম্যানেজার। 'সেরকম কিছু না। আমাদের দূতাবাস থেকে সিকিউরিটি চেকিঙের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই আর কি। কিছু দিন পর পর এই ভূত চাপে ওদের মাথায়। কথা দিচ্ছি, কাল থেকে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার আপনি নিচে নামতে পারবেন।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। চোখের কোণ দিয়ে দেখল সিঁড়ির উল্টোদিকের দরজায় একদল লোক উদয় হয়েছে। সিঁড়ির দিকে এগোল তারা। ঘড়িতে বারোটা বেজে তিন মিনিট। 'তাহলে কাল আবার আসি। আপনাকে বিশ্বাস করি না, ব্যাপারটা তা নয়। কিন্তু আমার হিসেবে যদি গোলমাল হয়, তাহলে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে যেন সন্দেহ করতে না পারি, সেটা আমাকে দেখতে হবে।'

ক্লায়েন্ট ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে দেখে পরম স্বস্তি বোধ করল ম্যানেজার। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সে, 'আপনি বিচক্ষণ মানুষ, মি. সাবির। অসুবিধে হলো বলে সত্যি আমি দুঃখিত।'

ব্যাংকের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে এল দলটা। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। ভল্টে যেতে হলে এই সিঁড়ি ধরেই নামতে হয়। মোট ছয়জন লোকের একটা দল। ওদেরকে দেখার পরপরই ব্রীফকেসের গায়ে লুকানো খুদে বোতাম টিপে দিয়েছে রানা। ছয়জনের মধ্যে দু'জন ইউনিফর্ম পরা, আগেও ওদেরকে দেখেছে। বাকি চারজন নতুন লোক, প্রত্যেকে বিশালদেহী, পরনে লাউঞ্জ স্যুট।

'ট্র্যান্সফারের তাগাদা দিয়ে ফোন করতে হবে ওদেরকে, কি ঝামেলা বলুন দেখি। কোন কাজ যদি সময় মত হয়।'

ক্লায়েন্টকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল ম্যানেজার, 'এ রকম হয়েই থাকে, কি আর করবেন।'

ব্যাংকিং সিস্টেম সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল রানা। আরও কিছুক্ষণ থাকতে চায় ও, দেখতে চায় এরপর কি ঘটে। বারোটা বেজে সাত মিনিটের মাথায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল নতুন একটা দল, এরাও সংখ্যায় ছয়জন। দু'জন ইউনিফর্ম পরা, বাকি চারজন লাউঞ্জ স্যুট পরে আছে। প্রত্যেকের জ্যাকেট বগলের কাছে ফুলে আছে। লোকগুলোকে ইহুদি বলেই মনে হলো। অতিরিক্ত লোকগুলো সম্ভবত ইহুদি কোন প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস থেকে এসেছে। এদেরও ফটো তুলল রানা।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ও। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে।

ব্রডওয়ের যেখানে টেমস ওয়াটার বোর্ড অফিস, তার ঠিক উল্টো দিকেই লন্ডন ট্রান্সপোর্ট একজিকিউটিভ হেডকোয়ার্টার। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দেয়ার আগে ব্যাপারটা টের পায়নি ফিরোজা। সেন্ট জেমসে'স পার্ক স্টেশনে ঢুকে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ও, রাস্তার ওপারের জানালা দিয়ে কেউ ওকে লক্ষ করুক, চায় না। অবশ্য কেউ চিনে ফেললেও কিছু আসে যায় না, কারণ তার আজকের ছদ্ম-পরিচয়ের সাথে আগেরটার প্রচুর মিল আছে।

চওড়া করিডর ধরে খানিক এগিয়ে থামল সে, ওর দু'পাশেই এখন কাঁচ লাগানো দুই সেট দরজা। দুটো দরজা দিয়েই অফিসে ঢোকা যায়, দরজার মাথায় লেখা আছে, 'ভেতরে ঢোকার আগে পাস দেখান।' প্রতিটি দরজার সামনে একজন করে দারোয়ান। তাদের একজনকে ও বলল, 'প্রেস অফিসার কোথায় বসেন? তাঁর

সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

করিডরের আরও খানিক সামনে রিসেপশন রূম, সেখানে অপেক্ষা করতে বলা হলো তাকে। একটা ডেস্কের পিছনে বসে আছে একজন অ্যাটেন্ড্যান্ট। টেলিফোনে কার সাথে যেন কথা বলল সে। পাঁচ মিনিট পর সে-ই পথ দেখিয়ে পাঁচ তলায় নিয়ে এল ফিরোজাকে।

লিফট থেকে নেমে প্রেস অফিসে ঢুকল ফিরোজা। তার পরনে জিনস, চামড়ার সাথে সেঁটে আছে। মাথার চুল হিপ্পিদের মত আলুথালু, ঢেকে রেখেছে মুখের দু'পাশ। ওর রূপ দেখে ছোকরা বয়েসী অনেকেই যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এল প্রেস অফিসার, হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মিস বেলি?' মাথা ঝাঁকাল ফিরোজা, যুবকের হাতটা ধরল। এদিক ওদিক তাকাল যুবক। নিচু গলায় বলল, 'প্যাসেজ হয়ে ওদিক কোথাও যাই চলুন, নিরিবিলিতে বসে কথা বলা যাবে।'

ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকল ওরা। চেয়ারে বসার সময় ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল ফিরোজার চেহারা, ভাগ্যিস প্রেস অফিসার লক্ষ করল না। সোমবারে মারধর করেছিল আমপালা, আজ বুধবার অথচ এখনও পিছন দিকটা টাটিয়ে বিষ হয়ে আছে।

অফিসারের দিকে না তাকিয়েও ফিরোজা বুঝতে পারল, ওর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে লোকটা। হাত ব্যাগ খুলে এটা সেটা নাড়াচাড়া করে খানিকটা সময় নষ্ট করল ও, লোকটা মন ভরে দেখে নিক ওকে। গাঢ় রঙের লিপস্টিক মেখেছে ঠোঁটে, সাদা শার্টের ওপরের দুটো বোতাম খোলা। 'ফোনে আপনাকে বলেছি, মি. মেয়ার, আমি একজন লেখিকা···উপন্যাস লিখি।' ব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল ও, বাড়িয়ে দিল অফিসারের দিকে। 'আমার পরিচয়-পত্র।'

কাগজের মাথায় প্রখ্যাত এক প্রকাশনা সংস্থার নাম ছাপা রয়েছে। তার নিচে ছাপা হয়েছে, 'যাঁর জন্যে প্রযোজ্য। এখানে সম্পূর্ণ দায়িত্বের সাথে জানানো যাচ্ছে সে মিস বেলি ডেসমন্ড আমাদের প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে লন্ডনের পটভূমিকায় একটা রোমাঞ্চোপন্যাস লেখার জন্যে গবেষণা করছেন, তাঁর উপন্যাসের ভেতর লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড সিস্টেম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তথ্যানুসন্ধানে আপনার সাহায্য পেলে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করব।' নিচে জেমস বার্কলে সই করেছে। প্রকাশকের নামটা ছাড়া বাকি সবই বানোয়াট। তবে ফোন নম্বরটা আমপালার।

'আমার আসলে টেকনিক্যাল ইনফরমেশন দরকার,' বলল ফিরোজা। 'ফোন করে আপনি যদি আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চান, আমি কিছু মনে করব না।'

চিঠিটা ফেরত দিল অফিসার। দাঁত দিয়ে আধখানা জিভ কেটে বলল, 'ছি-ছি, কি যে বলেন, মিস বেলি! কি জানতে চান, প্রশ্ন করুন, আপনাকে সাহায্য করতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।'

'এতদূর এসে পিছিয়ে যেতে রাজি নই আমি,' বলল আমপালা। 'সোনা যখন এখনও

ওখানে আছে, হাত আমরা বাড়াবই। ঠিক, খালেদ?'

সাদা টাওয়েলিং ড্রেসিং গাউন, গলায় পশমের মাফলার, পায়ে ভেলভেটের স্লিপার পরেছে আমপালা। এইমাত্র গরম শাওয়ারের নিচে থেকে বেরিয়ে এসেছে সে, রানার বিবরণ শুনে মোটেও দমেনি।

স্যান্ডউইচে কামড় দিয়েছে সা'দুল্লা, আরেকটু হলে বিষম খেতে যাচ্ছিল। মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে মাথা নাড়ল সে, বলল, 'ভাল করে আরেকবার ভেবে দেখো সবাই। ব্যাংকে এখন কমপক্ষে বারো জন আর্মড গার্ড রয়েছে।'

'সেটা আমাদের দুশ্চিন্তা, সা'দুল্লা,' বলল রানা। 'তোমার দিকটা তুমি দেখো, আমাদের দিকটা আমরা দেখব।' আমপালার দিকে ফিরল ও। 'আরও তিনটে অটোমেটিক রাইফেল লাগবে আমাদের, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল আমপালা। 'ওগুলো চালাবার জন্যে লোকও লাগবে। তোমার অনুমতি পেলে আজই আমার তিনজন লোককে খবর দিয়ে রাখতে পারি।'

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর নিঃশব্দে মাথা দোলাল। কেউ লক্ষ করল না, আমপালার প্রস্তাবে রানা রাজি হওয়ায় হতাশায় ম্লান হয়ে গেল ফিরোজার চেহারা। ওদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা সোফায় একা বসে আছে সে।

দলে আরও তিনজন নিজের লোক নিতে পারায় উল্লাসে নাচতে ইচ্ছে করল আমপালার, কিন্তু চেহারায় কোন ভাব ফুটতে দিল না সে। সা'দুল্লার দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'স্পেনের খবর বলো সা'দুল্লা। কি দেখলে ওখানে?'

খাদ্য গ্রহণ আর বাক্য উদ্গিরণ, দুটোই একসাথে চালিয়ে গেল সা'দুল্লা। মারবেলা ক্লাবে দু'জন ইসরায়েলি ব্যক্তিত্বকে দেখে এসেছে সে। একজন আন্ডার-মিনিস্টার, অত্যন্ত প্রভাবশালী আমলা। কিন্তু সা'দুল্লার ধারণা দ্বিতীয় লোকটাকে জিম্মি হিসেবে আটকে রাখলেই ভাল হয়। এই লোক একজন সেক্রেটারি, সা'দুল্লার সাথে তার কথাও হয়েছে। ছুটি কাটাতে এসেছে বিদেশে, আরও হপ্তা দুয়েকের আগে দেশে ফিরবে না। ইনফরমেশন সেক্রেটারি মোশে ফেরেলের অনেকগুলো দুর্বলতার কথা লোকে জানে, তার মধ্যে একটা হলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মেয়েদের প্রতি তার প্রচণ্ড লালসা। আটচল্লিশ বছর বয়সেও লোকটা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। দেশের টপ সিক্রেট ইনফরমেশন তারচেয়ে বেশি কেউ জানে না, কাজেই একশো টন সোনার বিনিময়েও তাকে হারাতে রাজি হবে না ইসরায়েল সরকার। রানার বন্ধু রড গুডউইলের সাথে মোশে ফেরেলের পরিচয় আছে, নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে দু'জনে ওরা বোধহয় একই পথের পথিক। গুডউইল বলেছে, দোস্ত যখন অনুরোধ করেছে, সা'দুল্লাকে সম্ভাব্য সবরকম ভাবে সাহায্য করবে সে। একটা সেট-আপ তৈরির জন্যে এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে সে।

সা'দুল্লার কথা শেষ হতে রানা জানতে চাইল, 'কবে তাহলে আবার ওখানে ফিরে যাচ্ছ তুমি?'

'আগামী হপ্তার শেষ দিকে।'

অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হলো। ঠিক হলো, মাঝখানে দিন কয়েকের ফাঁক

রেখে আরও দু'বার ব্যাংকে যাবে রানা। গার্ডদের পালাবদলের সময় যদি পাল্টে গিয়ে থাকে সেটা ওদের জানতে হবে।

ওদেরকে আরও একটা ভাল খবর দিল রানা। আজকের কাগজে ছোট্ট করে বেরিয়েছে খবরটা। 'পুলিসের তরফ থেকে বলা হয়েছে, চলতি হপ্তার শেষ দিকে ধর্মঘটে যাচ্ছে তারা।'

উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই।

'মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় সফরে আসছেন নভেম্বরের চোদ্দ তারিখে,' বলল রানা। হাতঘড়ির দিকে তাকাল ও। 'বুধবারে, তারমানে আজ থেকে ঠিক দু'হপ্তা পর।'

দিনগুলো ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। সব রকম প্রস্তুতি নেয়া শেষ হয়েছে। আর মাত্র ক'টা দিন বাকি, তারপরই এসে যাবে বৃহস্পতিবার। সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে সরকারী শোভা যাত্রা বেরুবে লন্ডনের রাস্তায়। পুলিসদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেছে, একদল ধর্মঘটে যাওয়ার ব্যাপারে অটল, আরেক দল 'ধীরে চলো' নীতি অনুসরণ করছে। শোনা যাচ্ছে মার্কিন মেহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে সেনাবাহিনীকে ডাকা হতে পারে। কারণ, মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে একটা টেরোরিস্ট গ্রুপ বার বার টেলিফোন করছে।

রানা আর আমপালা পরস্পরের প্রতি নির্লিপ্ত আর ঠাণ্ডা থাকল এই ক'দিন। মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিল আমপালা, রানা যেন ফিরোজার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। কিন্তু দু'জনের কেউই এমন কিছু করল না যাতে ওদের সম্পর্ক গুরুতর একটা সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়ায়। আমপালার হাতে যেদিন মারধর খেল ফিরোজা, তারপর থেকে ওর সাথে একা কথা বলার কোন সুযোগ পায়নি রানা, যাতে না পায় সেদিকটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখেছে আমপালা।

মেজর জেনারেল রাহাত খানের বারণ সত্ত্বেও 'রানা এজেন্সী'র সাহায্য নিয়েছে রানা। ওয়াটার বোর্ডের অফিসার রিগ গতকাল দুপুরে টেমস নদীতে গোসল করতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেনি, অনেক খুঁজেও তার কোন হদিস করতে পারেনি পুলিস। কাগজে খবরটা পড়ে আমপালা রানাকে ধরেছিল, 'লোকটাকে মেরে ফেলেছ নাকি হে?'

'তোমাকে তো বলেছি, অকারণ খুন-খারাবি আমি পছন্দ করি না।'

'তারমানে কোথাও আটকে রেখেছ রিগকে,' বলল আমপালা। 'তোমার হয়ে কে করল কাজটা? ম্যানার খুন হওয়ার পর নিশ্চয়ই রোনাল্ডদেরকে একই ধরনের আরেকটা কাজের দায়িত্ব তুমি দেবে না।'

মৃদু হাসল রানা। 'এমন কি লন্ডনেও আমি একা নই, আমপালা। তবে কাদেরকে দিয়ে কাজটা করিয়েছি, তোমাকে তা বলব না। বিজনেস সিক্রেট।'

ব্যাপারটাকে নিজের পরাজয় বলে মনে করল আমপালা। খালেদের পিছনে দু'জন লোককে চব্বিশ ঘণ্টা লাগিয়ে রেখেছে ও, কিন্তু তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্যে কোথায় যেন গায়েব হয়ে গিয়েছিল লোকটা।

ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে রানার মুখের ওপর সে-ও পাল্টা মুচকি হাসল, বলল, 'ঠিক

আছে। কিন্তু মনে রেখো, আমারও কিছু বিজনেস সিক্রেট আছে।'

মারবেলা বলেই মেয়েগুলোকে নিয়ে একটা আয়োজনের ব্যবস্থা করা তেমন কোন সমস্যা হলো না রড গুডউইলের। ফ্রাঙ্কোর দিন গত হবার পর থেকে স্পেনের সামাজিক চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বুকস্টল, এমন কি মনিহারী দোকানেও এখন পর্ণোগ্রাফী কিনতে পাওয়া যায়। সৈকতে সম্পূর্ণ নগ্ন নারী-পুরুষ এখন আর বিস্ময়কর কোন দৃশ্য নয়। সেই উনিশশো আটাত্তরে লাইসেন্স নিয়ে জুয়ার আসর বসানো আইন সিদ্ধ করা হয়েছে, তখন রাতারাতি গজিয়ে উঠেছিল কয়েকশো ক্যাসিনো। ক্যাসিনোগুলো রমরমা ব্যবসা করছে, ভিড় জমিয়েছে এখানে দুনিয়ার সব দেশের 'প্রফেশন্যাল' মেয়েরা।

নভেম্বরের দশ তারিখে মারবেলায় ফিরে এল সা'দুল্লা। মারবেলা ক্লাবের জুয়ার আড্ডায় ঢুকতেই তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল মোশে ফেরেল। আজ সে ভাল জিতেছে, দরাজ হয়ে আছে মন। সা'দুল্লাকে দেখেই ফুর্তি করার ঝোঁকটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

মোশে ফেরেলের দিকে এগোল সা'দুল্লা। দেখল, ফেরেলের একটু পিছনে, দু'পাশে দুটো চেয়ার নিয়ে বসে আছে দুই গরিলা। ফেরেলের দেহরক্ষী এরা। তাদের একজনকে কি যেন বলল ফেরেল, লোকটা তার বিশাল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে খালি চেয়ারটায় বসল সা'দুল্লা।

তাস বাঁটা শেষ করে সা'দুল্লার কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে মোশে ফেরেল বলল, 'সওদাগর দোস্ত, কি যেন বলেছিলে, মেয়েতে-মেয়েতে, তার কোন খবর এনেছ?'

মোশে ফেরেল জানে, সা'দুল্লা একজন ব্যবসায়ী। সা'দুল্লা তাকে কথায় কথায় বলেছিল, মারবেলায় এমন জায়গাও আছে যেখানে মেয়েরা পুরুষদের সামনে উদ্ভট সব আচরণ করে আনন্দ পায়। শুনে ফেরেল অনুরোধ করেছিল, সে রকম কোন জায়গায় আমাকে একবার নিয়ে চলো না, ভাই!

ফেরেলের মত, সা'দুল্লাও তার কানে কানে ফিসফিস করল, 'খবর আছে বলেই তো এলাম, ফ্রেন্ড। স্রেফ আমরা ছয়জন থাকব ওখানে।'

'ছয়জন?' হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল ফেরেল। 'কিন্তু…'

'চারজন মেয়ে, আর আমরা দু'জন,' বলল সা'দুল্লা। 'তোমার মত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্বকে তো আর অন্য পাঁচজনের সাথে ভিড়িয়ে দেয়া যায় না। গোটা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে। জানার মধ্যে শুধু আমি জানি। এতে অবশ্য খরচ পড়বে একটু বেশি…'

'তা পড়ুক, কিন্তু কাকপক্ষীরও টের পাওয়া চলবে না। রড গুডউইল কিছু জানে না তো?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল ফেরেল।

'আরে না!'

'ঠিক আছে,' ফিসফিস করে কথা দিল ফেরেল, 'যাব। কবে?'

'মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। ঠিকানাটা আমি তোমায় টেলিফোনে জানিয়ে দেব।'

*

মনোগ্রাম আঁকা নীল সিল্কের শার্ট ছাড়া পরনে আর কিছুই নেই। পা লম্বা করে দিয়ে একটা আরাম কেদারায় বসে আছে। বিশ্বাস করা কঠিন এই লোকই ইসরায়েলের ইনফরমেশন সেক্রেটারি মোশে ফেরেল। নরম কার্পেটের ওপর শুয়ে দুই স্বর্ণকেশী যুবতী নিজেদের নিয়ে মহাব্যস্ত, হাতে হুইস্কি ভর্তি গ্লাস আর চোখে লালসা ভরা কৌতুক নিয়ে তাদেরকে গিলছে সে। সা'দুল্লা যেমন আশা করেছিল, দেহরক্ষীদের ছাড়াই নিজের হোটেল থেকে সরাসরি মার্সিডিজ হাঁকিয়ে এই বীচ হাউসে চলে এসেছে সেক্রেটারি মহাশয়। পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা নির্জন, একতলা একটা বাড়ি এটা, পুরো টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে একমাসের জন্যে ভাড়া নেয়া হয়েছে।

আরাম কেদারার হাতলে বসে আছে আরেকটা মেয়ে, এই মেয়েটা কালোকেশী, কিন্তু স্বর্ণকেশীদের মতই লম্বা-চওড়া ও মেদহীন, স্বচ্ছ নাইলনের প্যান্টি পরে আছে, কোমরের ওপরটা নিরাবরণ। এক হাতে মোশে ফেরেলের মাথার চুলে বিলি কাটছে সে, আরেক হাতে তার কানের লতিতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

কার্পেটে ওরা দু'জন পরস্পরের বস্ত্র হরণে ব্যস্ত।

শুধু শর্টস পরে আরেকটা আরাম কেদারায় বসে আছে সা'দুল্লা। তার এক হাত খালি, আরেক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তার ওপাশে রয়েছে একটা মেয়ে, পরনের নাইলনের প্যান্টি ছাড়া কিছুই নেই, সা'দুল্লার মাথাটা নিজের বুকের মাঝখানে নিয়ে গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

আধঘণ্টা পর ওরা সবাই বেডরুমে চলে এল। এখানে রয়েছে কিং-সাইজ একটা বিছানা, তাতে শুয়ে জানালার দিকে তাকালে ভূমধ্যসাগরের ঢেউ দেখা যায়। তিন মেয়ে হাততালি দিয়ে, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে উৎসাহ দিয়ে গেল মোশে ফেরেলকে, আর মোশে ফেরেল বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক স্বর্ণকেশীর ওপর।

ইতোমধ্যে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার সেরে এসেছে সা'দুল্লা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ফেরেলের গ্লাসে কি যেন ফেলল সে। আধ মিনিট পর ক্লান্ত ফেরেল সেই গ্লাসের হুইস্কিটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করল। তারপর জ্ঞান হারাল।

অন্য একটা ঘরে গা ঢাকা দিয়ে ছিল গুডউইল। সা'দুল্লার কাছ থেকে সুখবর পেয়ে ট্যাক্সি ডাকতে চলে গেল সে। ভাড়া মিটিয়ে মেয়েগুলোকে ট্যাক্সিযোগে বিদায় করে দেয়া হলো। তারপর ওরা দু'জন মিলে কাপড়চোপড় পরাল অচেতন ফেরেলকে। রেন্ট-এ-কার থেকে আগেই একটা ডজ গাড়ি আনিয়ে রাখা হয়েছে, ধরাধরি করে ফেরেলকে তোলা হলো তাতে। তাকে বসানো হলো সামনের সীটে, যাতে সিধে হয়ে বসে থাকতে পারে তার জন্যে বুকে লাগিয়ে দেওয়া হলো সেফটি-বেল্ট। লোকজন এখন তাকে দেখলে বুঝবে, ঘুমিয়ে পড়েছে।

মালাগা এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে এল ডজ। আরও বিশ কিলোমিটার দূরে খুদে একটা এয়ারস্ট্রিপ আছে, প্রাইভেট বিমানগুলো সেটাই ব্যবহার করে। আমপালার লীয়ার জেট অপেক্ষা করছে ওখানে।

কাস্টমসের লোকদের তিনটে পাসপোর্ট দেখাল ওরা। দুটো নিজেদের,

আরেকটা মোশে ফেরেলের। বলাই বাহুল্য, তারটা ভুয়া। অফিসারকে বলা হলো, ওদের বন্ধু অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে জেট পর্যন্ত গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলে ভাল হয়। প্রাইভেট প্লেনের আরোহীরা প্রায়ই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এয়ারস্ট্রিপে আসে, অফিসার ব্যাপারটার গুরুত্ব দিল না। তবে কাস্টমসের একটা গাড়ি ওদেরকে এসকর্ট করে নিয়ে গেল জেট পর্যন্ত। তাদের একজন লোক মোশে ফেরেলকে প্লেনে তোলার কাজে সাহায্যও করল।

আকাশে উঠল প্লেন। গন্তব্য ইংল্যান্ড, মিডলসেক্সের নীভেসডন এয়ারফিল্ড। এ-ধরনের জেট ল্যান্ড করার জন্যে আদর্শ এয়ারফিল্ড ওটা। রোলস-রয়েস কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যাবার পর থেকে মাত্র কয়েকটা প্রাইভেট কোম্পানী ব্যবহার করে ওটাকে, এক এক করে আরোহীদের চেক করা ওখানে একটা দুর্লভ ঘটনা। সুবিধের আরও একটা দিক হলো, হিথ্রো এয়ারপোর্ট থেকে নীভেসডন এয়ারফিল্ড খুবই কাছে।

অপারেশনের আগের দিন, চোদ্দই নভেম্বর। দুপুর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত উইগমোর স্ট্রীটের দোতলায় বসে গোটা প্ল্যানটা বার বার চেক করল ওরা। আমপালা আর রোনাল্ডের সহকারীরা সবাই উপস্থিত হলো, প্রত্যেককে আলাদা ভাবে দু'বার করে ব্রিফ করা হলো—একবার আমপালা করল, দ্বিতীয়বার রানা। সন্ধের পর বিদায় নিল তারা। এরপর নিজেদের মধ্যে প্ল্যানের খুঁটিনাটি নিয়ে বিশদ আলোচনায় বসল রানা। দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হলো প্রত্যেককে, ইমার্জেন্সী দেখা দিলে কি করতে হবে বুঝিয়ে দেয়া হলো, জিজ্ঞেস করা হলো কারও কোন প্রশ্ন আছে কিনা, তারপর রিহার্সেল দিতে বলা হলো। প্রত্যেকেই প্রফেশনাল, রিহার্সেলে কেউ কোন ভুল করল না। আমপালা আর রানা, দু'জনেই সন্তুষ্ট।

কি কারণে কে জানে, ফিরোজাকে বাড়িতে রেখে এসেছে আমপালা। তার নাম পর্যন্ত মুখে আনেনি। কিন্তু মেয়েটার জন্যে রানার মনে একটা দায়িত্ববোধ জন্মেছে, তাই প্রসঙ্গটা ওকেই তুলতে হলো। 'আমপালা, ফিরোজার ব্যাপারে আমি একটা কথা বলতে চাই।'

মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল আমপালার পেশী। ঠাণ্ডা চোখে রানার দিকে তাকাল সে। সানগ্লাসের ডাঁটি ধরে বন বন করে ঘোরাচ্ছে।

'ফিরোজাকে আজ নিয়ে আসোনি, এ-থেকে কি ধরে নেব কাল ও আমাদের সাথে থাকছে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না থাকার প্রশ্নই উঠে না, ফিরোজা আমার ডান হাত।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর বলল, 'আমার ইচ্ছে, প্ল্যানটা একটু রদবদল করি। ফিরোজার কাজ আর কাউকে বুঝিয়ে দিই।'

'কেন?'

'অল্প বয়স, তার ওপর মেয়ে,' বলল রানা। 'আমি ওর নিরাপত্তার কথা ভাবছি...'

'মার চেয়ে দেখছি, মাসীর দরদ বেশি!'

ব্যঙ্গটুকু গায়ে মাখল না রানা। 'অন্তত ব্যাংকে হামলা চালাবার সময় ও তোমাদের সাথে থাকুক, সেটা আমি চাই না।'

'ওর সম্পর্কে জানো না, তাই এসব কথা বলছ তুমি। ইস্ট এন্ডের যে কোন পুরুষমানুষের চেয়ে দ্রুত পিস্তল বের করতে পারে ও। হাতে অস্ত্র থাকলে ওর সাহস আমার চেয়ে কম নয়। তাছাড়া, ওকে অ্যাকশনে দেখতে আমার দারুণ লাগে।'

এটা তোমার একটা বিকৃতিরই প্রকাশ, মনে মনে বলল রানা। প্রসঙ্গটা আর বাড়তে দিল না ও, জানে, আমপালাকে রাজি করানো যাবে না।

হোটেলে নিজের কামরায় ফিরল রানা রাত সাড়ে এগারোটায়। কী-হোলে চাবি ঢুকিয়ে তালা খুলছে, পিছনে হালকা পায়ের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল ও, বোরখা পরা কিন্তু মুখ খোলা ফিরোজাকে দেখে চমকে উঠল। 'তুমি? এত রাতে?'

রানার পাশে এসে দাঁড়াল ফিরোজা। 'আমপালার লোকদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি,' চাপা স্বরে বলল ফিরোজা, হাঁপাচ্ছে সে। 'তোমার সাথে আমার জরুরী কথা আছে, খালেদ।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা, আলো জ্বালল। দেখল, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে ফিরোজা।

'আমপালা জানবে,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'তোমার জন্যে সেটা ভাল হবে না। এভাবে না এসে টেলিফোন করলেই তো পারতে।'

'সবগুলো টেলিফোনে তালা দিয়ে রেখেছে ও,' বলল ফিরোজা। হঠাৎ, রানাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে, ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। 'খালেদ,' রানার বুকে মুখ ঘষতে শুরু করে ফুঁপিয়ে উঠল। '...তোমাকে ওরা মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে! আমি নিজের কানে শুনেছি...সকালে নিজের লোকদের নিয়ে গোপনে আলোচনা করেছে...'

ফিরোজার কাঁধে একটা হাত রেখে স্থির দৃষ্টিতে সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'শান্ত হও, ফিরোজা। ঠিক কি শুনেছ সব বলো দেখি।'

'কিভাবে কি করবে শুনতে পাইনি,' রানার বুক থেকে মুখ তুলে বলল ফিরোজা। 'মাত্র কয়েকটা কথা কানে এল আমার। পিয়ানো বলল, ওকে আমরা এক ছটাক সোনাও নিতে দেব না। উত্তরে আমপালা বলল, শালাকে জানেই মেরে ফেলব, সোনা নেবে কোত্থেকে! ওদের একজন লোক স্টাডি থেকে বেরিয়ে আসছে দেখে সরে আসি আমি। এর একটু পর লোকগুলো চলে যায়।'

'ধন্যবাদ, ফিরোজা, তুমি আমাকে সাবধান করে দিলে,' বলল রানা। 'কিন্তু তবু আমার জন্যে এত বড় ঝুঁকি তোমার নেয়া উচিত হয়নি। এখন তাকে কি বলবে তুমি?'

'তোমার ভয় করছে না?' ব্যাকুল চোখে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ফিরোজা। 'ওরা তোমাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করেছে!'

অভয় দিয়ে হাসল রানা। 'ওদের মতলব যে সুবিধের নয়, সেটা তো আমি আগেই আন্দাজ করেছি, ফিরোজা। কিছু কিছু ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভেবে রেখেছি। তোমার কাছ থেকে খবর পাবার পর আরও সাবধান হব। চলো, তোমাকে আমি

পৌছে দিই।'

'পৌছে দেবে?' আহত বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ফিরোজা। 'তুমি...তু-মি আমাকে তা-তাড়িয়ে দিচ্ছ, খালেদ?' রানাকে ছেড়ে এক হাত পিছিয়ে গেল সে। 'আ-আমি তো তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি...ভেবেছিলাম তোমার কাছে...অন্তত তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে না...'

এগিয়ে গিয়ে ফিরোজার একটা হাত ধরল রানা, তাকে টেনে নিয়ে এসে বিছানার ওপর বসাল। 'বোকা মেয়ে! তোমাকে আমি তাড়িয়ে দেব, এ কথা ভাবতে পারলে! শোনো, আর তো মাত্র একটা কি দুটো দিন, তারপরই তো শয়তানটার হাত থেকে তোমাকে আমি ছাড়িয়ে আনছি...'

'কিভাবে? ওরা তোমাকে খুন...'

'প্ল্যানটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, আমাকে ছাড়া কাজটা শেষ করতে পারবে না ওরা,' ফিরোজাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'অন্তত একটা পর্যায় পর্যন্ত পরস্পরের সাহায্য দরকার হবে আমাদের। কখন ওরা আমার ওপর চড়াও হবে, আমি জানি। তার আগেই তোমাকে নিয়ে আমি কেটে পড়ব।'

'কিন্তু তারপর? সোনাগুলো?'

হেসে ফেলল রানা। 'বোকা মেয়ে, তার ব্যবস্থাও হবে। চলো, তোমাকে পৌছে দিই, ফিরে এসে চিন্তা-ভাবনা করে মোক্ষম একটা উপায় বের করতে হবে আমাকে...'

'কিন্তু আমি ফিরে যাব বলে আসিনি...'

'আমপালার রাগ কি রকম জানো তো? তুমি এখানে রাত কাটালে সে হয়তো অপারেশনের তারিখই পিছিয়ে দেবে। আরও অনেক কিছু করতে পারে। এই পর্যায়ে এসে এখন তার সাহায্য ছাড়া আমিও কাজটা শেষ করতে পারব না। যদি সে বেঁকে বসে, তখন কি হবে, ভেবে দেখেছ?'

মাথা নিচু করে থাকল ফিরোজা, কথা বলল না।

'আমপালার কাছে তোমার অনেক মূল্য, ফিরোজা। তুমি যতটা বুঝতে পারো, তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি। তোমাকে যদি হারায়, লোকটা বাঁচবে না। তোমার প্রতি ওর কোন ভালবাসা নেই, সত্যি, কিন্তু যারা শুধু বিকৃতিকে অবলম্বন করে বাঁচে আমপালা তাদেরই একজন। এখন যদি তোমাকে আমি নিরাপদ কোথাও সরিয়ে দিই, নির্ঘাত আত্মধ্বংসী কিছু একটা ঘটিয়ে বসবে ও।'

'ঠিক আছে, বলছ যখন, ফিরেই যাব,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ফিরোজা। হঠাৎ মুখ তুলল সে। 'একটা কথার জবাব দেবে?'

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। কি কথা, ফিরোজা?'

'আমার জন্যে অনেক করছ তুমি। বুঝতে পারছি, ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যে তোমাকে ঝুঁকিও নিতে হবে। কিন্তু কেন? কিসের জন্যে?'

এরকম একটা প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না রানা, মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে গেল ও। তারপর মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। 'তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ নয়, ফিরোজা। একটু ঘুরিয়ে বলি, দেখো, বুঝতে পারো কিনা। তুমি তো ফুল ভালবাসো, বাসো না?'

'হুঁ, বাসি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ফিরোজা।
'কেন ভালবাসো?'
'সুগন্ধ পাই, দেখতে সুন্দর...'
'তুমি যখনই কাছে আসো আমিও একটা গন্ধ পাই। ভাল লাগে। পরিচিত, যেন কতকাল ধরে চিনি, সোঁদা সোঁদা একটা গন্ধ। যেন ছোটবেলায় এই গন্ধই পেয়েছি মায়ের গা থেকে, যে মেয়েটি ভুল করে ভালবেসেছিল আমাকে তার শরীর থেকেও পেয়েছি। যখন পাই, বুঝতে পারি, আপনজন কেউ কাছে আছে, এ তারই গন্ধ। তুমি কখনও ফুল নষ্ট করো, ফিরোজা?'
ফিসফিস করে বলল ফিরোজা, 'না।'
'আমিও না।'
এরপর আর কথা নেই কারও মুখে। মৃদু হাসি ফুটে আছে রানার ঠোঁটে, চোখে শান্ত গভীর দৃষ্টি। আর ফিরোজার চোখে পলক নেই, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে সে রানার দিকে।
অনেক, অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'রাত অনেক হলো। যাবে না?'
হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল ফিরোজা, চোখে পলক পড়ল। ফিক্ করে হেসে ফেলল সে। 'ভোলো না দেখছি!' এ যেন সে মেয়েই নয়। ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত রাখল দু'কোমরে। 'আমি যদি তোমার আপনজনই হই, তাহলে আদর করো না কেন, শুনি?' নিজের কথায় নিজেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। 'ছি, আমি একটা বেহায়া!' সরে গেল রানার কাছ থেকে। ওর দিকে আর তাকাতেই পারছে না। 'যাব, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না,' বিড়বিড় করে বলল, পায়চারি শুরু করল ঘরের মেঝেতে। 'তোমার খুব অসুবিধে করছি, না? আপনজন, একটু অত্যাচার তো সইতেই হবে। কি আর করবে বলো।' থামল দরজার কাছে। হাত বাড়াল দেয়ালের দিকে। হঠাৎ খুট্ করে আওয়াজ, অমনি অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর। পরমুহূর্তে আবার আলো জ্বলল। 'মিস্টার, ভয় পেয়ো না।' আবার নিভল আলো। 'ধরে নাও এটা আমার ছেলেমানুষি। আর যদি মনে করো ছেলেমানুষি করার বয়স আমি পেরিয়ে এসেছি...' রানার স্পর্শ পেল ফিরোজা। 'ভয় হচ্ছিল তুমি বুঝবে না, আসবে না...'
ঘর অন্ধকারই থাকল।
মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে গেল ফিরোজা। আমপালা আজ উইগমোর স্ট্রীটের দোতলায় রাত কাটাবে, কাজেই বাড়ি ফিরে তার সামনে ওকে দাঁড়াতে হবে না। রানা ওকে পৌঁছে দিতে চাইলেও ফিরোজা রাজি হয়নি। আমপালার লোকেরা হোটেলের ওপর নজর রাখছে, রানার সাথে বোরখা পরা কোন মেয়েকে দেখলে আসল ব্যাপার টের পেয়ে যাবে ওরা। লন্ডনে প্রচুর মুসলমান পরিবার বসবাস করছে, তাদের মেয়েরা অনেকেই নিয়মিত বোরখা পরে চলাফেরা করে, কাজেই ফিরোজাকে এত রাতে হোটেল থেকে বেরুতে দেখলেও তারা কিছু সন্দেহ করবে না।
বিদায় নেয়ার আগে রানাকে একটা প্রশ্ন করল ফিরোজা। 'কাল বাঁচি কি মরি ঠিক নেই। একটা কথা এখুনি জানতে ইচ্ছে করছে, আর যদি সময় না পাই?

আমাকে নিয়ে তুমি কোন স্বপ্ন দেখো, খালেদ?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'দেখি। ছোট্ট, সুন্দর, ছিমছাম একটা বাড়ি কিনেছ তুমি। ক্যাম্প থেকে তোমার মাকে নিয়ে এসে রেখেছ সেই বাড়িতে। মা-বেটিতে সেলাই মেশিন চালাও, ভালই রোজগার হয়, দিনগুলো চমৎকার কেটে যাচ্ছে। তারপর একদিন এল এক বিদেশী রাজপুত্তুর, ফুলের মালা নিয়ে...'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বিদায় নিল ফিরোজা। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় পানিতে ভরে উঠল দু'চোখ। কিন্তু রানা এসব কিছুই জানল না।

## নয়

বৃহস্পতিবার, পনেরোই নভেম্বর। কাকভোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেও রাস্তাঘাট এখন শুকনো। বাকিংহাম প্যালেসের সামনেটা লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের জায়গা নেই। কুয়াশা ভেদ করা ম্লান রোদ ফুটিয়ে তুলেছে দৃশ্যটাকে, ছোট বড় নানান সাইজের লাল-নীল রঙের তারকাখচিত আর ডোরা-কাটা পতাকা দুলছে বাতাসে।

ভাল আবহাওয়া। শোভাযাত্রা যেখান থেকে শুরু হবে আর যেখানে পৌঁছে শেষ হবে, এই দুই প্রান্তের মাঝখানে, রাস্তার দু'পাশে উৎসাহী দর্শকদের ভিড় জমে উঠেছে এরই মধ্যে। নিরাপত্তার খাতিরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, প্রিন্স ফিলিপের সাথে যে গাড়িতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকবেন সেটা বুলেট প্রুফ হবে, বন্ধ থাকবে সব ক'টা জানালা। প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি অফিসাররা আর ব্রিটিশ পুলিস একটা ব্যাপারে একমত, প্রেসিডেন্টের প্রাণনাশের যে হুমকি দেয়া হয়েছে সেটাকে খাটো করে দেখা চলে না। গত পনেরো দিন ধরে বারবার দেয়া হয়েছে হুমকিটা, কখনও টেলিফোনে, কখনও চিঠি লিখে, কখনও হ্যান্ডবিল ছেড়ে, শহরের কোথাও কোথাও পোস্টারও সাঁটা হয়েছে। এই টেরোরিস্ট গ্রুপের নাম আগে কখনও শোনা যায়নি। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতির ঘোর বিরোধী তারা, তাদের ধারণা যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সাহায্য আর সমর্থন দেয়া বন্ধ করলেই মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে আসবে, সুরাহা হয়ে যাবে প্যালেস্টাইন সমস্যার। পররাষ্ট্র দফতরে বসে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছে, এই টেরোরিস্ট গ্রুপের পিছনে সোভিয়েত রাশিয়ার মদদ থাকতে পারে।

স্যার ডুরেল বা বিশেষজ্ঞদের জানার কথা নয় যে গোটা ব্যাপারটার জন্যে দায়ী বাংলাদেশী এক যুবক, মাসুদ রানা। জানার কথা নয়, ন্যাট ম্যানারের নিরুদ্দেশের পিছনেও তার হাত ছিল, আর এসবের সাথে সৌদি আরবের একশো টন সোনার একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

সদ্য ভাঁজ খোলা একটা বিজনেস স্যুট পরেছে মাইকেল আমপালা, তার ওপর চাপিয়েছে ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি একটা জ্যাকেট। দোতলা থেকে নেমে পিছনের দরজা দিয়ে একটা গলিতে বেরিয়ে এল সে, সেখান থেকে অলস পায়ে

চলে এল মেইন রোডে, উইগমোর স্ট্রীটে। সোজা তেল আবিব ক্রেডিট ব্যাংকের দিকে এগোল সে। রাস্তার ওপারে কালো রঙের পুরানো একটা বুইক গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভুলেও সেদিকে একবার তাকাল না।

প্রবেশ পথের কাছাকাছি তার হাঁটার গতি একটু মন্থর হলো, হাত-ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে তলপেটের চামড়া, ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতরটা, কিন্তু চেহারায় শান্ত-সৌম্য একটা ভাব। কয়েক পা এগিয়ে কাঁচ লাগানো দরজার হাতল স্পর্শ করল সে, ঢুকে পড়ল ব্যাংকের ভেতরে।

ঢোকার সাথে সাথে বাধা। সামনে কাউন্টার, সেদিকে এগোচ্ছে, পথরোধ করে দাঁড়াল ইউনিফর্ম পরা গার্ড। কি চাই?

গার্ড বিনয়ের সাথেই প্রশ্নটা করল। সাদা পোশাক পরা সিকিউরিটি সার্ভিসের লোক দু'জন তেমন মনোযোগ দিল না, আমপালার ব্যবসায়ী সুলভ চেহারা আর পোশাক-আশাক দেখে তাদের মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। কথা বলার সময় কোটের বোতাম খুলল আমপালা, ফিনান্সিয়াল টাইমস-এর কপিটা ভাঁজ করে ঢোকাল বিশাল সাইড-পকেটে। 'ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাই। অ্যাকাউন্ট খুলব।' চেহারায় কর্তৃত্বসুলভ গাম্ভীর্য, গলা একটুও কাঁপল না। ব্যাংকের ভেতরটা দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল সে। গোটা পরিবেশটা অত্যন্ত পরিচিত লাগল তার। রানার তোলা ছবিগুলোর অবদান।

একটা জানালার সামনে তাকে নিয়ে এল গার্ড। এখানে একজন কেরানীকে আবার সেই একই কথা বলল সে। গার্ডের দায়িত্ব শেষ, সন্তুষ্ট হয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল লোকটা।

অপেক্ষা করছে আমপালা, হাত দুটো ফরমাইকা মোড়া কাউন্টারে, দেয়ালঘড়ির মিনিটের কাঁটায় চোখ। একটু একটু করে বারোটার ঘরের দিকে এগোচ্ছে কাঁটা। বারোটা বাজতে আর আধ মিনিট বাকি। ম্যানেজারের কামরা থেকে বেরিয়ে এল কেরানী, দরজা বন্ধ হলো না, দোর-গোড়ায় এবার দেখা গেল ম্যানেজার পিয়েরী বর্গকে। মৃদু হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে, মাথা ঝাঁকিয়ে নতুন ক্লায়েন্টকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানাল। ভারিক্কি চালে তার দিকে এগোল আমপালা, বন্ধুত্বসুলভ ভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিল ডান হাত। ঠিক তখুনি দৃশ্যটা চোখে পড়ল। ঘড়ির কাঁটা ধরে ঘটতে শুরু করেছে ঘটনা। ছয়জন গার্ড। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে করতে একদিক থেকে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে। পালাবদলের সময় এটা। উল্টে ঢুকবে ওরা। সিঁড়ি বেয়ে তার আগে নিচে নামবে। সারা শরীরে পরম স্বস্তির ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল আমপালা, পালাবদলের সময় একটু এদিক ওদিক হলে গোটা প্ল্যানই অকেজো হয়ে পড়ত।

'পিয়েরী বর্গ,' বলল ম্যানেজার। 'ভেতরে আসুন, মি. ...?'

একটা মাত্র মৃদু ঝাঁকি দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল মাফিয়া চীফ। না তাকিয়েও আন্দাজ করতে পারল, গার্ডদের প্রথমজন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে। এখনই সময়, উপলব্ধি করল সে। 'ধন্যবাদ। এক্সকিউজ মি...এক সেকেন্ড, প্লীজ। আমার স্ত্রী দেরি করছেন কেন বুঝতে পারছি না।' দ্রুত দরজার কাছে ফিরে এল

সে, গার্ডকে পাশ কাটাবার সময় মৃদু হাসি উপহার দিতে ভুল করল না। কাঁচ লাগানো কবাট ঠেলে বাইরে, রাস্তায় বেরিয়ে এল সে।

পুরানো বুইক গাড়িটা রাস্তার এপারে, ব্যাংকে ঢোকার মুখ থেকে পাঁচ হাত বাঁ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমপালাকে দরজা দিয়ে বেরুতে দেখেই বুইকের সবগুলো দরজা বিস্ফোরিত হলো, ছিটকে বেরিয়ে এল কালো সিল্কের মোজায় মুখ ঢাকা পাঁচজন লোক। প্রত্যেকের হাতে একটা করে অটোমেটিক রাইফেল, শুধু দায়ামের হাতে দুটো। তার বাঁ হাতেরটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে, খপ করে সেটা লুফে নিল আমপালা। 'লেটস্ গো!' চাপা গলায় আদেশ করল সে। ছয়জনকে নিয়ে ছুটল দরজার দিকে।

ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনই বিশালদেহী, প্রত্যেকে ছয় ফিটের ওপর লম্বা। ফিরোজাকে ওদের সামনে বেঁটে আর খুদে দেখল। অটোমেটিক ধরা তার হাতের নখ সাদা হয়ে গেছে। পুরুষদের মধ্যে দু'জন তাদের রাইফেল ছাড়াও ত্রিশ পাউন্ড করে বিস্ফোরক নিয়েছে সাথে।

রাস্তার দু'পাশেই থমকে দাঁড়াল পথিকরা। 'সর্বনাশ, ব্যাংক ডাকাতি!' রাস্তার ওপরের একটা অফিস বিল্ডিঙের জানালা থেকে চেঁচিয়ে উঠল একজন লোক। রাস্তায় কেউ কেউ সটান শুয়ে পড়ল, মাথা ঢাকল হাত দিয়ে। কেউ মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ভোঁ দৌড় দিল। একজন দোকানদার ঘরঘর শব্দে দোকানের শাটার নামাল।

কাঁচ লাগানো দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল সাতজনের দলটা। গার্ডরা ঠিক কোথায় থাকবে জানা ছিল আমপালার, ভেতরে ঢুকে ভাল করে তাকাল না পর্যন্ত, সেদিকে ব্যারেল তুলে দু'সেকেন্ড গুলিবর্ষণ করল সে। সেভেন পয়েন্ট সিক্স-টু ক্যালিবারের ভারী অ্যামুনিশন, কিছু বুঝে ওঠার আগেই রক্ত-মাংসের নরম শরীর তিনটে দলা পাকিয়ে গেল। উন্মত্ত আক্রোশে মাতৃভাষায় গালি-গালাজ করছে দায়াম, ব্যাংকের ভেতর তিন দিকে ব্রাশ ফায়ার করল সে। তার আঙুল টেনে ধরে রাখল ট্রিগার, রাইফেলের মাজলটা ঘুরে গেল একদিক থেকে আরেকদিকে। একবার, দু'বার, তিনবার। বিস্ফোরণের একটানা শব্দে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হলো, অনেক কর্মচারীর শেষ তীক্ষ্ণ চিৎকারটাও শুনতে পাওয়া গেল না। দুমড়েমুচড়ে দেবে গেল কাউন্টার, দেয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ল, ধুলোয় ভরে গেল ভেতরটা। যুবক কেরানী মেঝেতে পড়ার আগেই মারা গেল, তার মাথার অর্ধেকটাই উড়ে গেছে। কয়েক জন কর্মচারী ডেস্ক আর কাউন্টারের পাশে শুয়ে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। ওদের মধ্যে সিকিউরিটি গার্ডরাও আছে, বুঝতে পেরে লাফ দিয়ে কাউন্টারের ওপর চড়ল দায়াম, একজন একজন করে খতম করল তাদের প্রত্যেককে।

ম্যানেজার লাফ দিয়ে নিজের অফিসে ঢুকে পড়ে বন্ধ করে দিয়েছে দরজা। নিজেদের চারজন লোকের সাথে সিঁড়ি বেয়ে বাঁধভাঙা পানির মত নিচে নেমে গেল ফিরোজা।

প্রথম গুলির আওয়াজ হওয়ার পর মাত্র পাঁচ সেকেন্ড পেরিয়েছে। ভল্টের সামনে ভিড় করে আছে গার্ডরা, গোলা-গুলির আওয়াজে মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব।

তাদের মধ্যে মাত্র দু'একজন হাত বাড়িয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে, এই সময় পাঁচজনের দলটা ওদের ওপর এসে পড়ল।

সময়ের মাপ এক চুল এদিক ওদিক হয়নি। খোলা রয়েছে আয়রন গ্রিল, খোলা রয়েছে ভল্টের দরজা। পাঁচজন গার্ড বেরিয়ে এসেছে ভল্টের ভেতর থেকে, ভল্টের আউটার সেকশনও পেরিয়ে এসেছে তারা, মিশে গেছে নতুন আরেক দল গার্ডের সাথে, আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সিঁড়ির দিকে। প্রথম দলের শেষ লোকটা এখনও ভল্টের ভেতর, শত্রুদের দেখেই ভল্টের ভেতর লুকাবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক বুলেট এরই মধ্যে ছুটে আসতে শুরু করেছে, তার ঝাঁঝরা শরীরটা আছড়ে পড়ল দোর-গোড়ায়।

আত্মরক্ষার কোন সুযোগই পেল না ওরা। সংখ্যায় ওরা অশুভ তেরো, একজন আরেকজনের পথে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পাঁচটা অটোমেটিক রাইফেলের ভারী বুলেট বিরতিহীন ছুটে এল তাদের ওপর, শরীরগুলোকে ছিঁড়ে, ফুঁড়ে, ফেলে বেরিয়ে যেতে লাগল। আরও পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হলো নিচের হত্যাযজ্ঞ। শুধু বাতাসে ভারী হয়ে থাকল বারুদের তীব্র ঝাঁঝ। সাদা মার্বেল পাথরের মেঝেতে তাজা রক্তের একটা স্রোত। দ্রুত ছড়াচ্ছে।

রক্ত আর লাশগুলো টপকাবার সময় বার বার শুধু একটা কথাই নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ফিরোজা, এই সোনা লুঠ করার সময় ইসরায়েলিরা সৌদি জাহাজের যাট জন ক্রু আর নাবিককে খুন করে পানিতে ফেলে দিয়েছিল লাশ। এরা ইসরায়েলি ইহুদি, আমার জন্মস্থান কেড়ে নিয়েছে। এদেরকে ধ্বংস করার জন্যেই আমাকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল।

কান থেকে এয়ার-প্লাগ খুলে দোর-গোড়ায় পড়ে থাকা লাশটা টপকাল ফিরোজা, ঢুকে পড়ল ভল্টের ভেতর। মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় দেখাল তাকে। সোনা! মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু, ফু-অরেসেন্ট আলোয় হলুদ দেখাচ্ছে। দুই কিলো ওজনের এক একটা সোনার ইঁট, মোট পঞ্চাশ হাজার। বোকার মত তাকিয়ে থাকল সে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, শরীর থর থর করে কাঁপছে। এই পঞ্চাশ হাজারের মাত্র একটা, কিংবা একটার অর্ধেকও যদি তার কপালে জোটে, নরক থেকে তুলে আনতে পারে সে তার মাকে! পরমুহূর্তে বাস্তবে ফিরে এল সে। সোনার কাছে পৌঁছানো মানে সব কাজ শেষ নয়। কঠিন পরীক্ষা সবেমাত্র শুরু হলো। সবগুলো বাধা নিমেষের মধ্যে দেখতে পেল সে, সেই সাথে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল তার। এই অপারেশন কি সত্যি সফল হবে? সফল যদি হয়, খালেদ আর সে কি বেঁচে থাকবে?

ঘুরে দাঁড়াল ফিরোজা, চিৎকার করে বলল, 'দোর-গোড়া থেকে লাশটা কেউ সরাবে?' মোজার ভেতর থেকে একটু ভোঁতা, বিকৃত আওয়াজ বেরিয়ে এল। এক এক বারে দুটো করে ধাপ টপকে ওপর দিকে ছুটল সে।

বুলেটের আঘাতে দরজা উড়িয়ে দিয়ে ম্যানেজারের অফিসে ঢুকল আমপালা। কিছুই সে ভোলেনি, দু'মুখো আয়নার দিকে তাক করে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল। চুর চুর কাঁচের সাথে পড়ে গেল গার্ডের লাশ। আপাতত রেহাই দেয়া হয়েছে ম্যানেজারকে, আমপালার আদেশ মত উপুড় হয়ে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ল সে।

তার ট্রাউজার আগেই খুলে নেয়া হয়েছে, সেটা দিয়ে শক্ত করে বাধা হলো হাঁটু দুটো। সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে লোকটা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমপালার দিকে তাকাল ফিরোজা। 'আমি আছি এখানে, তোমরা তোমাদের কাজে যাও,' বলল সে।

দায়ামকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল আমপালা। অফিসের দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল ফিরোজা, ব্যাংকের দরজা আর ম্যানেজার, দু'দিকেই চোখ রাখছে সে। চট করে একবার হাতঘড়ির ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। ব্যাংকে ঢোকার পর মাত্র তেতাল্লিশ সেকেন্ড পেরিয়েছে। বাইরে থেকে কোন বাধা আসার লক্ষণ নেই এখনও।

নিচে নেমে আমপালা, দায়াম আর তিনজন লোক ভল্টে ঢুকল। অপর একজন ভল্টের ভারী দরজায় কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ দিতে শুরু করল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। বিরাট আকারের হুইলটা ঘোরাল সে, লেগে গেল তালা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল সে, ফিরোজার কাছে যাবে।

বিস্ফোরকের বান্ডিল দুটো সিঁড়ির মাথায় রাখা হয়েছে। মুখোশ পরা লোকটা সেগুলো নিয়ে কাজ শুরু করল এবার। দক্ষ হাতে দ্রুত দু'জায়গায় বসানো হলো ডিনামাইট, জায়গাগুলো আগেই নির্বাচন করে রাখা হয়েছিল। প্রতি সেট ডিনামাইটের সাথে দশ-সেকেন্ড মেয়াদের ডিটোনেটর ফিট করল সে। তারপর ফিরোজার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড বেগে মাথা ঝাঁকাল। এগিয়ে এসে একটা বান্ডিলের ডিটোনেটর অন করল ফিরোজা। পরমুহূর্তে, হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ধরে, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল ব্যাংক থেকে রাস্তায়।

রাস্তার ওপারে কিছু লোক এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। চারদিকে কোথাও একটা পুলিসের ইউনিফর্ম দেখা গেল না। আকাশের দিকে রাইফেল তুলে ফাঁকা কয়েকটা আওয়াজ করল ফিরোজা, জটলাটা সাথে সাথে বিস্ফোরিত হয়ে এদিক ওদিক ছুটে গেল। কালো বুইকের এঞ্জিন চালু রয়েছে, লোকটার পিছু পিছু সেটায় চড়ার আগে সবাইকে সাবধান করার জন্যে চিৎকার দিল ও, 'পালাও! পালাও! বিল্ডিঙে বোমা আছে!'

চাকার সাথে কংক্রিটের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ, কর্কশ আওয়াজ উঠল। উইগমোর স্ট্রীট ধরে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটল বুইক। ম্যানচেস্টার স্কয়ারে ঢোকার মুখে আরেকবার কর্কশ আওয়াজ করল গাড়িটা, ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল মোড়ে। তিনজন আরোহী ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে ব্যাংক ভবনের দিকে। নিশ্চিত ভাবে জানতে চায়, প্ল্যান মত সব কিছু ঘটছে কিনা।

প্লেট গ্লাসগুলো ভেতর দিকে দেবে গেল, বিস্ফোরিত হলো সব ক'টা জানালা, রাস্তার উল্টোদিকে ঝম ঝম করে কাঁচ-বৃষ্টি হলো। একই সময়ে দেয়ালগুলো ফুলে ফেঁপে উঠল, চিড় ধরল আঁকাবাঁকা। দর্শকদের চোখে মুহূর্তের জন্যে স্লো মোশন সিনেমার মত লাগল দৃশ্যটা। তারপরই বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তি সব কিছুকে চোখের নিমেষে ধসিয়ে দিল। ইট, কাঠ, প্লাস্টারের চাঙ, লোহা, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সব। বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল গাড়ি, আর তারপরই শোনা গেল অন্য একটা আওয়াজ, যেন বিশাল একটা জলপ্রপাত থেকে বহু নিচে পড়ছে লম্বা-চওড়া

একটা পানির স্রোত। গোটা বিল্ডিংটা ভেঙেচুরে ধসে পড়ল।

মাত্র চার সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সব। ঘন একটা ধুলোর মেঘ ঝুলে থাকল বাতাসে, অকস্মাৎ নেমে আসা নিস্তব্ধতার মতই ভারী। তেল আবিব ক্রেডিট ব্যাংক আর তার ওপরের সবগুলো গাঁথনি সহ গোটা বিল্ডিংটা আকারে ছোট হয়ে পনেরো ফুট উঁচু টুকরো ইঁট, ভাঙা কাঠ, চুন-সুরকি আর কাঁচের স্তূপে পরিণত হয়েছে, স্তূপটা ক্রমশ ঢালু হয়ে শেষ হয়েছে রাস্তার ওপারে। বিল্ডিংটা ধসে পড়ার সময় আহত হলো একটা কুকুর ও দু'জন মটরসাইকেল আরোহী। চলন্ত একটা ট্যাক্সির ওপর পাঁচিলের খানিকটা অংশ ভেঙে পড়ায় ছাদ দেবে গেল। বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তা, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে যানবাহন। ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখুঁতভাবে চাপা পড়েছে ব্যাংকের ভল্ট, জঞ্জাল সরিয়ে ওটার কাছে পৌঁছুতে হলে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। ভল্টের চার দেয়ালের ভেতর আমপালা আর তার সঙ্গীরা সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে, ইস্পাতের আট ইঞ্চি পুরু দেয়ালগুলো রক্ষা করেছে ওদেরকে।

আওয়াজটা গুরু-গম্ভীর আর ভোঁতা, কিন্তু আমপালার কানের পর্দায় প্রচণ্ড বাড়ি খাওয়ায় ব্যথা করতে লাগল। মনে হলো গোটা ভল্ট থরথর করে কাঁপছে, উপর্যুপরি ভাইব্রেশন স্টীল প্লেট থেকে শুরু করে ওদের জুতো, পা, দাঁত, কপালের হাড় সব ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁকাতে থাকল। মনে হলো নাড়া খেয়ে হাড়ের প্রতিটি জয়েন্ট আলগা হয়ে যাচ্ছে। এই আতঙ্ক অনেকক্ষণ স্থায়ী হলেও, খালেদ যেমন আশা করেছিল, আট ইঞ্চি পুরু ইস্পাত ভেঙে পড়া বিল্ডিঙের চাপ আর ওজন সহ্য করে ঠিকই টিকে থাকতে পারল। হঠাৎ করেই নিভে গেল আলো। কাঁপুনি থামার সাথে সাথে একটা টর্চ জ্বালল আমপালা। তার মত আর সবাইও মুখোশ খুলে পকেটে ভরেছে। টর্চের আলো নিচ থেকে ওপর দিকে তুলল আমপালা, হলুদ সোনার স্তূপে লেগে প্রতিফলিত হলো আলো। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু হয়ে আছে সোনার বার। একটা বার তুলে নিয়ে সেটার ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করল সে, সঙ্গীদের দিকে ফিরে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করল, বলল, 'সব এখন আমাদের।' মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে বসল সে, সোনার ইঁট দিয়ে মেঝের ওপর ঠকাস ঠকাস করে তিনটে বাড়ি মারল। যেখানে আঘাত করল, দ্রুত সরে এল সেখান থেকে। সবাইকে বলল, 'সাবধান, ওখান থেকে সরে থাকো।' ভাবল, আমি ফিসফিস করছি কেন?

জায়গাটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল ওরা।

প্রথমে কোন আওয়াজ হলো না। ইস্পাতের সামান্য একটু অংশ, আকারে একটা পিরিচের মত হবে, নীলচে থেকে সাদা, তারপর জ্বলজ্বলে সোনালি রঙ পেল। মেঝে গলতে শুরু করছে। পিরিচটা লম্বা হতে শুরু করে তার আকৃতি হারাল, বারো ইঞ্চি লম্বা হয়ে থামল সেটা। ছয় ফিট দূরে আবার সোনার বার দিয়ে আওয়াজ করল আমপালা। এবার এখান থেকেও ইস্পাত গলে নতুন একটা লাইন তৈরি হতে শুরু করল। এভাবে আরও দু'বার আওয়াজ করল সে।

শক্তিশালী একটা থারমিক লেন্স অনায়াসে কেটে চলেছে ইস্পাতের পাত। দুই প্রান্তের মাঝখানের লাইনটা সম্পূর্ণ হওয়ার পর, বাঁক নিয়ে আরেক দিকে

এগোল সেটা। চারকোনা একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আমপালা, নিচে থেকে আট ইঞ্চি পুরু ইস্পাত কেটে একটা ছত্রিশ বর্গ ফিট ফাঁক তৈরি করছে থারমিক লেন্স। আর চার ইঞ্চি কাটলেই বর্গটা সম্পূর্ণ হবে, এই সময় ইস্পাত ছেঁড়ার কর্কশ আওয়াজ তুলে টুকরোটা পড়ে গেল নিচে।

পাঁচ ফিট নিচের কাদায় প্রচণ্ড শব্দে পড়ল ভারী টুকরোটা। থারমিক লেন্স অপারেট করছিল দায়াম, টুকরোটা পড়বে জানত, লোকজনকে নিয়ে আগেই নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়েছিল সে। ফাঁকের কিনারাগুলো আগুন হয়ে আছে, সাবধানে ফাঁক গলে নিচে নামল আমপালা, মাথা নিচু করে কুঁজো হয়ে থাকল, একে একে তাকাল সবার দিকে। এরা প্রায় সবাই রোনাল্ডের লোক, পেশাদার গুণ্ডা। এক জায়গায় লাইন দিয়ে বসে, আয়েশ করে সিগারেট ফুঁকছে সবাই। এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল ওরা, এবার কাজে হাত দেবে।

'কি রকম বুঝছ?' দায়ামকে জিজ্ঞেস করল আমপালা।

নাক কোঁচকাল দায়াম। 'যা দেখে গিয়েছিলাম তারচেয়ে খারাপ। ব্রিদিং ইকুইপমেন্ট লাগবে আমাদের—এ সহ্য করার মত গন্ধ নয়। পানিও আজ বেশি দেখছি।'

'এটা নিয়েই দুশ্চিন্তায় ছিলাম,' বলল আমপালা, 'ক'দিন রোজই বৃষ্টি হয়েছে।' জুতো খুলে রাবার বুট পরছে সে। 'তবু, যেতে পারব নিশ্চয়ই?'

'তা পারব,' বলল দায়াম। 'রোনাল্ড যাদের নিয়ে এসেছে, এরচেয়ে কঠিন কাজে অভ্যস্ত সবাই।'

পনেরো জন লোক, সবার পায়ে রাবার বুট। কাঁধ দিয়ে গলিয়ে প্রত্যেকে ব্রিদিং ইকুইপমেন্ট পরে নিল। ভিতের মাঝখান দিয়ে পথ করে এগোল তারা। পাঁচ ফিট উঁচু কাদার কার্নিস থেকে পাশের বিল্ডিঙের ভিত্-এলাকায় নামল। সবাই ভাল করেই জানে কি করতে হবে তাদের। গাঁথুনির মাঝখানে একটা ফাঁক তৈরি করে রেখে গেছে রানা, সেটা দিয়ে গলে দু'ফিট গভীর পানি আর নরম আবর্জনায় পা ফেলার সময় প্রত্যেকে যার যার ব্রিদিং মাস্ক অ্যাডজাস্ট করে নিল।

রানা আর দায়াম যে পথে এসেছিল, সেই পথটাই ব্যবহার করছে ওরা, প্রথম ছোট সিউয়ারে পৌঁছে সাত ফিট পর পর একজন করে লোক দাঁড়াল। দ্বিতীয় টানেলেও এই নিয়মে লোক দাঁড় করানো হলো, এই টানেলটাই সারাটা পথ ক্রমশ ঢালু হয়ে কিং'স স্কলার্স' পন্ড সিউয়ারে গিয়ে মিশেছে, নর্দমার পানি আর আবর্জনা ওখানেই খালাস করে। বাকি লোকগুলো দুটো বিল্ডিঙের ভিত-এলাকায় সমান দূরত্ব নিয়ে দাঁড়াল। এখানের বাতাস ততটা দূষিত নয়, ব্রিদিং ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করার দরকার পড়ল না।

শুকনো একটা জায়গায় ভাঁজ করা ক্যানভাস ব্যাগের স্তূপ রয়েছে, কয়েকটা নিয়ে ফাঁকটা দিয়ে ভল্টে তুলে দিল আমপালা। 'শুরু করে দাও, শুরু করে দাও! সময়ের কোন অভাব নেই, তবু যত তাড়াতাড়ি সারা যায়। একশো টন, সবটুকু চাই আমি। প্রতি ব্যাগে পঁচিশটা করে বার, মনে আছে তো?'

লাফ দিয়ে ভল্ট থেকে নিচে নামল পিয়ানো, আমপালার পাশে সিধে হয়ে দাঁড়াল, তার মাথা আর কাঁধ এখনও ভল্টের ভেতর। সঙ্গীরা ক্যানভাস ব্যাগে

সোনার বার ভরছে, দেখছে সে। প্রথম ব্যাগটা ধরিয়ে দেয়া হলো তার হাতে। বোঝার ভারে কুঁজো হয়ে গেল সে, ভল্ট থেকে মাথা বের করে হেঁটে গেল চেইনের প্রথম লোকটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাগটা তাকে দিয়ে ফিরে এল সে, ইতোমধ্যে দ্বিতীয় ব্যাগটা হাতে নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে আমপালা।

সাফল্য এখনও বহুত দূর, তবু এখন পর্যন্ত কোথাও বাধা পায়নি ওরা। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে আমপালার রক্ত। সানগ্লাস খুলে রেখেছে, তার চোখ জোড়া নগ্ন লোভে চকচক করছে। পিয়ানোর হাতে ব্যাগটা তুলে দেয়ার সময় মনে মনে হিসেবটা স্মরণ করল সে, প্রতিটি ব্যাগে পাঁচশো হাজার ডলার মূল্যের সোনা রয়েছে।

চেইনটা সাবলীল ভাবে কাজ শুরু করল।

পানির গভীরতা আজ একটু বেশি হলেও, টানেলের প্রথম অংশ ধরে এগোতে কোন অসুবিধে হলো না। শ্যাফটে ব্যাগগুলো নামিয়ে দ্বিতীয় টানেলে নামা, তাতেও কোন সমস্যা দেখা দিল না। শ্যাফটের নিচে রোনাল্ডের এক লোক, ছয় ফিট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা গরিলা, দাঁড়িয়ে আছে। ওপর থেকে একজন লোক পঞ্চাশ কিলো ওজনের ব্যাগ ফেলছে, গরিলার পেশল দুই হাত সেটাকে অনায়াসে লুফে নিচ্ছে।

সমস্যায় ফেলে দিল দ্বিতীয় টানেলটা। এটার ছাদ নিচু, কাজেই এখানে ওদেরকে কাজ করতে হলো শিরদাঁড়া বাঁকা করে। মেঝেতে এক ফুটের বেশি গভীর পানি, পিচ্ছিল আবর্জনায় প্রতি মুহূর্তে পা পিছলাবার ভয়। কিন্তু অসুবিধে সত্ত্বেও সোনা চালানের কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। সব জড়ো হতে থাকল গভীর পানির কাছে, যার তীব্র স্রোত কলকল ছলছল শব্দে ছুটে চলেছে টেমস নদীর দিকে। এটাই সেই শত বছরের পুরানো টাইবার্ন নদী।

প্রায় কানায় কানায় ভরে আছে নদী। নদীর কিনারায় ভাসছে দশটা বড় আকারের রাবার ডিঙি, রশি দিয়ে বাঁধা সব ক'টা, ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে আছে রশিগুলো। ব্যাগগুলো পৌঁছুতে শুরু করতেই ডিঙির লোকজন সবচেয়ে কাছেরটা লোড করতে শুরু করল। পঁচিশটা ব্যাগ তোলা হলো ডিঙিতে, কিনারায় কাছে উঠে এল পানি। লাফ দিয়ে একজন লোক চড়ল, দেরি না করে স্টার্ট দিল আউটবোর্ড মোটরে। বাঁধন খুলে রশিটা ছেড়ে দিল সে, দ্রুত বাঁক নিয়ে টেমস নদীর দিকে ছুটল ডিঙি। বিশ মিনিট পর আবার যখন খালি হয়ে ফিরে এল ডিঙিটা, দশটার মধ্যে শেষ ডিঙিটা সবে মাত্র সোনা নিয়ে নিজের পথে রওনা হয়ে গেছে। প্রথম ডিঙির ড্রাইভার লাফ দিয়ে পাড়ে নামল, দ্বিতীয় ট্রিপের জন্যে কার্গো লোড করবে।

বেলা পৌনে দুটোর মধ্যে ভল্ট অনেকটাই খালি করে ফেলল ওরা। আমপালা আন্দাজ করল, অর্ধেক সরিয়ে ফেলা গেছে। ফাঁক গলে ভল্টে এইমাত্র উঠেছে সে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে। বুঝল, সোনা সরাবার জন্যে নির্ধারিত তিন ঘণ্টা সময় সীমা কম করা হয়নি, কাজটা শেষ করতে আরও হয়তো দু'দশ মিনিট বেশিই লাগবে ওদের, কিন্তু অর্ধেক নয়, পুরো একশো টনই নিতে পারবে ওরা।

নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মাফিয়া চীফের চেহারা। বিড় বিড় করে আপন মনে বলল, 'এই সুযোগ কি বারবার আসে! মাইকেল আমশালা, তুমি বিলিওনিয়ার হতে যাচ্ছ!'

## দশ

সতর্ক প্রতিটি হাত এক একবারে মাত্র এক টুকরো ইঁট তুলে সরিয়ে নিচ্ছে। ধ্বংসস্তূপের ভেতর কোথাও, বেশি দূরে নয়, কেউ একজন বেঁচে আছে। ওরা তার চাপা গোঙানি শুনতে পাচ্ছে। অত্যন্ত সাবধানে হ্যান্ড-ক্রেন ব্যবহার করছে দমকল কর্মীরা, শুধুমাত্র বড় চাঁইগুলো সরাবার জন্যে। ভারসাম্য হারিয়ে স্তূপের একটা অংশ যদি দেবে যায়, আহত লোকটাকে বাঁচানো যাবে না।

মার্বেল আর্ক টিউব স্টেশন থেকে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে বেরিয়ে এল কোয়্যাক্সেল হেগেনের সেক্রেটারি। হাতে ব্রীফকেস, অলস পায়ে হাঁটছে। অর্চারড স্ট্রীটে ঢুকে বাঁ দিকে বাঁক নিল সে, অক্সফোর্ড স্ট্রীটের লোকারণ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে স্বস্তি বোধ করল। ব্রীফকেসটা বগলের নিচে আটকে একটা সিগারেট ধরাল সে। তেমন কোন সাড়া নেই, তেল আবিব ক্রেডিট ব্যাংকের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট নিজের চোখে দেখতে যাচ্ছে, তারপরই তার ছুটি, বাড়ি ফিরে ভি. সি. আর-এ ব্লু ফিল্ম দেখবে।

এবার ডান দিকে বাঁক নিল সে, ঢুকে পড়ল উইগমোর স্ট্রীটে। রাস্তার দু'পাশে লোকজনের ভিড়, মাঝখানে অচল দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহন দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। আরও খানিক এগিয়ে ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পেল। পুলিসের একটা গাড়িও রয়েছে। হাঁটার গতি দ্রুত হলো তার। ভিড়ের কিনারায় পৌঁছুবার আগেই দুই বিল্ডিঙের মাঝখানের ফাঁকটা চোখে পড়ল। ঠোঁট থেকে খসে পড়ল সিগারেট, হাত দিয়ে চোখ রগড়ে আবার ভাল করে তাকাল।

ব্যাংক ভবনটা নেই।

লোকজনকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে এগোল সে। ভিড় ভেদ করে বেরিয়ে এল আরেক দিকে। পনেরো ফিট উঁচু ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে বিস্ফারিত চোখ জোড়া। 'এসব কি! কি ঘটেছে এখানে?'

তার পাশের লোকটা রাস্তার ওপারের এক জানালা থেকে গোটা ব্যাপারটা দেখেছে, উত্তেজিত ভঙ্গিতে সে-ই সব ব্যাখ্যা করল। সেক্রেটারির উপস্থিত বুদ্ধি আছে, সবটা শোনার আগেই একজন পুলিসের খোঁজে ছোটাছুটি শুরু করল সে। পেয়েও গেল একজনকে। ভিড়ের কাছ থেকে একটু দূরে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে, নির্লিপ্ত চেহারা। পকেট থেকে কার্ড বের করে পুলিসম্যানের সামনে ধরল সেক্রেটারি, রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। 'আপনারা করছেনটা কি? ওখানে একটা ব্যাংক ছিল! ব্যাংকে···টাকা ছিল! দু'ঘণ্টা ধরে ব্যাংকটাকে লুঠ করা হচ্ছে

আপনাদের চোখের সামনে! আর আপনি কোমরে হাত দিয়ে···'

বেজার দেখাল পুলিসম্যানকে, বলল, 'দেখি কি করতে পারি, স্যার,' বলে ভিড় ঠেলে এগোল সে। 'এই যে, ভায়েরা, আপনারা সরুন। এখানে নাচ-গানের আসর বসেনি, এবার কেটে পড়ুন।'

পেট্রল কার থেকে টেলিফোনে কথা বলল পুলিস। তাকে সেখানে রেখে ছুটল সেক্রেটারি, টেলিফোন বুদ থেকে দূতাবাসে খবর দেবে।

চমৎকার একটা লাঞ্চ সেরে সবে মাত্র অফিসে ফিরেছে কোয়ায়েল হেগেন, খেঁকিয়ে উঠল টেলিফোন। ঘড়িতে এখন দুটো বেজে বাইশ। রুদ্ধশ্বাসে সেক্রেটারির অবিশ্বাস্য বর্ণনা শুনছে সে, আর ঠিক সেই সময় চোদ্দশো ব্যাগ সোনা রাবার ডিঙিতে তোলার কাজ শেষ করছে রোনাল্ডের লোকেরা। সেক্রেটারি যেখান থেকে ফোন করছে সেখান থেকে কিং'স স্কলারস' পন্ড সিউয়ার খুব বেশি দূরে নয়, প্রায় সরাসরি নিচেই বলা যায়।

হাত থেকে রিসিভার পড়ে গেল, ছুটে বাথরুমে ঢুকল কোয়ায়েল হেগেন। ওখানে দু'মিনিট ধরে বমি করল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে প্রাইভেট ফোনের রিসিভার তুলে স্যার ডুরেলের নাম্বার ডায়াল করল সে।

ওকউড স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু লোক অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে। পরবর্তী ট্রেন দেরি করছে আসতে। আরও কয়েক মিনিট কাটল। তারপর ইন্ডিকেটর বোর্ডে আলো জ্বলে উঠল। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল ট্রেন-যাত্রীদের। আসছে একটা ট্রেন। পিকাডিলি লাইনের শেষ মাথা পর্যন্ত যাবে এটা, একেবারে সেই হিথরো সেন্ট্রাল পর্যন্ত।

'কোন দুর্ঘটনা নয়তো?' স্যার ডুরেল জানতে চাইলেন। 'কিংবা ভুল করে বিল্ডিংটাকে উড়িয়ে দেয়নি ওরা?'

রিসিভার এত জোরে চেপে ধরে আছে হেগেন, সেটা ভেঙে যেতে পারে। না। মেয়েটা একজন লোকের সাথে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে আসে। রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করে সে, বোমা আছে বলে চিৎকার করে সাবধান করে দেয় লোকজনকে। ওদের জন্যে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, সেটা রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণ দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা।'

'হুম। না, দুর্ঘটনা হতে পারে না। কিন্তু ওদের লোক ভেতরে রয়ে গেল, এর মানেটা কি?'

'একটাই মাত্র জায়গা আছে যেখানে ওরা থাকতে পারে···'

'রাইট। ভল্টের ভেতর।'

'গুড গড, ম্যান! বিল্ডিঙের তলা দিয়ে সোনা পাচার করার রাস্তা করে নিয়েছে ওরা, বুঝতে পারছ না? এই মুহূর্তে সব সরিয়ে ফেলছে ওরা! কিছু একটা করতে হবে আমাদের। বুলডোজার পাঠাও! এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। যা করার এখুনি করতে হবে।'

অপর প্রান্তে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন স্যার ডুরেল। তারপর বললেন, 'কিন্তু

নিচে লোক রয়েছে, হেগেন। বুলডোজার নিয়ে কেউ তোমাকে সামনে এগোতে দেবে না।'

'কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে, ডুরেল!' করুণ আবেদনের সুরে বলল হেগেন। 'কত টাকার সোনা আছে তুমি জানো!'

'যে ক'জন পুলিস পাওয়া যায়, পাঠাচ্ছি,' বললেন স্যার ডুরেল। 'কিন্তু খুব বেশি পাওয়া যাবে না...'

'আর্মি? ওদেরকে ডাকা যায় না?' হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইল হেগেন।

'হয়তো যায়,' ইতস্তত ভাব নিয়ে বললেন স্যার ডুরেল। 'দেখি, কি করা যায়। আমার মন্ত্রীর সাথে কথা বলছি। আমার ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব তারচেয়ে বেশি করার চেষ্টা করব, হেগেন।'

দু'হাজার বার ঝুঁকে ব্যথায় টন টন করছে আমপালার পিঠ। দু'হাজার বার ভারী ক্যানভাস ব্যাগের কর্কশ ঘষা খেয়ে তার হাতের তালু দিয়ে রক্ত ঝরছে। শেষ ব্যাগটা পিয়ানোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ধপাস করে কাদার ওপরই বসে পড়ল সে।

পিয়ানোর হাত থেকে চেইন ধরে রওনা হলো শেষ ব্যাগটা। ধসে পড়া বিল্ডিঙের ভিত হয়ে, পাশের আধুনিক বিল্ডিঙের ভিত-এলাকা পেরিয়ে, প্রথম সিউয়ারে পৌঁছুল। এরপর নামল শ্যাফট থেকে দ্বিতীয় সিউয়ারে, রোনাল্ডের গরিলা লুফে নিল ব্যাগটা। তার হাত থেকে চলে গেল পাশের লোকের হাতে, পরপর দু'বার হাত থেকে পিচ্ছিল কাদায় ব্যাগটা ফেলে দিল সে। এই শেষ চেইনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সবার মতই নোংরা পানিতে কয়েকবার গোসল হয়ে গেছে তারও। বাকি সবার মত সে-ও ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে।

গরিলা মুখ তুলে তাকাল, পরবর্তী ব্যাগের জন্যে অপেক্ষা করছে। ব্যাগ নয়, সিগন্যাল এল, আর কোন ব্যাগ নেই। দেয়ালে হেলান দিল সে, নিজের অজান্তেই ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, বসে পড়ল।

কাদায় বসে এক হাত দিয়ে কাঁধ ডলছে আমপালা। ফাঁকের ভেতর দিয়ে ভল্টে তাকাল সে। ঠাণ্ডা ইস্পাতের মেঝেতে শুয়ে পড়েছে তিনজনই। এক নাগাড়ে সোনার ইঁট নাড়াচাড়া করে তিনজনেরই তালুর চামড়া ছিলে গেছে। চোখ নামিয়ে কাদায় বসে থাকা পিয়ানোর দিকে ফিরল আমপালা। 'বাজি মেরে দিয়েছি, পিয়ানো! সবটা সরিয়ে ফেলেছি আমরা! পাঁচ মিনিট বিশ্রাম, ঠিক আছে?'

পাঁচ মিনিট পর সবাইকে নিয়ে রওনা হলো আমপালা।

নদীর কিনারায় পৌঁছে ওরা দেখল দশটার মধ্যে পাঁচটা ডিঙি কূলের সাথে বাঁধা রয়েছে। টানেলের সর্ব দক্ষিণে একটা ডিঙি রয়েছে, সেটায় চড়ল আমপালা। দেখাদেখি পিয়ানো, আর তার পিছু পিছু বাকি তিনজনও উঠল। এবার ড্রাইভারের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল আমপালা। স্টার্ট দেয়াই ছিল, ডিঙি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। খিলান আকৃতির একটা গাঁথুনির নিচ দিয়ে যাবার সময় সবাই ওরা মাথা নিচু করল। হাইড পার্ক কর্নারের দিকে ছুটে চলল ডিঙি।

ঠিক ওই সময়, ওদের মাথার ওপর, তিনজন সশস্ত্র সৈনিক প্রথম সিউয়ার টানেল ধরে হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে। গ্রুপের লীডার হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে

সামনে টর্চের আলো ফেলল। 'বললাম না, আমি ওদের গলা শুনতে পেয়েছি। ওই দেখো, সিগারেটের টুকরো। চুপ, একদম চুপ!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা। সামনে কোথাও থেকে একজন লোকের গলা ভেসে এল। শ্যাফট থেকে নামার সময় রোনাল্ডের একজন লোক পায়ে আঘাত পেয়েছে, ধুস শালা বলে গাল দিয়ে উঠেছে সে।

'গড! বেশি দূরে নয়! এসো, এসো—শালাদের ডাকাতি বের করছি!'

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে ছুটল সার্জেন্ট। খানিক পর আরও আওয়াজ কানে এল। পানি ভেঙে হাঁটছে কারা, অভিযোগ করছে। সৈনিকের দলটা সাবধানে এগোল এবার, ডাকাত যেন তাদের উপস্থিতি টের না পায়। শ্যাফটের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল দলটা। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সার্জেন্ট, তারপর শ্যাফটের কিনারায় বসে পা দুটো নিচে নামিয়ে দিল। লোহার ধাপ বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল সে। বাকি দু'জনও অনুসরণ করল তাকে।

শেষ ডিঙিটা রওনা হয়েছে, এই সময় মেইন সিউয়ারে নেমে এল সৈনিকটা। ডিঙি আর লোকজনকে দেখেই তারা রাইফেল তুলল। 'হল্ট!' দেয়ালে দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনি তুলল সার্জেন্টের ভারী গলা। 'পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই, সব নিয়ে ফিরে এসো।'

'সর্বনাশ!' থ্রটল পুরো খুলে দিল ড্রাইভার, খিলান কাছে এসে পড়ায় দ্রুত নিচু করে নিল মাথা। একটা পিস্তল বের করে অন্ধকারে গুলি ছুঁড়ল দায়াম। কে বা কারা ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে, সে-সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই।

'দেখামাত্র গুলি করতে বলা হয়েছে, তাই না?' বিড়বিড় করে উঠল সার্জেন্ট, পরমুহূর্তে ট্রিগার টিপে দিল সে। একই সাথে গুলি শুরু করল অপর দুই সৈনিক।

খিলান পেরোতে শুরু করেছে ডিঙি, ষাট রাউন্ড অ্যামুনিশন ছিন্ন ভিন্ন করে দিল ওদেরকে। চারজনই মারা গেল, টুকরো টুকরো হয়ে গেল রাবার ডিঙি। দায়ামের শরীরে সাতটা ফোকর তৈরি করল বুলেট।

দেয়াল ঘেঁষে, শিরদাঁড়া বাঁকা করে, রাইফেল বাগিয়ে সাবধানে এগোল সৈনিকের দলটা। ডিঙি যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার কাছাকাছি নদীর কিনারায় এসে দাঁড়াল তারা। পানিতে টর্চের আলো ফেলে প্রথমে কিছুই দেখল না। আলোটা অপর পাড়ে পৌঁছুল, রক্তাক্ত একটা লাশ পাড়ের গায়ে ঠেকে রয়েছে। বিচ্ছিন্ন ডিঙির কিছু টুকরোও এবার চোখে পড়ল ওদের। ডিঙির বাকি অংশ টেমসের দিকে ভেসে গেছে। নদীর পানি ঘোলা, নিচের দিকে দৃষ্টি চলে না।

'বাকি লাশ ভেসে গেছে,' বলল সার্জেন্ট। 'লুঠের মাল নিয়ে যেতে পারেনি, এটাই ভাগ্য।' তার ধারণা ডাকাতরা এই একটাই ডিঙি নিয়ে এসেছিল। 'কিন্তু এই শালার নোংরা পানি থেকে জিনিসগুলো তোলা হবে কিভাবে? নোট হলে তো সব ভিজে ছাতু হয়ে গেছে! তোমরা থাকো, আমি রিপোর্ট করে আসি।'

পৌনে তিনটের সময় ৫৫, ব্রডওয়ে, লন্ডন ট্রান্সপোর্ট একজিকিউটিভ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুল ফিরোজা, সাথে একজন সঙ্গী। ফিরোজার পরনে কালো লেদার ট্রাউজার, সাদা শার্টের ওপর ছোট একটা বম্বার জ্যাকেট। বিশাল একটা সানগ্লাস পরে আছে

ও, মুখের অর্ধেকটাই তাতে ঢাকা পড়ে গেছে। তার পুরুষ সঙ্গীটি মোটাসোটা, পরনে স্ল্যাকস আর স্পোর্টস জ্যাকেট, গলায় মাফলার। রিসেপশানে ওরা ঢুকতেই অ্যাটেন্ড্যান্ট একগাল হাসল। 'প্রেস অফিসারকে খবর দিতে হবে, তাই না, মিস বেলি?'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল ফিরোজা, সঙ্গীকে ইঙ্গিত করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। ফোনে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল অ্যাটেন্ড্যান্ট। 'স্যার বললেন, পাঁচ মিনিট পর আপনাদের নিয়ে যেতে।'

হাতঘড়ি দেখল ফিরোজা। খুশি হয়ে উঠল মনে মনে। আজ খালেদ যে সময় বেঁধে দিয়েছে তারচেয়ে ক'মিনিট আগেই অপারেশন রূমে ঢুকতে পারবে ওরা। লেদার ব্রীফকেসটা অবহেলার সাথে চেয়ারের পাশে, মেঝেতে নামিয়ে রাখল সে। ব্রীফকেসের ভেতর রাশিয়ায় তৈরি একজোড়া কালাশনিকভ অটোমেটিক পিস্তল রয়েছে।

টেলেক্স মেশিন থেকে ছাপা হয়ে বেরিয়ে এল মেসেজটা। পর পর দু'বার পড়ল কোয়ায়েল হেগেন, তারপর ফোনের রিসিভার তুলে স্যার ডুরেলের নাম্বারে ডায়াল করল। তার কথা শেষ হতে স্যার ডুরেল বললেন, 'একটু অদ্ভুতই লাগছে। তবে, মোশে ফেরেল সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, প্লেবয় টাইপের, তাই না? কিন্তু একেবারে গায়েব হয়ে যাবে, এ কেমন কথা! মারবেলা তেমন বড় একটা জায়গাও তো নয়।··· তোমার সন্দেহ···হ্যাঁ, সত্যি হতেও পারে। হয়তো এই ব্যাপারটার সাথে তার নিখোঁজ হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু কি সেটা?'

ওর হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে নয়, একটা ফোন বুদে ঢুকে পনেরো মিনিট ধরে কয়েন বিসর্জন দিচ্ছে রানা। এতক্ষণ ধরে ও যা বলেছে, প্রতিটি শব্দ রেকর্ড করে নিয়েছে হিথরো এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসাররা। তারা যে-কোন হুমকিকে গুরুত্বের সাথে নেয়, তবে আজকের এই হুমকিটাকে তারা ভাল চোখে দেখছে না। এই লোক কথা বলছে সম্পূর্ণ শান্ত, ঠাণ্ডা সুরে, তাকে ম্যানিয়াক বা ফ্যানাটিক বলে মনেই হয় না। শুধু তাই নয়, এই লোকের এয়ারপোর্ট সম্পর্কে ধারণা, এরোপ্লেন সম্পর্কে জ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন এক্সপার্টের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

আপাতত আর কিছু বলতে চায় না রানা, যা বলার সব বলেছে। 'যা যা বলেছি, দয়া করে একবার প্রথম থেকে রিপিট করো, প্লীজ।'

নির্দেশটা কোন তর্ক ছাড়াই পালন করা হলো।

'গুড। আমি কি চাই তা তোমরা জেনেছ, কিভাবে চাই তাও। কিন্তু যা ঘটবে বলে বলছি, তা সত্যি ঘটবে কিনা, তোমরা জানো না। অপেক্ষা করো, একটু পরই সব জানতে পারবে। আর শুধু একটা কথা বলি, আমরা যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছুব, আমাদের সাথে জিম্মি থাকবে। মহিলা জিম্মি। পৌঁছে যদি দেখি আমাদের জন্যে প্লেনটা রেডি করে রাখোনি, প্রতি মিনিটে একজন করে জিম্মি মারা যাবে।'

সিকিউরিটি অফিসার উত্তরে বলল, 'নাহয় ধরে নিলাম, তুমি যা বলছ সব সত্যি, কিন্তু তুমি কি জানো না যে একটা সেভেন-ফরটি-সেভেনের বহন ক্ষমতা মাত্র

নব্বই টন? একশো টন কার্গো, তার ওপর অতগুলো লোক , উঁহুঁ, নিরাপদে ওটা টেক-অফ করতে পারবে না।'

রিসিভারের মুখের ওপর নিঃশব্দে হাসল রানা। 'একটা সেভেন-ফরটি-সেভেন একশো চল্লিশ টন ফুয়েলও তো বহন করে, করে না? একশো চল্লিশ টন ফুয়েল মানে বারো ঘণ্টা অনায়াসে উড়তে পারবে।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর আবার বলল ও, 'সাত ঘণ্টায় যতদূর যাওয়া যায়, তার বেশি যাব না আমরা। ক্যাপাসিটি পূরণ না করে, কম ফুয়েল ভরো—একশো টন, তার বেশি না।'

'প্লেন সম্পর্কে তুমি দেখছি আমাদের চেয়ে কম জানো না…'

'শুধু শুধু বাড়িয়ে বলছ। যা যা বলেছি, মনে থাকে যেন।' রিসিভার রেখে বুদ থেকে বেরিয়ে এল রানা।

হাইড পার্ক কর্নার, আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন। বেলা তিনটে। অফিস আওয়ার নয়, কাজেই তেমন একটা ভিড় নেই প্ল্যাটফর্মে। ওরা দুই ভাই, রোনাল্ড আর জ্যাক হার্ডি, কাউন্টার থেকে সাউথ কেনসিংটনের দুটো টিকেট কিনল। জিনসের ওপর ব্রাউন লেদার জ্যাকেট পরেছে রোনাল্ড, জ্যাকের গায়ে শীপসৃস্কিন কোট। এসক্যালেটর ধরে নেমে এল ওরা, পশ্চিম-গামী প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে পাশাপাশি একটা খালি বেঞ্চে বসল। দু'জনেই সামনে লম্বা করে দিল পা, দু'জোড়া হাত ঢুকে আছে জ্যাকেট আর কোটের পকেটে। ওদের মাথার ওপর, বুকিং হলে, আমপালার কিছু বাছাই করা লোক পজিশন নিচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মে ঢোকার চারটে পথ, তার মধ্যে তিনটেই খোলা। প্রতিটি প্রবেশ পথের মুখের কাছে, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ওরা, কেউ খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছে। দু'জন ইটালিয়ান, ঘাড়ে-গর্দানে প্রায় সমান, ফিনলে'স টোবাকো শপের পাশে হাতের সুটকেস দুটো রেখে সেগুলোর ওপর গ্যাট হয়ে বসল। শান্ত চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব।

বুকিং অফিসের পাশে আরও তিনজন লোককে এক জোট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল, খাস ইস্ট এন্ডের লোক এরা, কথায় আঞ্চলিক টান স্পষ্ট, রাজনীতি নিয়ে মহাতর্ক জুড়ে দিয়েছে।

এরা সবাই সঙ্কেত পাবার অপেক্ষায় রয়েছে। ইটালিয়ানরা যে সুটকেস দুটোয় বসে আছে, সেগুলোর ভেতর আছে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র, সঙ্কেত পেলেই নিজেদের লোকের হাতে তুলে দেবে।

খোশমেজাজী প্রেস অফিসার সাদর অভ্যর্থনা জানাল ওদেরকে। আগেই কথা হয়েছিল, ওদেরকে নিয়ে ছয় তলায়, লন্ডন ট্র্যান্সপোর্টের নার্ভ সেন্টার, কন্ট্রোল রূমে চলে এল সে। ভেতরে ঢুকে ম্যানেজার মি. পামারের সাথে ফিরোজার পরিচয় করিয়ে দিল অফিসার। ম্যানেজার লোকটা খর্বকায়, চল্লিশের ওপর বয়স, কোটের গায়ে সিগারেটে ছাই লেগে আছে, চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা।

'আপনাকে তো আগেই বলেছি,' ম্যানেজারকে বলল প্রেস অফিসার, 'মিস বেলি গবেষণা করছেন, একটা বই লিখবেন। প্রচুর টেকনিকাল ইনফরমেশন দরকার

ওঁর, পেলে ভারি উপকার হবে।' এরপর সে ফিরোজার দিকে তাকাল। 'মি. পামার আপনাকে সব রকম ভাবে সাহায্য করবেন। অন্য আর কোন ব্যাপারে যদি সাহায্য দরকার হয়, আমার সাথে দেখা করবেন।'

অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল ফিরোজা। অফিসার মিষ্টি হাসি উপহার নিয়ে বেরিয়ে গেল কন্ট্রোল রুম থেকে।

বড়সড় ঘরের ভেতরটা চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে ফিরোজা, তার পুরুষ সঙ্গীটি পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। রঙচঙে কন্ট্রোল প্যানেলগুলো দেখে কিছুই বুঝল না ফিরোজা। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করে স্বস্তিবোধ করল, ঘরে মাত্র পাঁচ-ছয় জন অপারেটর রয়েছে। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করলেও, মুখটা হাসি হাসি করে রাখল সে, ম্যানেজারের দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'কোত্থেকে শুরু করব, বলতে পারেন? আচ্ছা, ধরুন, পিকাডিলি লাইন। কোথায় ওটা দেখতে পাব? নির্দিষ্ট একটা সময়ে ওই লাইনের কোন একটা ট্রেন ঠিক কোথায় আছে, তা আপনি জানছেন কিভাবে?'

'পানির মত সহজ।' কোটের গায়ে টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়ল ম্যানেজার, ওদেরকে নিয়ে বড় একটা কাঁচ ঢাকা প্যানেলের সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েকটা বিভিন্ন রঙের রেখা, একটার ওপর দিয়ে আরেকটা চলে গেছে, রেখাগুলোর মাঝখানে খুদে আলোর ফোঁটা রয়েছে, মন্থর গতিতে এগোচ্ছে ফোঁটাগুলো। একটা রেখার দিকে আঙুল তুলল ম্যানেজার। 'এটা। এই নীল রেখাটা পিকাডিলি লাইন। আমাদের ম্যাপেও এই লাইনের জন্যে নীল রঙ ব্যবহার করা হয়েছে।'

'ইন্টারেস্টিং!' মিনিট খানেক খুঁটিয়ে দেখল ফিরোজা। 'আর, আপনারা ট্রেনগুলোর সমস্ত মুভমেন্ট এখান থেকে কন্ট্রোল করেন?'

'কন্ট্রোল অ্যান্ড অরগানাইজ, ইয়েস। তবে, এখান থেকে আমরা ঠিক পাওয়ার হ্যান্ডেল করি না। ওটা করা হয়, পিকাডিলি লাইনের বেলায়, লটস রোড জেনারেটিং স্টেশন থেকে।'

'ও, আচ্ছা।' কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ফিরোজা। 'কিন্তু কখন কি করতে হবে না হবে, নিশ্চয়ই ওদেরকে আপনারা নির্দেশ দেন? ধরুন, পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করার দরকার পড়ল, তখন?'

'হ্যাঁ, তা দেই। ওদের সাথে আমাদের সারাক্ষণ যোগাযোগ আছে। ডাইরেক্ট লাইন।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। প্রেস অফিসার সেদিন বলেছিলেন আমাকে।' কথা বলার সময় কন্ট্রোল প্যানেলের সামনের চওড়া কার্নিসের ওপর ব্রীফকেসটা রাখল ফিরোজা। ব্রীফকেসের ডালা মাত্র ছয় ইঞ্চি খুলল সে, হাত ভরে ভেতর থেকে বের করে আনল একটা চকচকে পিস্তল। অপর হাতের সাহায্যে পিস্তলটাকে স্থির করে ওপর দিকে তুলল, মাজল ঠেকাল ম্যানেজারের ঠোঁটের ওপর। ফিরোজার সঙ্গীও একটা পিস্তল বের করল, ফিরোজার দিকে পিছন ফিরল সে, হঠাৎ কেউ কন্ট্রোল রুমে ঢুকলে সামলাবে তাকে।

ম্যানেজার চোখ পিট পিট করল, তারপর ঝুলে পড়ল তার মুখ।

'দুঃখিত, মি. পামার,' বলল ফিরোজা। 'এই কন্ট্রোল সেন্টার এখন আমাদের

দখলে। প্লীজ, বাধা দেয়ার কথা কেউ চিন্তাও করবেন না। সরাসরি গুলি করব, খুন করার জন্যে। যা বলব করবেন, কারও গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না।'

ফিরোজার সঙ্গী দরজার পাশে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে, বলল, 'সবাই চুপ। কেউ সীট ছেড়ে নড়বেন না। নড়তে দেখলেই আমি গুলি করব।'

অপারেটরদের মধ্যে থেকে চাপা একটা গুঞ্জন উঠেছিল, থেমে গেল সেটা। কিন্তু পরমুহূর্তে একটা মেয়েলি কণ্ঠ শোনা গেল, অভিশাপ দিচ্ছে। ঘাড় ফেরাল পিস্তলধারী লোকটা, কাছেই বসে থাকতে দেখল প্রৌঢ়াকে। দু'পা এগিয়ে প্রৌঢ়ার মাথায় পিস্তলের উল্টো দিক দিয়ে বাড়ি মারল সে। চেয়ার থেকে ধপাস করে পড়ে গেল মহিলা। দু'বার পা ছুঁড়ল, তারপর স্থির হয়ে গেল, জ্ঞান হারিয়েছে। 'দেখলে তো? এখানে আমরা খেলা করতে আসিনি।'

কেউ নড়ল না। কেউ কথা বলল না। বিস্ফারিত চোখে রাজ্যের ভয় নিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকল।

'গুড গড, কি চাও তোমরা?' হঠাৎ কাঁপতে শুরু করে চেঁচিয়ে উঠল ম্যানেজার। 'যদি ভেবে থাকো পার পেয়ে যাবে…'

'চোপ!' ম্যানেজারের বুকে পিস্তলের খোঁচা দিল ফিরোজা।

কিন্তু ম্যানেজার চুপ করল না। 'এখানে আমাদের ঘাড়ে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে, হাজার হাজার মানুষের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে আমাদের ওপর। অপারেটররা কাজ বন্ধ করলে যে-কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে যাবে…'

'কাজ করতে কেউ তো ওদেরকে বাধা দিচ্ছে না,' বলল ফিরোজা। 'এমন ভাবে কাজ করুক, যেন কিছুই ঘটেনি। কিন্তু চেয়ার ছেড়ে কেউ উঠতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না ফোনে।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর আবার বলল, 'মন দিয়ে শুনুন, মি. পামার। একটু পর আমার একটা টেলিফোন আসবে। যখন আসবে, কোন রকম চালাকি করবেন না। স্রেফ রিসিভারটা আমাকে এনে দেবেন।' রূমের চারদিকে তাকাল সে। 'পাওয়ার স্টেশনের সাথে ডাইরেক্ট লাইন—কোথায় সেটা?'

একটা লাল বোতাম আর স্পিকার ডিভাইস দেখাল ম্যানেজার, কন্ট্রোল প্যানেলের ডান দিকে। 'ওটা। কিন্তু…'

'আর কোন কথা নয়,' বলে ব্রীফকেসের পাশে চওড়া কার্নিসে উঠে বসল সে। 'এখন আমরা অপেক্ষা করব।'

কিং'স স্কলারস' পন্ড সিউয়ার যেখানে হাইড পার্ক কর্নার স্টেশনের কাছ দিয়ে বয়ে গেছে, সেখান থেকে পিকাডিলি লাইন টানেল পঁয়তাল্লিশ গজ নিচে, টানেলের চেয়ে সারফেসের বিশ গজ কাছে পন্ড সিউয়ার। দু'বারের চেষ্টায়, একবার ফিরোজাকে সাথে নিয়ে, আরেকবার পিয়ানোকে সাথে নিয়ে, সিউয়ার থেকে রেলওয়ে টানেলে নামার একটা পথ আবিষ্কার করেছে রানা।

ওরা যে পথটা আবিষ্কার করে সেটা অত্যন্ত জটিল। শুরুতেই পথটা স্টেশনের উল্টো দিকে একটা সাবসিডিয়ারি সিউয়ার পাইপের পাশাপাশি দশ গজ এগিয়েছে। ওখানে রয়েছে ওপরে ওঠার একটা পথ, সেটা একটা সিউয়ারের ছাদ হয়ে আবার

নিচের দিকে নেমেছে। এখানে ধাপগুলো সরু আর পিচ্ছিল। সবশেষে রয়েছে চিকণ একটা টানেল, ক্রমশ নিচের দিকে অনেকটা নেমে গেছে, তারপর একটা স্টর্ম-রিলিফ সিউয়ার। এটাও একটা সরু সিউয়ার, মাত্র ছয় ফিট চওড়া, এখানে একটা জায়গায় পানির সামান্য ওপরে মাথা তুলে আছে একটা পিলার, সেটায় পা রেখে ওপারে যাওয়া সহজ। পানির ওপারে, ভাটি ধরে কয়েক গজ এগোলে ইঁটের গাঁথুনি পড়ে, সেটার গায়ে বড় একটা ফাঁক তৈরি করে রেখে গেছে ওরা। ফাঁক গলে বেরুনো যায় লন্ডন ট্র্যান্সপোর্টের একটা মেইন্টেন্যান্স এরিয়ায়। ওখান থেকে হাইড পার্ক কর্নার স্টেশনের পুব প্রান্তটা বেশি দূরে নয়। মেইন্টেন্যান্স এরিয়া থেকে সরাসরি রেলওয়ে লাইনে, পশ্চিম-গামী টানেলে উঠে আসা যায়।

তিনটে দশ মিনিটে স্টেশনে দেখা গেল পিয়ানোকে, পরনে রেলওয়ে কর্মীর উর্দি। টানেল থেকে উঠে এসে ঢালু একটা চাতালের সামনে দাঁড়াল সে, চাতালটা উঠে গেছে প্ল্যাটফর্মে। রোনাল্ড আর জ্যাক তাকে দেখল, সাথে সাথেই অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল মুখ। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে এল পিয়ানো। ভিড় ঠেলে এগোল সে, এসকেলেটরের পাশের সিঁড়ি ধরে উঠল, প্রতিবারে দুটো করে ধাপ টপকে। মাথায় উঠে, এগজিট বুদের ওপর দিকে দাঁড়াল সে, তিনজন স্থানীয় লোকের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করে একটা সঙ্কেত দিল। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার নিচে নামল সে, ফিরে এল টানেলের মুখে। এখানে সে এক সেকেন্ড দাঁড়াল, কি যেন শুনতে চেষ্ট করল কান পেতে, তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

টানেল ধরে দশ গজ এগিয়ে বাঁক নিল পিয়ানো, ঢুকে পড়ল মেইন্টেন্যান্স এরিয়ায়। এখানে পৌঁছে আরেকবার থামল সে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। একটা ট্রেন আসার আওয়াজ পাচ্ছে সে। সাবধানে উঠতে শুরু করে ফিরে এল সিউয়ারে, আমপালার কাছে।

প্রাচীন গাঁথুনির গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে ওরা। সবাই ক্লান্ত, নর্দমার নোংরা পানি গা থেকে এখনও শুকায়নি। নার্ভাস হয়ে পড়েছে আমপালা, পরবর্তী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। সৈনিকদের দেখেনি সে, কিন্তু তাদের গুলির আওয়াজ আর প্রতিধ্বনি শুনেছে। রাবার ডিঙির যে অংশটুকু ডোবার নয়, সেটাকে টেমসের দিকে ভেসে যেতেও দেখেছে সে। ঠিক কি ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার। দায়ামকে হারিয়ে ভয়ানক রেগে গেছে সে। মেজাজ খারাপ হওয়ার আরও বড় কারণ, ধাওয়া শুরু হয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে হায়েনার দল পৌঁছে যেতে পারে। সেটা যাতে হঠাৎ করে না ঘটে, তার ব্যবস্থা অবশ্য করেছে সে। দলের তিনজন সেরা স্নাইপারকে সিউয়ারে দুশো গজ পিছনে পাঠিয়ে দিয়েছে।

নদীর কিনারায় দু'হাজার ব্যাগ সোনা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ছয় ফিট উঁচু হয়েছে স্তূপটা, চার ফিট চওড়া, আর লম্বায় নব্বই ফিট। পিয়ানোকে দেখে উঠে দাঁড়াল আমপালা।

হাইড পার্ক কর্নার স্টেশন। পিয়ানোর সঙ্কেত পাবার সাথে সাথে ছোট্ট দলটা থেকে সরে এল লোকটা, ঢুকল টেলিফোন বুদে। ঠিক এই সময় কাউন্টার থেকে ক্যালিডোনিয়ান-এর একটা টিকেট কাটল ডিক সামার। রোনাল্ড হার্ডির সাথে

সামারের পরিচয় আছে, আছে ব্যবসায়িক সম্পর্ক, এই ক'দিন আগেও দশটা রাবার ডিঙি বিক্রি করেছে সে রোনাল্ডের কাছে, কিন্তু এই মুহূর্তে হাইড পার্ক স্টেশনে তার উপস্থিতি নেহাতই কাকতালীয় ঘটনা। রাবার ডিঙি কি কাজে ব্যবহার করবে রোনাল্ড, তার জানা নেই। সোনা লুঠ সম্পর্কেও কিছু শোনেনি সে। এসকেলেটর ধরে নেমে এল সে, নিচে পৌঁছে অলস পায়ে এগোল পশ্চিম-গামী প্ল্যাটফর্মের দিকে।

ইটালিয়ান লোক দু'জন তাদের সুটকেস খুলে প্রকাশ্যেই অস্ত্র বিলি করতে শুরু করল। ট্রেন-যাত্রী যারা ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে, দৃশ্যটা দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। যারা সতর্ক, যাদের উপস্থিত বুদ্ধি আছে, ছুটে বেরিয়ে গেল স্টেশন থেকে। বাকিরা সবাই আটকা পড়ল ফাঁদে। রোনাল্ড আর আমপালার লোকেরা এখন সবাই সশস্ত্র। প্রত্যেকে মুখোশ পরে আছে। প্রবেশ পথগুলোর মুখে দাঁড়িয়ে ফাঁকা কয়েকটা গুলি করল ওরা।

ট্রেনের জন্যে অপেক্ষারত আরোহীরা আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করল। বুকিং অফিস স্টাফ সহ তাদের সবাইকে গরু-খেদা করে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সবাইকে নামানো হলো এসকেলেটর দিয়ে। রোনাল্ডের একজন লোক ওপর তলার এসকেলেটরের গোড়ায় দাঁড়াল, কেউ যাতে এ-পথে উঠতে না পরে। আরেকজন দাঁড়াল মাথায়, ইতোমধ্যে যারা উঠতে শুরু করছে তাদেরকে আবার নিচে ফেরত পাঠাল সে। এরমধ্যে তিনটে খোলা গ্রিলে তালা লাগাতে বাধ্য করা হলো হেডক্লার্ককে, ফলে সীল্ড হয়ে গেল গোটা স্টেশন।

জ্যাক হার্ডি দুই প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, পরিস্থিতি আঁচ করতে চায়। সব কিছু প্ল্যান মত ঘটছে দেখে মুখোশ পরতে শুরু করল সে। ঠিক এই সময় গোলযোগের কারণ জানার জন্যে পুব-গামী প্ল্যাটফর্মে ঢুকল ডিক সামার, ঢুকেই দেখতে পেল জ্যাককে, দেখেই চিনতে পারল। রোনাল্ডের সাথে কারবার করে, তার ভাইকেও ভাল করে চেনে সে। জ্যাককে পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করতে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তার। 'ফর গডস সেক, জ্যাক, কি ঘটছে এখানে?'

আওয়াজ শুনে ঝট করে মুখ তুলল জ্যাক, অস্ত্র তাক করল সামারের বুকের দিকে, কর্কশ গলায় বলল, 'পিছু হটো, প্ল্যাটফর্মে যাও! সবার সাথে থাকো!'

'কিন্তু, জ্যাক...'

দ্রুত এগিয়ে এসে ব্যারেল দিয়ে সামারের পাঁজরে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল জ্যাক। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সামার। 'আরেকবার নাম ধরবি তো শালা তোর ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব। এখন তোকে ছেড়ে দিতে পারি না, পুলিস তোকে জেরা করবে। যা ভাগ, সবার সাথে গিয়ে দাঁড়া,' বলে সামারকে ধরে ঘুরিয়ে দিল জ্যাক, তারপর তার পিছন দিকটায় জোরসে এক লাথি কষাল।

প্ল্যাটফর্মে মহা হৈ-চৈ শুরু হয়েছে। বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে বয়স্কা মহিলারা। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ষাঁড় চেহারার ফুটবল খেলোয়াড় সৎ সাহস দেখাতে গিয়ে অকালে মারা পড়ল। আমপালার একজন লোকের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল সে। তার পেটে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল রাইফেলধারী, প্ল্যাটফর্মের শক্ত মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ল সে। রাইফেলধারী

তার দিকে রাইফেল তাক করে চিৎকার করে বলল, 'কেউ বাধা দিলে তার অবস্থা কি হবে, দেখে নিক সবাই।'

ছয় রাউন্ড গুলি বেরুল রাইফেল থেকে। খেলোয়াড়ের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

গোটা প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ করে নেমে এল ভৌতিক নিস্তব্ধতা। বয়স্করা ফোঁপাচ্ছে না, এমনকি বাচ্চারাও চুপ করে গেছে। এরপর আর কেউ ওদেরকে কোন রকম বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না। মাত্র এক মিনিটের মধ্যে সবাইকে যেখানে চেয়েছিল ওরা, সেখানে নিয়ে যেতে পারল। পশ্চিম-গামী প্ল্যাটফর্মের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে থাকল সবাই, সবার হাত যার যার মাথার পিছনে। তাদের সামনে পায়চারি শুরু করল রোনাল্ড হার্ডি।

ব্রডওয়ে, এল.টি.এ. হেডকোয়ার্টার। হাইড পার্ক কর্নার থেকে প্রত্যাশিত ফোন কলটা পেল ফিরোজা। তিন মিনিট অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে ওকে। এই তিন মিনিট ইন্ডিকেটর বোর্ডের সচল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকল ও। তাকে বলা হয়েছে এই তিন মিনিটের মধ্যে কোন ট্রেনকে সে যদি স্টেশনে ঢুকতে দেখে তাহলে সময় হওয়ার আগেই তাকে কাজ শুরু করতে হবে। নীল রেখা বরাবর একটা সাদা আলো এগোচ্ছে, গ্রীন পার্ক থেকে হাইড পার্কের দিকে গতি।

গভীর একটা শ্বাস টেনে কন্ট্রোল ম্যানেজারের গলায় পিস্তল চেপে ধরল ফিরোজা। 'মি. পামার, লটস রোডকে ডাকুন। আমি চাই, পিকাডিলি লাইনের সমস্ত পাওয়ার কেটে দেয়া হোক। এই মুহূর্তে।'

# এগারো

সমস্ত আলো নিভে গেল, পাওয়ার চলে যাওয়ায় ব্রেক কষে ট্রেন দাঁড় করাল ড্রাইভার। পিছনের বগিগুলো থেকে গুঞ্জন তুলল আরোহীরা, কিন্তু কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা আর অন্ধকারের মধ্যে দু'মিনিট অপেক্ষা করার পর সে বুঝল, অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে। পাশের জানালা খুলে ইমার্জেন্সী পাওয়ার লাইনে প্লাগ ঢোকাল সে, দু'একবার মিটমিট করে জ্বলে উঠল আলো।

পাঁচ মিনিট কাটল। পাওয়ার ফিরছে না। ক্যাব থেকে মাথা আর কাঁধ বের করে দিয়ে ড্রাইকো টেলিফোন সিস্টেমের দু'টুকরো সীসা টানেলের গা বরাবর এগিয়ে যাওয়া তামার জোড়া তারের সাথে জড়াল ড্রাইভার, কথা বলল লন্ডন ট্রান্সপোর্ট একজিকিউটিভের সাথে। অপরপ্রান্ত থেকে তাকে বলা হলো, লাইনে গুরুতর ত্রুটি দেখা দিয়েছে। মেরামতের কাজ শেষ হলেই পাওয়ার দেয়া হবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখের সামনে খবরের কাগজটা মেলে ধরল ড্রাইভার।

'গুড···হ্যাঁ, কিন্তু শুধু ওই ক'জনই ছিল তা মনে করার কোন কারণ নেই।···হ্যাঁ,

টপ সিক্রেট ইমফরমেশন, ইচ্ছে থাকলেও সব বলার উপায় নেই, ব্রিগেডিয়ার। আপনি কিন্তু খুব দ্রুত কাজ দেখিয়েছেন···আচ্ছা, ঠিক আছে, যতটা সম্ভব জানাচ্ছি আপনাকে, কিন্তু মনে রাখবেন এটা ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন। শুনুন, আমরা আসলে প্রচুর সোনা ফেরত পেতে চেষ্টা করছি··· কি? হ্যাঁ, সোনা। যতটা চুরি হয়েছে, বিশটা রাবার ডিঙি করেও নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ওই সময়ের মধ্যে মাত্র পাঁচজন লোক একশোভাগের এক ভাগও সরাতে পারবে বলে মনে হয় না। ওখানে কোথাও ওদের বাকি লোকেরাও আছে। সোনাসহ···হ্যাঁ, জানি, অসুবিধেগুলো জানি আমি, ব্যাখ্যা করতে হবে না। কিন্তু এটা আরও বেশি জরুরী, জাতীয় গুরুত্ব বহন করছে···জানি আপনি সাধ্য মত করবেন। টানেলে যত বেশি সম্ভব লোক পাঠান। সিউয়ারের একটা প্ল্যান কোথাও থেকে যোগাড় করুন। ডিঙির ব্যবস্থা করুন··· কি? হ্যাঁ, যথেষ্ট কারণ আছে বলেই আমি নার্ভাস ফিল করছি। ওই সোনা আমাদের ফেরত পেতে হবে।··· ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রেখে স্যার এডওয়ার্ড ডুরেল টেবিলে একটা চাপড় মারলেন, রাগের সাথে বললেন, 'শালার মাথামোটা মিলিটারি!' গজ গজ করতে করতে আবার রিসিভার তুলে নিয়ে ইসরায়েলি দূতাবাসের নাম্বার ডায়াল করলেন তিনি।

আমপালার খাড়া নাক মোজার চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। হাতে মেশিনগান নিয়ে টানেল থেকে বেরিয়ে এল সে, ঢালু চাতাল টপকে উঠে এল স্টেশনে। মাথার পিছনে হাত তুলে বসে থাকা লোকগুলোর সামনে দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে গেল সে, শক্ত-সমর্থ কাউকে দেখলেই তার মেশিনগানের ব্যারেল দিয়ে তাকে খোঁচা দিচ্ছে, ভয়ে শিউরে উঠছে লোকটা, আমপালার নির্দেশে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। লাইনের শেষ মাথায় পৌঁছুল আমপালা, পঞ্চাশ জন লোককে বেছে নিয়েছে সে, তাদের মধ্যে ডিক সামারও আছে। তাদের সবার হাত এখনও যার যার মাথার পিছনে সাঁটা, মুখের চেহারা আতঙ্কে নীল। সিউয়ারের যেখানে সোনা রাখা হয়েছে সেখান থেকে প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত এদেরকে দাঁড় করানো হবে।

'কেউ কোন প্রশ্ন করবে না,' বলল আমপালা। 'প্রতিবাদ করলেই গুলি। আমরা টানেলে নামব, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, পাওয়ার অফ। তুমি,' স্যুট কোট পড়া এক শহুরে ভদ্রলোকের পাঁজরে ব্যারেল দিয়ে গুঁতো মারল সে, '···আমার পিছু নাও। খবরদার, কোন রকম চালাকি নয়।' টানেলের মুখে এসে বিশটা জ্বলন্ত ল্যাম্পের সামনে দাঁড়াল সে। 'প্রতি তিনজনের একজন একটা করে ল্যাম্প নাও। বাকি সবার হাত মাথার পেছনেই থাকবে। মাথা থেকে হাত নামালেই গুলি।'

তার কপালে এসব ঘটছে, বিশ্বাসই করতে পারছে না ডিক সামার। তবু, জ্যাক হার্ডির সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে তার দিকে কটমট করে তাকাবার সাহস দেখাল। টানেল ধরে বাকি সবার সাথে এগোল সে, মুখোশ পরা মেশিনগানধারীদের অস্তিত্ব মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারছে না। সংখ্যায় ওরা ছয়জন, পঞ্চাশজনের লাইনটাকে দাঁড় করাতে করাতে এগোচ্ছে, সবচেয়ে কাছের লোকটা মাত্র তিন গজ পিছনে। মাথা নিচু করে সিউয়ারে ঢুকল সামার, আমপালার ল্যাম্পের

আলো অনুসরণ করে এই প্রথম পা দিল পিচ্ছিল ধাপে। মাথার পিছনে হাত থাকায় তাল ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল সে। এরপর নাকে ঢুকল নাড়ি উল্টানো দুর্গন্ধ। দু'বার আছাড় খেতে খেতে সামলে নিল সে। জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি মাথা থেকে নামাতে পারি হাত? তা না হলে পড়ে যাব...'

আমপালার কণ্ঠস্বর দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনিত হলো, 'ঠিক আছে, কিন্তু কোন রকম চালাকি নয়, মারা পড়বে।'

শেওলা পড়া দেয়াল দু'হাত দিয়ে ধরল সামার, আস্তে আস্তে এগোল। অসুস্থ বোধ করছে সে, উৎকট দুর্গন্ধে মাথার মগজ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে চাইল। সরু একটা কুয়ার ভেতর নামতে হলো তাকে, মনে হলো মরচে ধরা লোহার ধাপ যে-কোন মুহূর্তে মট করে ভেঙে যাবে। নিচে যখন পৌঁছুল, দু'ফিট গভীর নোংরা পানি আর পিচ্ছিল আবর্জনায় ডুবে গেল পা। তীব্র ঝাঁঝ হামলা চালাল তার ফুসফুসে, খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করল সে। কাশি একটু থামতে সে চুপ করে থাকতে পারল না, 'যীশু, এ কাদের পাল্লায় পড়েছি! শালার কি ঘটছে এখানে?'

বিদ্যুৎবেগে আধপাক ঘুরল আমপালা, সাথে সাথে মাথা নিচু করে নিল সামার, দেখতে পেয়েছে গুলি করতে যাচ্ছে আমপালা। পর পর দুটো গুলি ছুঁড়ল আমপালা, দুটোই সামারের মাথার ওপর দিয়ে গেল। 'আবার যদি মুখ খুলিস, উড়িয়ে দেব মাথা। আর এগোতে হবে না, পৌঁছে গেছি।'

পাঁজরের গায়ে দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে সামারের হৃৎপিণ্ড। চুনের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ।

লাইন ধরে এগোল আমপালা, দু'গজ পর পর লোকগুলো দাঁড়িয়েছে কিনা পরখ করল। মেইন সিউয়ারের আরও কয়েক গজ কাছে সামারকে সরিয়ে আনল সে, কুয়ার কাছে পৌঁছে ওপর থেকে আরও দু'জন রাইফেলধারীকে নিচে ডাকল, অপর একজনকে বলল, সে যেন লোহার ধাপ আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর স্টেশনে ফিরে গেল সে।

আবার টানেলে নামল আমপালা, সাথে তিনজন রাইফেলধারী, তাদের মধ্যে পিয়ানোও আছে। লাইনের প্রথম লোকটার সাথে কথা বলল আমপালা, ছয় ফুট লম্বা সে, ব্যাগগুলোর সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে আছে। 'নাও, শুরু করো। আমি চাই প্রতি দু'সেকেন্ডে একটা করে ব্যাগ রওনা হবে লাইন ধরে। কোন রকম কুঁড়েমি বা ফাঁকিবাজি বরদাস্ত করা হবে না।'

প্রথম ব্যাগটা লাইন ধরে এগোল। প্রথম লোকটার হাত থেকে সেটা নিল সামার, তুলে দিল পরবর্তী লোকের হাতে। কি আছে ব্যাগে? ভাবল সে। এত ভারী, ড্রাগস হতে পারে না। তাহলে?

খানিক পর ব্যাগের ভেতর কি আছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার উৎসাহ পেল না সামার। প্রচণ্ড পরিশ্রমে হাঁপাতে শুরু করল সে। আর গাল দিতে শুরু করল নিজের নসিবকে।

ট্রেন থামার পর পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। ক্যাবের পিছনের দরজায় ঘুসি মারছে কে যেন। নিশ্চয়ই কোন অধৈর্য আরোহী। ভুরু কুঁচকে দরজা খুলল ড্রাইভার,

রোগা-পটকা এক যুবককে দেখতে পেল, তার মুখের সামনে ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলল সে, বলল, 'জানি, স্যার, জানি। অনেকক্ষণ হলো দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করারও নেই। ধৈর্য ধরুন, স্যার, ধৈর্য ধরুন। লাইন মেরামত হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই।'

'কিন্তু আমার মা হাসপাতালে, যে-কোন মুহূর্তে মারা যাবে, আমি তাকে শেষ দেখাটা দেখতে পাব না? কি হয়েছে বলবেন আমাকে?'

যুবকের দিকে সহানুভূতির চোখে তাকিয়ে থাকল ড্রাইভার, তারপর বলল, 'দুঃখিত, স্যার। কি হয়েছে,' কাঁধ ঝাঁকাল সে, ক্যাপ খুলে মাথা চুলকাল, '...জানি না। সব কথা কি আমাদের বলা হয়!'

'স্টেশন থেকে আমরা কি খুব দূরে?'

'দূরে...না। পঞ্চাশ গজের মত। কেন?'

খানিক ইতস্তত করে যুবক বলল, 'ট্রেন থেকে নেমে এইটুকু হেঁটে গেলে পারি না? তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালে...' যুবকের নাম টমাস, ইতোমধ্যে আরোহীদের অনেকেই তার মায়ের অসুস্থতার খবর জেনেছে। তাদের কেউ কেউ টমাসের পিছনে এসে দাঁড়াল। টমাসের প্রস্তাবটা সমর্থন করল তারা।

কিন্তু ড্রাইভার বলল, 'অনুমতি ছাড়া আপনি তা পারেন না। ইমার্জেন্সী দেখা দিলে ট্রেন থেকে নামতে দেয়া হয় বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে... ঠিক আছে, কন্ট্রোলের সাথে কথা বলে পরিস্থিতিটা বুঝি আগে।' নিজের সীটে ফিরে গিয়ে টেলিফোন লাইন আবার জোড়া লাগাল সে। আধ মিনিট পর ফিরে এল দরজার কাছে। 'কেউ ট্রেন থেকে নামতে পারবেন না, নিষেধ করে দিয়েছেন ওঁরা। অপেক্ষা করতে হবে। তবে, বেশিক্ষণ নয়।'

পঁয়ষট্টি মিনিট পর ডিক সামারের ছাল ওঠা হাত থেকে শেষ ব্যাগটা লাইন ধরে এগোল। প্ল্যাটফর্মের কিনারায় জমা হয়েছে ব্যাগগুলো। এরপর লাইন ধরে পঞ্চাশজন লোক বেরিয়ে এল স্টেশনে। সিউয়ার থেকে শেষ লোকটা অদৃশ্য হবার সাত মিনিট পর সেনাবাহিনীর প্রথম ডিঙিটা পড সিউয়ার ধরে এগোল। ইঞ্জিন বন্ধ, সৈনিকরা বৈঠা চালাচ্ছে। টানেল ধরে এগোল তারা, সোনা আর ডাকাতদের খুঁজছে। আমপালার তিনজন স্নাইপার একটা গাঁথুনির আড়াল থেকে দেখল, ডিঙিটা সোজা এগিয়ে গেল টেমসের দিকে। ধীরে ধীরে ভুল পথে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

ফিরোজাকে ফোন করে বুকিং হলে ফিরে এল লোকটা। এখানে রেলিঙের যেদিকে এসকেলেটর রয়েছে, সেদিকে তিনজন রাইফেলধারী উপুড় হয়ে শুয়ে তালা দেয়া প্রবেশ পথগুলো পাহারা দিচ্ছে। গেটের বাইরে, পায়ে হাঁটা সাবওয়ে-তে ছোটখাট একটা ভিড় জমেছে। গ্রিলের কাছ থেকে নিরাপদ দূরে সরে আছে লোকজন, কারণ মাঝে মধ্যেই গ্রিলের দিকে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে সতর্ক করে দিচ্ছে রাইফেলধারীরা। ভিড়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন রিপোর্টারও রয়েছে, সময়মত যারা স্টেশন থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছে তাদের মুখ থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনছে ওরা। প্রেসিডেন্সিয়াল শোভা যাত্রা শুরু হয়েছে ইতোমধ্যে, তার ওপর ব্যাংক ভবন বিধ্বস্ত

হওয়ায় হাইড পার্ক কর্নার স্টেশনে পাঠাবার মত পুলিস আর নেই। কিন্তু স্যার এডওয়ার্ড ডুরেলের মনে আছে ডাকাতরা সিউয়ারের দক্ষিণ দিকে রওনা হয়েছে, কাজেই তিনি ব্রিগেডিয়ার টমকিনের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সৈনিকদের একটা ডিটাচমেন্ট রওনা হয়ে গেছে, স্টেশন থেকে আর বেশি দূরে নেই তারা।

ফোনে কথা বলল ফিরোজা, রিসিভার নামিয়ে রাখল, ফিরল ম্যানেজারের দিকে। 'এবার আপনি পিকাডিলি লাইনে পাওয়ার দিতে বলতে পারেন।'

লাল বোতামে চাপ দিল ম্যানেজার, মাউথ-পীসে মুখ ঠেকিয়ে লটস রোড জেনারেটিং স্টেশনের সাথে কথা বলল। তারপর সুইচ অন করে ম্লান দৃষ্টিতে তাকাল ফিরোজার দিকে। 'এবার কি?'

'দু'একটা প্রশ্ন করব, তারপরই ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যাব আমরা,' বলল ফিরোজা। 'একটাও স্টেশনে না থামিয়ে কোনও ট্রেনকে আপনারা হিথরো-তে পাঠাতে পারেন?'

'আগে কখনও এভাবে পাঠানো হয়নি, তবে সম্ভব। ওটার সামনে যে ট্রেনগুলো থাকবে, সেগুলো আগে সরাতে হবে লাইন থেকে।'

'কিভাবে তা করবেন শুনি?'

'ওগুলোকেও কোথাও না থেমে সামনে এগিয়ে যেতে বলব, তারপর ডাইভার্ট করব অ্যাকটন টাউনে, লাইনে বাইরে, অর্থাৎ অক্সব্রিজ শাখায়।'

ধীরে ধীরে পিস্তল তুলে ম্যানেজারের ঠোঁটে মাজল চেপে ধরল ফিরোজা। 'সেটাই এখন করতে হবে আপনাকে। তার আগে, কি ঘটতে যাচ্ছে, শুনে নিন আমার কাছ থেকে। একটু পরই সবগুলো কমপার্টমেন্ট ভর্তি জিম্মি নিয়ে একটা ট্রেন হাইড পার্ক কর্নার স্টেশন থেকে রওনা হবে।' এগিয়ে গিয়ে কাঁচ ঢাকা কন্ট্রোল প্যানেলের এক জায়গায় টোকা দিল সে। কাঁচের নিচে নীল রেখার মাঝখানে আলোর বিন্দুগুলো এই মুহূর্তে অচল দাঁড়িয়ে আছে, হাইড পার্ক কর্নার স্টেশনের কাছাকাছি। 'এই ট্রেনটা। এটা আবার রওনা হবার পর, আমরা চাই, যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব হিথরো সেন্ট্রালে যেন পৌঁছুতে পারে। আমি কি বলছি, বুঝতে পারছেন?'

ভারী ফ্রেমের চশমার ভেতর তিনবার চোখ পিট পিট করল ম্যানেজার। জিজ্ঞেস করল, 'কি ধরনের টেরোরিস্ট আপনারা?'

'নেভার মাইন্ড,' বলল ফিরোজা। 'এবারে কথাগুলো আরও মনোযোগ দিয়ে শুনুন।' ধীরে ধীরে, প্রতিটি শব্দ আলাদা ভাবে উচ্চারণ করল সে, 'ট্রেনটাকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে যদি কোন বাধা সৃষ্টি করা হয়, নিরীহ মানুষ মারা যাবে। কোথাও যদি ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি থামে ট্রেন, একজন জিম্মিকে খুন করা হবে। এরপরও প্রতি ত্রিশ সেকেন্ডের জন্যে একজন করে জিম্মিকে মারব আমরা।'

ঘন ঘন ঢোক গিলল ম্যানেজার, মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে…বুঝেছি…আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব…।'

'সাধ্যের বেশি চেষ্টা করবেন,' সংশোধন করে দিল ফিরোজা। 'তা না হলে

নিরীহ মানুষ খুন হওয়ার জন্যে দায়ী করা হবে আপনাকে।' ঘরের বাকি সবার দিকে একবার করে তাকাল সে। 'আমরা চলে যাচ্ছি। আপনারা সবাই আমার সাথে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কেউ পিছু নেবেন না, নিলেই গুলি খেয়ে মরবেন।'

কন্ট্রোল রূমের দিকে পিস্তল ধরে রেখে পিছিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। বাইরে এসে সিঁড়ির দিকে ছুটল। লিফটে চড়ে ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি নেবে না। এক তলায় নামার আগে সিঁড়িতে দু'জন লোককে দেখল ওরা, ওপরে উঠছে, দু'জনকেই লাথি দিয়ে ধাপের ওপর ফেলে দিল ফিরোজার পুরুষ সঙ্গী। রাস্তায় বেরিয়ে পিস্তল লুকিয়ে ফেলল ওরা। বিশ গজ ছুটে ব্রডওয়েতে চলে এল, উঠে বসল অপেক্ষারত গাড়িতে। স্টার্ট দেয়াই ছিল, গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

কাফকার ফ্যান্টাসীতে যা দেখা যায়, হাইড পার্ক কর্নার স্টেশনের এখনকার দৃশ্যের সাথে তার মিল আছে। সোনাভরা ব্যাগ স্তূপ হয়ে আছে, প্ল্যাটফর্মের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য জুড়ে, দুই সারিতে। সারি দুটোর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে বত্রিশ জন লোক, সবাই মুখোশ পরা। কেউ নাইলনের মোজা পরিয়েছে মাথায় আর মুখে, কেউ চোখ আর নাকের জায়গায় ফুটো সহ উলেন হুড। ওদের প্রায় সবাই সশস্ত্র, ছয়জনের হাতে মেশিনগান, কোমরের কাছে ধরে আছে। ঝিকঝিক, ঝিকঝিক, কুউউ! দৃশ্যটার মধ্যে এসে ভিড়ল ট্রেন। রাইফেল, মেশিনগান আর পিস্তল, সবাই ট্রেনের দিকে তাক করে ধরল।

সশস্ত্র ডাকাতদের পিছনে বসে আছে প্ল্যাটফর্ম থেকে আটক করা নিরীহ লোকজন, সব মিলিয়ে একশো জনের বেশি, এদের মধ্যে খানিক আগে যারা সিউয়ার থেকে সোনা তুলে এনেছে তারাও রয়েছে।

দূর থেকেই সব দেখতে পেল ড্রাইভার, বিপদ বুঝতে পেরে ট্রেনের গতি বাড়িয়ে দিল সে। কিন্তু দশ সেকেন্ড পর আরও একটা দৃশ্য দেখে তার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। ব্রেক কষল সে, ধীরে ধীরে কমে এল ট্রেনের গতি। লাইনের ওপর ঝড়ো কাকের মত পাঁচজন বয়স্ক মেয়েলোককে হাত-পা বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে, লাইনের বাইরে মেশিনগান নিয়ে পাহারায় রয়েছে আমপালার দু'জন লোক। মেয়েলোকগুলোর কাছ থেকে মাত্র দু'হাত দূরে একটা মৃদু ঝাঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন।

রিয়ার ক্যারিজে একজন গার্ড রয়েছে, একটা বোতাম চাপ দিয়ে ট্রেনের সবগুলো দরজা খোলার ব্যবস্থা করে দিল সে। তারপর কমপার্টমেন্ট থেকে মাথা বের করে বাইরে তাকাল, এখনও জানে না কিসের মধ্যে এসে পড়েছে তারা। তার গলায় একটা মেশিনগানের ব্যারেল ঠেকল। ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল সে, সেই সাথে ক্যারিজে উঠে পড়ল একজন গানম্যান। তার উলেন হুডের ফাঁক দিয়ে বাঁকা ঠোঁট দেখা গেল। 'কোন কথা নয়। আমার যতক্ষণ ইচ্ছে দরজা খোলা থাকবে।'

দরজা খুলে যেতেই কমপার্টমেন্ট থেকে নামার জন্যে দ্রুত এগোল টমাস। ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালে যাবে সে, তবে যদি মাকে দেখতে পায়। কিন্তু লাফ দিয়ে তার সামনে উঠে এল জ্যাক হার্ডি, প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল টমাস, তার

মুখে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড একটা বাড়ি মারল জ্যাক, ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। ভীত-সন্ত্রস্ত আরও ষাটজন নারী-পুরুষের সাথে প্ল্যাটফর্মে নামানো হলো টমাসকে, সবাইকে ট্রেনে সোনা তোলার কাজে লাগিয়ে দেয়া হলো। প্ল্যাটফর্মের ওপর অস্থিরভাবে পায়চারি করছে আমপালা, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে বন্দীদের। তার একটা কান রয়েছে মাথার ওপর দিকে, বুকিং হলে। প্রতি মুহূর্তে গুলির শব্দ ভেসে আসছে। কাজ খুব ঢিমে তালে এগোচ্ছে লক্ষ করে আরোহীদের বাকি সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে এল সে, তাদেরকে দিয়ে একাধিক চেইন তৈরি করাল। চেইন ধরে এবার দ্রুত এগোল ব্যাগগুলো। ডিক সামার, তার ফুলে ওটা হাতের তালু দিয়ে একটা করে কর্কশ ক্যানভাসের ব্যাগ ধরছে আর দাঁতে দাঁত চেপে গালমন্দ করছে নিজের মন্দ ভাগ্যকে।

ক্যারিজগুলো ভরতে শুরু করেছে, আর ওদিকে বুকিং হলে হামলা চালিয়ে বসল সেনাবাহিনী। মেশিনগানের একনাগাড় ব্রাশফায়ার চালিয়ে ভেতরের বন্দুকবাজদের পিছু হটতে বাধ্য করল তারা। বন্দুকবাজরা এসকেলেটরের মাথার কাছে এসে জড়ো হলো, এখান থেকে গুলি ছুঁড়ে তেমন সুবিধে করতে পারল না তারা। একজন সৈনিক, পাঁচিলের আড়াল থেকে শুধু মাত্র হাত দুটো বের করল। গ্রিলের একটা তলায় এক্সপ্লোসিভ ফিট করল সে।

ট্রেন লোড করতে বিশ মিনিট লাগল। বারোজন পুরুষ আর নয় জন মেয়েলোককে বেছে নিল আমপালা, তাদের তোলা হলো ট্রেনে। এরপর সে এসকেলেটর ধরে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল।-হাঁক ছাড়ল, কিন্তু বিস্ফোরণের বিকট শব্দে চাপা পড়ে গেল গলা।

একজন সঙ্গী এসকেলেটরের মাথায় এসে দাঁড়াল, আমপালাকে দেখে আর্তনাদ করে উঠল সে, 'এসে পড়েছে! ব্লাডি আর্মি এসে পড়েছে।'

বেরেট পরা মাথা চোখের কোণে ধরা পড়ল। এসকেলেটরের মাথার ওপর নড়াচড়া করছে সেগুলো। তর তর করে নামতে শুরু করল আমপালার সঙ্গী। একজন সৈনিক তার পিঠ লক্ষ্য করে রাইফেল তুলল। 'ডাইভ দাও!' চেঁচিয়ে সাবধান করল আমপালা। গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেল। হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে এসকেলেটরের ওপর পড়ে গেল লোকটা। চাচা আপন জান বাঁচা, সঙ্গীর মাথা এসকেলেটর স্পর্শ করার আগেই আড়াল নিল আমপালা, প্ল্যাটফর্ম ধরে ছুটতে ছুটতে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ড্রাইভারের ক্যাবে। 'গাড়ি ছাড়ো! জলদি, জলদি!'

ঝি-ক, ঝি-ক, ঝি-ক, ঝি-ক। মন্থরবেগে এগোল ট্রেন। টানেলে ঢুকছে।

স্টেশনে ঢুকে ছড়িয়ে পড়ছে সৈনিকরা।

# বারো

ট্রেনের স্পীড চূড়ান্ত গতি সীমার চেয়ে একটু কম। একশো টন সোনা আর এতগুলো আরোহী, সব মিলিয়ে নিজের যা ওজন, প্রায় সেই পরিমাণ তার বহন

করছে। ওদিকে, এল.টি.ই. হেডকোয়ার্টার কন্ট্রোল রুমে, অপারেটর দেখছে নীল রেখার মাঝখান দিয়ে মিট মিট করে এগোচ্ছে সাদা আলোকবিন্দু। কন্ট্রোলাররা, নির্দেশ অনুসারে, এই আলোকবিন্দুর সামনের সব আলোগুলোকে বিরতিহীন চালু রেখেছে। কি ঘটছে, স্যার এডওয়ার্ড ডুরেলের মুখে শুনতে শুনতে ভুরু কুঁচকে উঠল ব্রিগেডিয়ার টমকিনের, হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিল সে।

একের পর এক স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন, কোথাও কোন স্টেশনে থামছে না। প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত লোকজন বোকার মত তাকিয়ে থাকল শুধু, তাদের কেউ কেউ দেড়ঘন্টা ধরে ট্রেনের আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

নাইটসব্রিজ, সাউথ কেন্সিংটন স্টেশনে যখন ঢুকল ট্রেন, সেটার মাথার ওপর অনস্লো স্কয়ারে উৎসব মুখর জনতা আনন্দে ফেটে পড়ল। রাইফেলধারী পুলিস বাড়ির ছাদ আর অফিস বিল্ডিঙের জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। স্টেশনের প্রবেশ মুখের পাশ ঘেঁষে ধীর গতিতে এগিয়ে গেল রাজকীয় মেহমানের গাড়ি। প্রেসিডেন্টের সাথে প্রিন্স ফিলিপও রয়েছেন। প্রেসিডেন্টকে একটু ক্লান্ত দেখালেও মৌন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে তাঁর চেহারা। হাসছেন প্রিন্স ফিলিপও, কিন্তু তাঁর হাসিতে বিরতির ফাটল পরিষ্কার ধরা পড়ল।

গ্লস্টার রোড, আর্লস কোর্ট। বোঝার চাপে গোঙাতে গোঙাতে এগোচ্ছে ট্রেন। কুউউ দিচ্ছে।

'খুব সহজ সমাধান আছে, পাওয়ার অফ করে দিয়ে লাইনের ওপর ট্রেন দাঁড় করানো।' ফোনের রিসিভার শক্ত করে ধরে ব্রিগেডিয়ার টমকিন বলল।

কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে দ্বিমত প্রকাশ করলেন স্যার ডুরেল। 'সেটা উচিত হবে না। ওরা বেপরোয়া টাইপের লোক। যা বলেছে করে ছাড়বে।'

'আপনাকে অসম্মান করছি না, স্যার, কিন্তু আপনি আমাদেরকে ডেকে এনে দায়িত্ব দিয়েছেন, তাই না? সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার আমিই নেব এখন।' ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর লোক, ধরাকে সরা জ্ঞান করা অভ্যেস, ঘন গোঁফের ভেতর দিয়ে গরম নিঃশ্বাস ছাড়ল রিসিভারে।

'যুক্তি বুঝুন, ব্রিগেডিয়ার। ব্যাংকে কত লোক মারা গেছে, গড নোজ। আপনার লোকেরা স্টেশনে একটা লাশ পেয়েছে, জানেন আপনি। চান, আরও মানুষ মারা যাক?'

গোঁয়ারের মত নিজের কথাই বলে গেল ব্রিগেডিয়ার, 'এসব কোন যুক্তি না। লোক মারা গেছে বলে একদল ডাকাতকে তাদের ইচ্ছে মত যা খুশি তাই করতে দিতে হবে নাকি? সমাধান আমার আঙুলের ডগায় রয়েছে, এই মুহূর্তে লাইনের ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারি ট্রেন। সারেন্ডার না করে ওদের কোন উপায় থাকবে না, দেখবেন।'

স্যার ডুরেল ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছেন। 'আমি বলছি, জিম্মিদের গুলি করবে ওরা। তখন আপনি কি করবেন?'

'এক-আধটু ঝুঁকি যে নেই, তা নয়, কিন্তু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। যাই বলুন, এটা আমার কেস। এখানে আমিই চার্জে রয়েছি। সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।'

দাঁতে দাঁত চাপলেন আন্ডার-সেক্রেটারি, রিসিভার নামিয়ে রেখে বিড়-বিড় করে বললেন, 'ব্যাটা আহাম্মক!'

আল কোর্ট আর ব্যারনস কোর্টের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন, নিভে গেল সমস্ত আলো। অন্ধকারে হুঙ্কার ছাড়ল আমপালা, 'ব্যাপার কি?'

'কি জানি। পাওয়ার ফেল, আমার কোন দোষ না।' ইমার্জেন্সী ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের সকেটে প্লাগ ঢোকাল ড্রাইভার।

হিস্ হিস্ করে উঠল আমপালার গলা, 'শা-আ-লা-রা!' হাতঘড়ি দেখল সে। 'কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগ করতে পারো?' মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার। 'করো যোগাযোগ। কি হয়েছে তাড়াতাড়ি জানো।'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল ড্রাইভার, অভ্যস্ত হাতে টেলিফোনের তার জোড়া লাগাল। কন্ট্রোলের সাথে কয়েক সেকেন্ড কথা বলে রিসিভারটা আমপালার হাতে ধরিয়ে দিল সে। ব্রিগেডিয়ার নিজের পরিচয় দিল প্রথমে, তারপর তার ভাষণ শুরু করল।

শুনতে শুনতে রাগে কাঁপতে শুরু করল আমপালা। তারপর বলল, 'তোমাদের মাথায় গোবর আছে জানতাম, কিন্তু তোমার মাথায় দেখছি তাও নেই। স্টুপিড ফুল, এখন আমরা কি করব, জানো? ঠিক যা বলেছিলাম।'

'আরোহীদের কারও গায়ে যদি আঁচড়টিও লাগে,' হুমকির সুরে বলল ব্রিগেডিয়ার, 'তোমাদের সব ক'টাকে...'

'ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে, তাই তো? কিন্তু ইতিমধ্যে যা করেছি তাতে তো এক একজনকে একশো বার করে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হয়,' বলল আমপালা। 'ব্যাটা মূর্খ, ইলেকট্রিক চেয়ারকে ভয় করলে এ-পথে কেউ আসে? আমাদের সাথে একশো জন জিম্মি রয়েছে, ভুলে গেছিস? ত্রিশ সেকেন্ড সময় দিলাম। পাওয়ার না এলে একজন জিম্মি মারা যাবে। কথা দিলাম।' খানিকক্ষণ অপর প্রান্তের বকবকানি শুনল সে। 'ঠিক আছে। তুই ব্যাটাই দায়ী থাকবি। ধরে থাক।' ড্রাইভারের হাতে রিসিভার ধরিয়ে দিয়ে ক্যাব থেকে পাশের কমপার্টমেন্টে চলে এল সে। সামনেই এক যুবককে দেখে তার শার্টের কলার চেপে ধরল, 'এসো,' বলে টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে এল ক্যাবে।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে টমাসের চেহারা। 'আমার মা অসুস্থ...হাসপাতালে যাচ্ছিলাম...' প্রলাপ বকতে শুরু করল সে।

ড্রাইভারের হাত থেকে রিসিভার নিল আমপালা। 'শুনছিস, বুদ্ধিমান? একজন জিম্মিকে ধরে এনেছি।' টমাসের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল সে। 'নাম কি তোমার?'

'ট-ট-টমা-স,' তোতলাতে শুরু করল সে। 'আ-আমা-র ম-মা...'

'বয়স?' আমপালার গর্জন শুনে শিউরে উঠল টমাস।

'সা-সা-সাতাশ।'

'করিস কি?'

'লা-লাইফ ব-বয়ে চা-চাক-রি করি।'

'আর কিছু বলতে চাস?'

রিসিভারের দিকে আরও একটু মুখ বাড়িয়ে টমাস করুণ সুরে আবেদন জানাল, 'আমা-কে মে-মেরে ফেলবে···বাঁ-বাঁচান। আ-আমার ম-মা হা-হাসপাতা-লে···'

রিসিভারটা নিজের মুখের সামনে আনল আমপালা। 'শুনলি তো? মাত্র সাতাশ বছরের তরতাজা নিরীহ যুবক। মা হাসপাতালে, দেখতে যাচ্ছিল। মা নয়, ছেলেই এখন মারা যাবে। আর সেজন্যে দায়ী হবি তুই। অথচ মজার ব্যাপার হলো তোর ট্রেনিঙের পিছনে যা টাকা খরচ হয়েছে তার কিছুটা অংশ ওর পকেট থেকেও বেরিয়েছে। ত্রিশ পর্যন্ত গুনব, মনে আছে? এক, দুই···'

ধীরে ধীরে গুনে চলছে আমপালা। শুনতে পাচ্ছে কার সাথে যেন কথা বলছে ব্রিগেডিয়ার, 'না। ওর হুমকিতে আমরা কান দেব না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আমপালা। 'সন অফ আ বিচ! বাস্টার্ড!'

রিসিভারটা ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাঁধ থেকে রাইফেল নামাল আমপালা। টমাসের হার্টের ঠিক ওপরে মাজল চেপে ধরল সে। 'টমাস। লাইফ বয়ের একজন কর্মচারী। এক নম্বর।'

টমাসের তীব্র আর্তচিৎকার শুনতে পেল ব্রিগেডিয়ার। তারপরই গুলির আওয়াজ হলো। রিসিভারে ফিরে এল আমপালার গলা, 'তবু তো এটা তাড়াতাড়ি ঘটল। এরপর একজন মেয়ে জিম্মিকে আনছি। আর গুলি নয়, এবার ছুরি ব্যবহার করব আমরা।'

ব্রিগেডিয়ারের চেহারা পাংশু হয়ে গেল। 'গুড গড, ম্যান! নো!'

'ইয়েস।' ক্যাবের খোলা দরজা দিয়ে কমপার্টমেন্টের দিকে তাকাল সে। প্রৌঢ়া এক মহিলাকে বেছে নিল। সঙ্গী একজনকে বলল, 'সাদা গাউন পরা মেয়েলোকটাকে নিয়ে এসো।'

টমাসের লাশ দেখে মহিলারা সবাই ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। প্রৌঢ়া মহিলা ছুটে পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু আমপালার সঙ্গী তাকে ধরে ফেলল, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল তাকে ক্যাবে। রিসিভারে কথা বলছে আমপালা, 'শুনতে পাচ্ছিস, হারামজাদা? পঞ্চাশের ওপর বয়স, মোটাসোটা এক মেয়েলোক।' প্রৌঢ়ার দিকে ফিরল সে। 'ছেলেমেয়ে ক'টা?'

'তি-তিনটে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল প্রৌঢ়া।

'শুনলি? তিন ছেলেমেয়ের মা,' রিসিভারে বলল আমপালা। তার চেহারায় কোন ভাব নেই, চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। রিসিভারের ওপর ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'আমি ওর পেট কেটে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করতে যাচ্ছি। দশ সেকেন্ড সময় পাচ্ছিস তুই···'

তিন সেকেন্ড পর পাওয়ার ফিরে এল।

হিথরো এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চলেছে মার্সিডিজ। গাড়ির রেডিওতে সর্বশেষ নিউজ বুলেটিন শুনে কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা। বড় জোর হুমকি দিতে পারে, কিন্তু নিরীহ মানুষজনের গায়ে হাত তোলা চলবে না, আমপালাকে বারবার এই নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও ট্রেনের ওপর একজন লোককে মেরে ফেলেছে সে। পাখা গজিয়েছে তোমার, মনে মনে বলল ও।

বাকি সব খবর ভাল, এইটুকুই যা স্বস্তি। অল্প-বয়েসী এক যুবতী আর তার এক পুরুষ সঙ্গী লন্ডন ট্র্যান্সপোর্ট কন্ট্রোল অস্ত্রের মুখে দখল করে নিয়েছে শোনার পর, ফিরোজা সম্পর্কে দুশ্চিন্তা-মুক্ত হয়েছে ও। এখন ও জানে, এই মুহূর্তে রাস্তায় ওর পিছনে কোথাও আছে ফিরোজা। সে-ও হিথরোর দিকে ছুটছে গাড়ি নিয়ে। ওখানেই দু'জনের দেখা হবে।

দু'নম্বর টার্মিনালের কার-পার্কে গাড়ি থামাল রানা। টার্মিনাল ভবনের দিকে হাঁটার সময় ধীরে ধীরে বুক ভরে শ্বাস নিল, উত্তেজনা কমাবার জন্যে। বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকে একটা দেয়ালঘড়ির সাথে নিজের হাতঘড়ির সময় মিলিয়ে নিল। পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। কাছেই সার সার ফোন বুদ, সেদিকে এগোল ও। সারির মাঝখানের বুদটা বেছে নিল, যার দু'পাশের দুটো বুদই খালি। ডায়াল করল ও।

এই নিয়ে আজ তিনবার এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি অফিসারদের সাথে কথা বলছে রানা। তাদের সাথে ইতোমধ্যেই এল-টি.ই. অপারেটররা যোগাযোগ করেছে, রেইড সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তের বিবরণ জানানো হচ্ছে তাদেরকে। দুই পক্ষই ব্যাপারটাকে পয়লা নম্বরের ইমার্জেন্সী হিসেবে দেখেছে। সিকিউরিটি হেড-কে চাইল রানা। লোকটার গলা শুনে তাকে চিনতে পারল ও, নিচু সুরে বলল, 'আবার সেই আমি। ট্রেন পৌছুল বলে।'

সিকিউরিটি হেড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, চেহারা নিশ্চয়ই মেঘের মত ভারী হয়ে আছে। 'আমরা জানি।' এক সেকেন্ড বিরতি নিল সে। 'তুমি বোঝো, এই এয়ারপোর্টে ট্রাফিক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে কয়েক হাজার লোকের জীবন বিপন্ন হতে পারে?'

রানার চোখ রয়েছে পাশের বুদের দিকে। একটা মেয়ে এই মাত্র ঢুকল সেখানে, ডায়াল করছে। 'সেটা তোমার সমস্যা। প্লেন রেডি?'

সেভেন-ফরটি-সেভেন তৈরি রাখা হয়েছে। খানিক আগে শেষ হয়েছে ফুয়েল ভরার কাজ। ক্যাপাসিটির চেয়ে চল্লিশ টন কম ভরা হয়েছে ফুয়েল। একশো টন কার্গো আর প্যাসেঞ্জার নিয়ে নিরাপদেই টেক-অফ করতে পারবে ওটা। আট ঘণ্টা পর আবার রিফুয়েল দরকার হবে, তার আগে নয়। 'প্রায়, হ্যাঁ, তৈরিই বলা যায়। আর বোধহয় লাভ নেই…?'

'তর্ক করে? না, নেই।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল রানা, এবার রুক্ষস্বরে, 'মনে আছে তো, স্টেশন এগজিটের মুখে ছয়টা এয়ারপোর্ট বাস চেয়েছি আমি?' বুদ ছেড়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটা, রানার দিকে একবারও তাকাল না।

'মনে আছে।'

'আর, আমি যা যা বলেছি তার যদি একটু এদিক-ওদিক হয়, কি ঘটবে?'

'জিম্মিরা গুলি খাবে।'

'ওদেরকে গুলি করা হবে হত্যা করার জন্যে,' বলল রানা। 'ক্লিয়ার?'

টমাসের দুর্ভাগ্যের কথা শুনেছে সিকিউরিটি হেড। আপন মনে কাঁধ ঝাঁকাল সে। চাকরি জীবনের শুরু থেকে এই মুহূর্তটিকেই সবচেয়ে ভয় করে এসেছে, এটাকে এড়াবার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করেছে, অথচ ঠিক সেটাই ঘটছে তার জীবনে। নিজেকে তার ভয়ানক অসহায় লাগল। 'তোমার প্রতিটি নির্দেশ আমরা

পালন করছি।'

'গুড। কিন্তু শুধু নির্দেশ পালন করলে হবে না, আমি যেটা যেভাবে বলেছি সেটা ঠিক সেভাবে করতে হবে। কোন বিকল্প ব্যবস্থা আমি মেনে নেব না।' আরও এক মিনিট কথা বলল রানা, তারপর রেখে দিল রিসিভার।

সিকিউরিটি হেড তার সহকারী অফিসারদের দিকে ফিরল। 'অল রাইট। সব তোমরা শুনেছ। সব ট্রাফিক ফিরিয়ে দিতে হবে। আমি যখন বলব, এখন থেকে সম্ভবত আধ-ঘণ্টা পর, আর কোন প্লেন টেক-অফ করতে পারবে না। এই মুহূর্তে ল্যান্ড করার জন্যে চক্কর দিচ্ছে না এমন সব প্লেনকে গ্যাটউইক বা লুটন এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দেবে।'

তিন ঘণ্টা হলো নীভেসডন এয়ারপোর্টে রয়েছে সা'দুল্লা, লীয়ার জেটের পাইলট আর রড গুডউইলের সাথে তাস খেলছে। মোশে ফেরেলকে রাখা হয়েছে প্লেনের পিছন দিকে, একটা ঢাকনি খোলা কাঠের বাক্সে। হেভী ডোজের ওষুধ ইনজেক্ট করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে তাকে। ফোন এল, এক মিনিট রানার সাথে কথা বলল সা'দুল্লা। টেবিলে ফিরে এসে তাস গুছাতে শুরু করল সে। 'চলো।' বিল্ডিঙ ছেড়ে জেটের দিকে এগোল তিনজন।

টার্মিনাল বিল্ডিঙ থেকে বেরিয়ে এল রানা। সৈনিকদের বিশাল একটা সমাবেশ দেখে ছোট ছোট হয়ে গেল চোখ। দেখেই চিনতে পারল, কুইক রিয়্যাকশন আর্মি ইউনিট, এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির জন্যে বিশেষ ভাবে ট্রেনিং পাওয়া। বুঝল, ওদের হেডকোয়ার্টার উইন্ডসোর থেকে তলব করে আনা হয়েছে। কোন রকম ইতস্তত না করে সমাবেশটার দিকে দৃঢ় পায়ে এগোল ও। চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে সৈনিকরা।

একজন সৈনিক এগিয়ে এল ওর দিকে। দু'দিকে হাত লম্বা করে দিয়ে রোধ করল ওর পথ। চেহারায় বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল রানা। 'কি ব্যাপার? আমি স্টেশনে ঢুকব।'

করপোরাল বিনয়ের সাথে বলল, 'দুঃখিত, স্যার। স্টেশন আপাতত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কেউ যেতে পারবে না।'

'বন্ধ করে দেয়া হয়েছে? কেন?'

'সার্চ মি। আই ডোন্ট নো। হুকুম, স্যার। আমি আপনাকে যেতে দিতে পারছি না।'

ভুরু জোড়া কুঁচকেই থাকল রানার, কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'ভেরি ওয়েল।'

ফিরে আসছে রানা। বিল্ডিঙ হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামল একটা টানেলে, ওখান থেকে একটা সচল বেল্ট আরোহীদেরকে নিয়ে নেমে যাচ্ছে হিথরো সেন্ট্রাল আন্ডারগ্রাউন্ডে। কিন্তু এখানে পৌঁছেও হতাশ হলো রানা। এদিকেও স্পেশাল আর্মি ইউনিট স্টেশনে ঢোকার মুখে টহল দিচ্ছে।

একটু পরই পৌঁছুবে ফিরোজা। কিন্তু আমপালার কাছে যাওয়ার জন্যে স্টেশনে ঢুকতে পারবে না ওরা। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল রানা।

*

এরপর আর ট্রেন থামাবার কোন চেষ্টা হলো না। ব্যারনস কোর্টে পৌছে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে মাটিতে উঠে এল ট্রেন, এখন অনেক দূর পর্যন্ত মাটির ওপর দিয়ে যাবে। ট্রেনের সামনে থেকে সচল যা কিছু ছিল, সেগুলোকে বিরতিহীন অক্সব্রিজ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে আরেক দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে কন্ট্রোল রুম। সরাসরি অ্যাকটন টাউন পৌছুল ট্রেন, ওখান থেকে ধরল হিথরো ব্রাঞ্চ।

বন্দুকধারীরা মৌনব্রত পালন করছে, আরোহীদের সাথে তো নয়ই, নিজেদের মধ্যেও কথা বলল না। মুখোশ ঢাকা ভীতিকর চেহারা নিয়ে দু'চার পা এদিক ওদিক হেঁটে বেড়াল, পা রাখল পাঁচশো হাজার ডলার দামের ব্যাগে, ট্রেনের সাথে দুলতে থাকল মৃদু-মন্দ। নর্থ ফিল্ডস পেরিয়ে এল ট্রেন, ঘণ্টায় বরাবর ত্রিশ মাইল গতি। বোস্টন ম্যানর আর অস্টারলির মাঝখানে গলফ কোর্স, সেটাকে দু'ভাগ করে দিয়ে ছুটল।

হাউন্সলো ইস্টের কাছাকাছি এসে, ক্যারিজগুলোর ভেতর দিয়ে এগোল আমপালা। নিজেদের লোককে স্পেশাল গগলস আর এয়ার প্লাগ বিলি করছে। শুধু এই একটা ব্যাপারেই ভয়ে ভয়ে আছে সে। রানাই তার মনে এই ভয়টা ঢুকিয়েছে। স্টান গ্রেনেড অ্যাটাক হলে, রানার ধারণা, হার মানতে হবে ওদের। ব্রিটিশ সিকিউরিটির লোকেরা পৃথিবীর সেরা, রানা আশা করছে এ-ধরনেরই কিছু ব্যবহার করবে ওরা। স্টান গ্রেনেড কার্ডবোর্ডের তৈরি, প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়, সেই সাথে আলো ছড়ায় চোখ-ধাঁধানো, জিম্মিদের কোন ক্ষতি না করে অপ্রস্তুত একজন শত্রুকে ছয় কি সাত সেকেন্ডের জন্যে একেবারে অচল করে দিতে পারে। শত্রুকে ছয়-সাত সেকেন্ডের জন্যে অসহায় অবস্থায় পেলে আর চাই কি। এই হাতবোমা কিভাবে তৈরি করে ব্রিটিশরা, কিভাবে কাজ করে, এর বৈশিষ্ট্য কি ইত্যাদি জার্মানীর জনপ্রিয় পত্রিকা স্টার্নে একবার ছেপে দিয়েছিল। ব্রিটিশরা মহা খাপ্পা হলেও, কিছু করার ছিল না তাদের। লেখাটা ছাপা হবার পর টেরোরিস্ট ট্রেনিং অর্গানাইজেশন-গুলো স্টান গ্রেনেডের হাত থেকে বাঁচার একটা উপায় আবিষ্কার করার চেষ্টা করে, তারই ফলশ্রুতি এই গগলস আর এয়ার-প্লাগ।

হাউন্সলো ওয়েস্টে আবার মাটির নিচে ঢুকল ট্রেন। কিনারায় সাদা রাবার মোড়া নিজের গগলসটা পরে নিল রোনাল্ড।

পাঁচটা বেজে ষোলো মিনিটে হিথরো সেন্ট্রালে পৌছুল ওরা। প্ল্যাটফর্মে গিজ গিজ করছে সৈনিক আর এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি পুলিসে। এটাই আশা করছিল আমপালা, তাই টমাসের লাশটা ফেলে দেয়নি এখনও। ট্রেন থামতেই লাশটা দু'হাতে ধরে দাঁড় করাল সে, নিজের দিকে মুখ করিয়ে। দরজা খুলে গেল, অমনি লাশটা ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের নিচে, প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিল সে। ড্রাইভারের ক্যাব থেকে লাশটাকে দড়াম করে পড়তে দেখে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লোকজন স্তব্ধ হয়ে গেল। টমাসের বুকে বিরাট একটা গর্ত, এখনও টকটকে লাল। গোটা ট্রেন আর প্ল্যাটফর্মে অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ট্রেন থেকে হাইজ্যাকার আর জিম্মিরা নামার সময়ও সে নিস্তব্ধতা ভাঙল না। পুলিস আর সৈনিকরা কেউ এক চুল নড়ল না, শুধু তাকিয়ে থাকল। কেউ জানে না

কি করতে হবে, সবাই আর কারও নড়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

ঘাড় ধরে ড্রাইভারকে প্ল্যাটফর্মে নামাল আমপালা, শিরদাঁড়ার ওপর মেশিন-গানের মাজল চেপে ধরেছে। নিচে নেমেই টমাসের লাশে একটা লাথি মারল সে। দু'বার গড়িয়ে থামল লাশটা। চেঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করল সে।

'তোমরা কেউ কানা নও, নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ?' এগিয়ে গিয়ে আবার লাথি দিল লাশে। 'আরও বিশজন জিম্মি রয়েছে আমার হাতে। তাদের মধ্যে নয়জন মেয়েলোক, তোমাদেরই মা অথবা বোন কিংবা স্ত্রী।' হঠাৎ ড্রাইভারের পাছায় কষে একটা লাথি দিল সে, ছিটকে পড়ে গেল লোকটা, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার শিরদাঁড়ার ওপর মেশিন-গানের মাজল চেপে ধরল সে। 'একে দিয়েই শুরু করব। যদি না তোমরা এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও প্ল্যাটফর্ম থেকে।'

কে কার আগে বেরিয়ে যাবে, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। দেখতে না দেখতে খালি হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম। আমপালার কোন আড়াল নেই, যে-কোন মুহূর্তে গুলি করে মেরে ফেলা যেতে পারে তাকে, কিন্তু জিম্মিদের কথা ভেবে সে ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কেউ। বুটের ডগা দিয়ে ড্রাইভারের পাঁজরে খোঁচা দিল সে। 'ওঠো।'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল লোকটা। আমপালা তাকে নির্দেশ দিল, ট্রেন খানিকটা পিছিয়ে আনতে হবে, যাতে লিড ক্যারিজের প্রথম সেট দরজা প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি এসকেলেটরের পায়ের কাছে থাকে।

ট্রেনের অর্ধেক, তিনটে ক্যারিজ, অন্ধকার টানেলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার স্ট্রীট লেভেলে সোনা তোলার ব্যবস্থা করল আমপালা, ওখানে আগে থেকেই ছয়টা এয়ারপোর্ট বাস অপেক্ষা করছে।

পুরুষ জিম্মিদের মাত্র দু'জনকে ব্যবহার করল আমপালা। বাকি সবাই রোনাল্ডের লোক, যারা ভল্ট থেকে সিউয়ার হয়ে সোনা পাচার করেছিল। ওদের ওপর দিয়ে বেশি ধকল গেলেও তার কিছু এসে যায় না। ওরা আরও ক্লান্ত হোক, সেটাই সে চায়। ট্রেন আর এসকেলেটরের মাঝখানে মাত্র দু'জন লোককে দরকার হলো তার। ওদেরকে ওখানে দাঁড় করিয়ে বলল, অনুমতি না পেলে কাজ শুরু কোরো না। এরপর বেছে বেছে নিজের ছয়জন লোক আর মহিলা জিম্মিদের মধ্যে থেকে অল্প-বয়েসী দেখে দু'জনকে নিয়ে এসকেলেটর ধরে মাঝখানের লেভেলের দিকে উঠতে শুরু করল। বুকিং হলটা এই লেভেলেই।

এখানেও পুলিস আর সৈনিকদের ভিড়। এবারও তাদেরকে বাধ্য করা হলো পিছু হটতে। সচল ওয়াক-ওয়ে যেখানে শুরু, তার পাশে দেয়ালের দিকে সরে গেল তারা। সবশেষে স্ট্রীট লেভেলে উঠে এসে বাসগুলো পরীক্ষা করল আমপালা। এখানেও পুলিস আর সৈনিক রয়েছে, তাদেরকে হটিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে রাস্তার ওপারে পাঠিয়ে দিল সে। সন্তুষ্ট হয়ে আবার নিচে নেমে এল, প্রতি লেভেলে একজন করে জিম্মির সাথে রেখে এল দু'জন করে বন্দুকবাজকে।

লোয়ার এসকেলেটরের মাথায় আর আপার এসকেলেটরের গোড়ার মাঝখানে দশজন লোককে দাঁড় করানো হলো। তারপর বারো জন দাঁড়াল আপার এসকেলেটরের শেষ মাথা আর এয়ারপোর্ট বাসগুলোর মাঝখানে। অতিরিক্ত সাবধানতার জন্যে আরও দু'জন মহিলা জিম্মিসহ চারজন রাইফেলধারীকে ডেকে

নিল আমপালা, দু'জন পুরুষ জিম্মিকে দাঁড় করানো হলো স্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে, রাস্তার ওপর থেকে সৈনিক আর পুলিসরা তাদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

আমপালা আদেশ দিতেই সোনার ব্যাগ হাতে হাতে রওনা হতে শুরু করল। প্রথম এসকেলেটর দিয়ে উঠে বুকিং হল হয়ে দ্বিতীয় এসকেলেটরের মাথায়, সেখান থেকে রাস্তায়, তারপর বাসের ভেতর। প্রথম ক্যারিজ অর্ধেক খালি হতেই ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয়া হলো ট্রেন আরও খানিক পিছিয়ে নিয়ে যেতে। দ্বিতীয় সেট দরজা এসকেলেটরের মুখোমুখি হলো এবার। সাড়ে ছয় মিনিটের মধ্যে প্রথম ক্যারিজ খালি হয়ে গেল। একটু পরই প্রথম বাসটা দশজন পুরুষ জিম্মি আর পাঁচজন রাইফেলধারীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল প্লেনে সোনা খালাস করার জন্যে।

দু'নম্বর টার্মিনালে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ইনফরমেশন ডেস্কে দেখা হলো ওদের। রানার কাঁধ খামচে ধরল ফিরোজা, উত্তেজনায় কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তার কব্জি চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল রানা, 'শান্ত হও। এখানে নার্ভাস দেখালে বিপদ হবে। দেখছ না, এয়ারপোর্ট পুলিসে গিজ গিজ করছে?'

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল ফিরোজা। রানাকে দেখেই কেন যেন তার চোখে পানি এসে গেছে। বার বার ঢোক গিলল সে। তারপর বোকার মত বলল, 'দায়িত্বটা এড়িয়ে যেতে পারো না, খালেদ? যার খুশি নিয়ে যাক সোনা, চলো আমরা পালাই।'

কড়া গলায় ধমক দিল রানা, 'আর একটাও বাজে কথা বলবে না।' ফিরোজার হাত থেকে ক্রীম কালারের ভারী ফ্লাইট ব্যাগটা নিল ও, ক্যাফেটেরিয়ায় ঢুকে নির্জন এক কোণের টেবিলে বসাল তাকে। ব্যাগটা মেঝেতে রেখে জানতে চাইল, 'কি আছে ব্যাগে, এত ভারী কেন? তোমার কি ধারণা, আমরা পিকনিক করতে যাচ্ছি?'

ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটল ফিরোজার ঠোঁটে। 'কতক্ষণ প্লেনে থাকতে হবে কে জানে, তাই কাপড়চোপড়...' হঠাৎ থেমে গেল সে, সন্ত্রস্ত দেখাল আবার তাকে। 'খালেদ, কাল রাতে তোমাকে কি বলেছিলাম মনে আছে? কোন সমাধান পেয়েছ?'

গভীর একটা শ্বাস নিয়ে ফিরোজার কানে কানে ফিসফিস করল রানা। শুনতে শুনতে ছানাবড়া হয়ে উঠল ফিরোজার চোখ। ওর মুখের দিকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ফিরোজা। গোটা ব্যাপারটা হজম করতে সময় লাগছে তার। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'কিন্তু কোথাও যদি কিছু গোলমাল হয়, নির্ঘাত মারা পড়বে তুমি, খালেদ।'

'তা ঠিক,' বলল রানা। 'কিন্তু এছাড়া আর কোন সমাধান হয়ও না। ফাঁদটা আমি খুব যত্নের সাথে পেতেছি, সফল হবার সম্ভাবনাই বেশি।'

'রাগ কোরো না, সেই একই কথা বলছি আবার—দায়িত্বটা এড়িয়ে যেতে পারো না? আমপালা সাংঘাতিক নিষ্ঠুর লোক, খালেদ। ওর মত ধড়িবাজ লোক খুব কম দেখেছি। যদি টের পেয়ে যায়...'

'কাপুরুষের মত দায়িত্ব এড়িয়ে যাব, এ তুমি কি বলছ! সোনাটা সৌদি আরব

ফিরে পাবে সেটা একটা বড় কথা, তারচেয়েও বড় কথা ইসরায়েলকে একটা উচিত শিক্ষা দেয়া হবে। সুযোগটা ছাড়ব কেন, এত খাটাখাটনির পর? আর আমপালার কথা যদি বলো, ও তো স্রেফ একজন গুণ্ডা-সর্দার, তাই না? ওকে এত ভয় পাবার কিছু নেই।' কথা বলছে, কিন্তু চোখ রয়েছে ক্যাফেটেরিয়ার বাইরে। 'শোনো, আমাদের এখনকার সমস্যা টারমাকে যাওয়া নিয়ে। আমপালা আর আমাদের মাঝখানে এক ব্যাটালিয়ান সৈনিক রয়েছে। ওদের ভেতর দিয়ে যাব কিভাবে?' ফিরোজার ব্যাগটা তুলে নিল ও। 'এসো, মাথায় একটা কুবুদ্ধি এসেছে।'

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোল ওরা, ঢুকল কার-পার্ক এলিভেটরে। পাঁচ তলায় যাবার জন্যে বোতামে চাপ দিল রানা, ওখানেই মার্সিডিজ রেখে গেছে ও। গাড়িটা ব্যবহার করার ইচ্ছে নেই, তবে এখানে উপস্থিতির কারণ দেখাতে হলে গাড়িটার কথা বলতে পারবে। পাঁচ তলায় উঠে বিল্ডিঙের কিনারায় চলে এল ওরা, এখান থেকে পাঁচিলের ওপর দিয়ে হিথরো সেন্ট্রাল স্টেশনের প্রবেশ পথটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

ছয়টার মধ্যে মাত্র দুটো বাস দেখল ওরা। একটা রওনা হতে যাচ্ছে। পুলিস আর সৈনিকরা সংখ্যায় কয়েকশো হবে, কিন্তু সবাই যথেষ্ট পিছনে সরে আছে। প্রায় প্রতিটি ছাদে রাইফেলধারী সৈনিকদের দেখা গেল, রাইফেল তাক করে আছে বাসগুলোর দিকে; কিন্তু একটা গুলি ছোঁড়ার সাহস নেই। কার-পার্ক বিল্ডিঙের চারতলায়ও তিনজন সৈনিককে দেখা গেল, ওদের সরাসরি নিচে।

শেষ বাসের ভেতর বিরতিহীন ঢুকছে ক্যানভাস ব্যাগ। 'বেশি সময় নেই,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

রানার হাত ধরে চাপ দিল ফিরোজা। 'প্লেনটা কোথায়?'

'ওরা আমাকে জানিয়েছে, বারো নম্বর গেটে। কোথায় ঠিক জানি না।' থেমে ফিরোজার দিকে তাকাল। 'তোমার কাছে পিস্তল আছে?'

ব্যাগটা দেখাল ফিরোজা। 'ওতে।'

'মুখের কাছে?'

'অবশ্যই।'

নিচের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে রানা। ফিরোজা জানতে চাইল, 'কুবুদ্ধিটা কি?'

পকেটের ভেতর হাত গলিয়ে ইস্পাতের ঠাণ্ডা পরশ নিল রানা, বলল, 'চলো, দেখতে পাবে।'

কার-পার্ক বিল্ডিং থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। হাত ধরাধরি করে রাস্তা পেরোল, টার্মিনাল বিল্ডিঙের সামনে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে থামল। ঝুঁকে লাইনের প্রথম ট্যাক্সির জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল রানা, পিছনের দরজা খুলে ব্যাক সীটে উঠে বসল ফিরোজা। 'ওয়েস্ট এণ্ডে যেতে কোন আপত্তি নেই তো?' মাথা দোলাল ড্রাইভার। ব্যাগ দিয়ে ফিরোজার পাশে উঠে বসল রানা। ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল ও, বাইরে থেকে কারও চোখে পড়বে না। ঝুঁকে পড়ে সেটার চেইন ধরে টান দিল ফিরোজা।

টার্মিনাল বিল্ডিং ছাড়িয়ে বেশ খানিক দূর চলে এসেছে ট্যাক্সি, সামনের দিকে

ঝুঁকে ড্রাইভারের মাথার পিছন থেকে গ্লাস প্যানেল ঠেলে সরিয়ে দিল একপাশে। 'কিছু মনে কোরো না, গাড়িটা একপাশে একটু দাঁড় করাবে? ভুল করে একটা জিনিস ফেলে এসেছি আমরা।'

রাস্তার পাশে থামল ট্যাক্সি। দু'হাতের তালু এক করে আছে রানা, মাঝখানে পিস্তল। পার্টিশনের ভেতর দিয়ে ড্রাইভারের কাঁধের ওপর দুই হাতের কনুই রাখল ও। রানার আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিস্তলের ব্যারেল দেখতে পেল ড্রাইভার, শিউরে উঠে মাথাটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল সে। তার গলায় মাজল চেপে ধরল রানা। ফিসফিস করে বলল, 'মুখ খুলো না। সাবধানে ঘাড় ফেরাও, আমার গার্ল-ফ্রেন্ডের দিকে তাকাও।'

কলের পুতুলের মত ঘাড় ফেরাল ড্রাইভার, বিস্ফারিত চোখে ফিরোজার দিকে তাকাল। কোলের কাছে রাশিয়ান পিস্তল ধরে রয়েছে ফিরোজা, ড্রাইভারের মাথার দিকে তাক করা। আরেকবার শিউরে উঠে ঘাড় সোজা করল ড্রাইভার।

'ভয় পাবার কিছু নেই, যদি কথা শোনো,' নিচু গলায় বলল রানা। 'এয়ারপোর্টে ঢুকতে চাই আমরা, টেক-অফ এরিয়ায়। কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে, তুমি জানো।'

ঢোক গিলল ড্রাইভার। 'একটাই পথ, সিকিউরিটি গেট···কিন্তু ওখানে নিশ্চয়ই গার্ড আছে।'

'সে দেখা যাবে,' বলল রানা। 'ওদিকে নিয়ে চলো আমাদের। এবার বলো, বারো নম্বর গেট কোন দিকে?'

'ওদিকে কোনদিন যাইনি, তবে খুঁজে নিতে পারব। দেখো, মিস্টার, তোমরা যা বলো সব শুনব আমি, কিন্তু তোমার গার্ল-ফ্রেন্ডকে বলো পিস্তলটা যেন আমার মাথার দিকে না ধরে। হঠাৎ গুলি বেরিয়ে গেলে তখন কি হবে?'

'এসব ব্যাপারে এক্সপার্ট ও,' হাসি চেপে অভয় দিল রানা। 'ওর হাত থেকে হঠাৎ গুলি বেরুবে না। গাড়ি ছাড়ো। গেটের কাছে পৌঁছে গাড়ি থামাবে, যেখান থেকে ভেতরটা আমরা দেখতে পাব।'

দু'মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা। ড্রাইভার-পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি থামাল। একশো গজ দূরে বিশাল লোহার গ্রিল দেয়া এক জোড়া গেট, তার মধ্যে একটা খোলা। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে তিনজন সিকিউরিটি গার্ড নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। চারদিকটা দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা। ড্রাইভারকে বলল, 'এই গেট দিয়েই ভেতরে ঢুকবে তুমি। মন দিয়ে শোনো। আস্তে ধীরে গেটের দিকে এগোবে, যেন তুমি জানো গেটের কাছে পৌঁছে তোমাকে থামতে হবে। কিন্তু আমি তোমাকে বললেই পা চেপে ধরবে নিচে, পাঁই পাঁই ছুটবে। বুঝেছ?'

মাথা একদিকে কাত করল ড্রাইভার।

'গাড়ি চালাও, আস্তে আস্তে।'

গেটের কাছে বিনা বাধায় পৌঁছুল ট্যাক্সি, প্রায় থেমে যাচ্ছে এই সময় একজন গার্ড এগিয়ে আসতে শুরু করল ওদের দিকে; ইচ্ছে, অনুমতি-পত্র দেখতে চাইবে। চাপা গলায় নির্দেশ দিল রানা, 'জোরে! জোরে!'

গেটের ভেতর দিয়ে তীরবেগে ছুটল গাড়ি। হতভম্ব পুলিস কাঁধ থেকে রাইফেল

নামিয়ে গুলি ছুঁড়ল বটে, কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছে তারা। ট্যাক্সির গায়ে একটা আঁচড়ও লাগাতে পারল না।

হুইলের সাথে কপাল প্রায় ঠেকিয়ে রেখেছে ড্রাইভার। অচল দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনগুলোর মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মত ছুটছে গাড়ি। আপন মনে হাসছে রানা, এই উত্তেজনা চিরকাল তার প্রিয়। সিকি মাইল দূরে, ওদের দক্ষিণে, ল্যান্ড করার জন্যে এগিয়ে আসছে একটা লীয়ার জেট। সেদিকে ফিরোজার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'সা'দুল্লাও পৌঁছে গেছে। এখন পর্যন্ত নিখুঁত একটা অপারেশন, কি বলো?'

ছয়শো গজ দূরে ওদের বাহনটাকে দেখা গেল। বিশাল একটা জাম্বো জেট। সেটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সৈনিক, পুলিস, সিকিউরিটি গার্ড, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ইঞ্জিন, পুলিস কার, জীপ আর ট্রাক। হৈ হৈ করে উঠল রানা, 'ইয়াল্লা! কি একখান রিসেপশন! মন্ত্রী-মিনিস্টাররাও এত গুরুত্ব পায় না।' আরও কাছে চলে এল ট্যাক্সি, একটা ভ্যানকে পাশ কাটাল ড্রাইভার, ভ্যানের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা বি. বি. সি। পলকের জন্যে একটা ক্যামেরাও দেখতে পেল ওরা। 'কি মজা! টেলিভিশনেও আছি আমরা।'

'টিভি!' আঁতকে উঠল ফিরোজা। তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভেতর হাত ভরে দিল। রানাও জ্যাকেটের পকেট থেকে নাইলন মোজা বের করে মাথা দিয়ে গলিয়ে নিল মুখে। ভোঁতা শোনাল ওর গলা, ড্রাইভারকে বলল, 'থেমো না, চালিয়ে যাও। ভিড়ের ভেতর দিয়ে একেবারে জাম্বো পর্যন্ত। হর্ন বাজাও।'

সবুজ রঙা একটা উলেন মুখোশ পরল ফিরোজা। লোকজনের পাঁচিল দু'ফাঁক হয়ে গেল, তার ভেতর দিয়ে এগোল ট্যাক্সি, হর্নের বোতামে আঙুল চেপে রেখেছে ড্রাইভার। লোকজন যে যেদিকে পারল ছুটে সরে গেল। একদল হুমড়ি খেয়ে পড়ল আরেক দলের ওপর। জাম্বো জেটের একেবারে পেটের নিচে গিয়ে থামল ওরা। হঠাৎ করেই চারদিক থেকে ওদের দিকে উঁচিয়ে ধরা হলো অটোমেটিক রাইফেল, পিস্তল, মেশিনগান।

মুখোশ পরা থাকলেও, দেখেই আমপালাকে চিনতে পারল রানা। ট্যাক্সি থেকে ফিরোজাকে নামতে দেখে হাতের অস্ত্র নিচু করে নিল আমপালা। টারমাকে নেমে জানালা দিয়ে একশো পাউন্ডের দুটো নোট ড্রাইভারের কোলে ফেলল রানা। 'চমৎকার দেখিয়েছ। অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার, যেভাবে এসেছ, পারলে ঠিক সেইভাবে পালাও।'

ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল ড্রাইভার। ধীর পায়ে আমপালার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ও কিছু বলার আগেই একটা হাত বাড়িয়ে দিল আমপালা। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে ওর হাতটা ধরল রানা। পরমুহূর্তে ছেড়ে দিল, বলল, 'তোমাকে আমি নিষেধ করিনি নিরীহ কারও গায়ে হাত তুলতে পারবে না?'

'আরে ভাই, তোমার অপারেশন সাকসেসফুল সেজন্যে আমাকে তুমি ধন্যবাদ দেবে, তা না...'

'কাজটা তুমি ভাল করোনি, আমপালা।'

*

টিভি তার সব প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে হিথরো থেকে সরাসরি একটা লাইভ কাভারেজ করছে। বছরের সবচেয়ে উত্তেজক ঘটনাগুলোর মধ্যে এটাই বোধ হয় সেরা হতে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ বলতে পারছে না, এমনকি কর্মকর্তারা আভাস পর্যন্ত দিতে অপারগ যে অতগুলো ক্যানভাস ব্যাগে কি আছে। নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু হবে, তা না হলে হাইজ্যাকাররা এত বড় ঝুঁকি নিত না।

আন্ডার-সেক্রেটারির অফিসে বসে টিভি দেখছে ইসরায়েলি দূতাবাসের প্রধান। স্যার এডওয়ার্ড ডুরেল প্রায় সারাক্ষণ কথা বলছেন টেলিফোনে। টিভিতে একটা ট্যাক্সি দেখা গেল, ট্যাক্সি থেকে মুখোশ পরা এক যুবক আর এক যুবতী মেয়ে নামল। আর্মচেয়ারে বসে আছে অ্যামব্যাসাডার কোয়ায়েল হেগেন, সামনের দিকে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে। 'ডুরেল, দেখছ, ওদের সাথে একটা মেয়েও রয়েছে!'

রিসিভারে স্যার ডুরেল বললেন, 'এক সেকেন্ড।' তারপর টিভির দিকে তাকালেন তিনি। মেয়েটাকে দেখে বললেন, 'এ নিশ্চয়ই মিস বেলি, এল. টি. ই. হেডকোয়ার্টার দখল করেছিল যে। লেদার ট্রাউজার আর বম্বার জ্যাকেট। অবিশ্বাস্য!'

রানা আর আমপালা করমর্দন করছে, দেখে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল হেগেনের। 'কী ভয়ানক! ওদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে এটা যেন সাধারণ একটা বিজনেস মীটিং।'

ফোনে আরও ক'টা কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন স্যার ডুরেল। টিভির দিকে তাকালেন তিনি, রানা আর ফিরোজা এই মুহূর্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে সেভেন-ফরটি-সেভেনে। ভিড়ের মাঝখান দিয়ে একটা লীয়ার জেট এগিয়ে এসে ঠিক জাম্বোর পাশে থামল। দরজা খোলার পর দেখা গেল দু'জন মুখোশ পরা লোক তৃতীয় একজন লোককে নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। ক্যামেরা জুম করল। মুখোশ পরা লোক দু'জন মাঝখানের লোকটার মুখ তুলে ধরল, টিভিতে যাতে ভাল করে দেখা যায়।

'ওহ্, মাই গড, নো!' আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠল হেগেন। 'বিশ্বাস করি না, এ আমি বিশ্বাস করি না!'

'চেনা চেনা লাগছে যেন?' জিজ্ঞেস করলেন স্যার ডুরেল। 'উনি কি...?'

মাথা ঝাঁকাল হেগেন। 'কোন সন্দেহ নেই। ইনফরমেশন সেক্রেটারি মোশে ফেরেল। লোকগুলো শুধু বেপরোয়া আর বুদ্ধিমান নয়, ওরা ডায়াবোলিকাল!'

শেষ বাসটা এসে থামল জাম্বো জেটের কাছে। সেটা থেকে ক্যানভাস ব্যাগ নামিয়ে তোলা হতে লাগল জেটে।

হেগেন বলল, 'তোমার টেলেক্স ব্যবহার করতে পারি তো?' মৌখিক অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখল, মোশে ফেরেলকে জাম্বো জেটে তোলা হচ্ছে।

'যেমন বলা হয়েছে, তেল আবিব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে,' বলল হেগেন। আর্মচেয়ারে বসে পা দুটো লম্বা করে দিল সে, একটা চুরুট

ধরাল।

টিভি দেখায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন স্যার ডুরেল, মনে হলো গোটা ব্যাপারটা তিনি উপভোগ করছেন। অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'দলের কিছু লোক অন্তত ইসরায়েলের ফেভারে কাজ করবে বলে জানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সোনা তোমাদের হাতেই ফিরে যাচ্ছে। তোমাদের ভাগ্যই বলতে হবে।'

'আগে ফিরুক তো!'

## তেরো

একটা সীটে বসে ডুবে গেল ফিরোজা, শরীর ঢিল করে দিয়ে বসে থাকল কয়েক সেকেন্ড। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে জুতোর ফিতে খুলতে শুরু করল। দু'পাশে সারি সারি সীট, মাঝখানে আইল, জিম্মিরা এখনও সেটা ধরে সোনার ব্যাগ আনার কাজে ব্যস্ত। ওরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত মুখোশ খুলতে পারছে না ফিরোজা। জানালা দিয়ে নিচে তাকাল ও। বাস থেকে শেষ ব্যাগগুলো সিঁড়ি দিয়ে তুলে আনা হচ্ছে। রোনাল্ডের আরও কিছু লোককে সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে কাজের গতি দ্বিগুণ করে তুলেছে আমপালা। টারমাকের ওপর এক লাইনে বসে রয়েছে মহিলা জিম্মিরা, এয়ারক্রাফটে চড়ার দ্বিতীয় সিঁড়ির কাছে। ওদের মাথার পিছনে হাত, রাইফেলধারীরা পাহারায় রয়েছে। পুলিস আর সৈনিকরা কেউ এগিয়ে আসেনি, আগের মতই অনেকটা দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই আশ্চর্য রকম শান্ত আর চুপচাপ, খুঁটিয়ে লক্ষ করছে সব।

ককপিটে ঢুকল রানা, পাইলট আর নেভিগেটররা ওখানে আগেই পৌঁচেছে। যে যার আসন নিয়ে নিজেদের ইন্সট্রুমেন্ট চেক করছে তারা। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় আমপালার একজন বন্দুকবাজকে ধাক্কা দিয়ে এগোতে হলো রানাকে। লোকটা একাধিক দায়িত্ব পালন করছে, প্লেনের ভেতর জিম্মিরা যারা কাজ করছে তাদের ওপর নজর রাখছে, ক্রুদেরও পাহারা দিচ্ছে। ককপিটে ঢুকে এমন একটা ভঙ্গি করল রানা যেন দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে, লোমশ একটা হাত ওর কনুই চেপে ধরল।

হাতটা ছাড়িয়ে নিল রানা। 'ভয়ের কিছু নেই। ওরা স্বেচ্ছায় এই প্লেন চালাবার দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছে, ওদেরকে পাহারা দেয়ার কোন দরকার নেই।'

'দুঃখিত, খালেদ। আমপালার হুকুম। ও না আসা পর্যন্ত এখান থেকে আমি নড়ছি না।' মুখোশের ভেতর থেকে এটা পিয়ানোর কণ্ঠস্বর।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যা ভাল বোঝো।' ক্যাপটেনের দিকে এগোল ও। 'গুড ইভনিং, ক্যাপটেন।'

সুদর্শন, সুঠামদেহী ক্যাপটেন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। তার চোখে উত্তেজনার ঝিলিক। 'গুড ইভনিং।'

'এয়ারপোর্টে সিকিউরিটির সাথে আমিই সব কথা বলেছি,' বলল রানা। 'এই

ফ্লাইটে যারা ভলানটিয়ার হতে চেয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে তোমাকে আমি বেছে নিয়েছি, কারণ, তুমি পেশাদার পাইলট নও।'

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ক্যাপটেন। মনে মনে ভাবল, ব্যাটা বেশি কথা বলে। মুখে বলল, 'চিন্তা কোরো না, জায়গা মত ঠিকই পৌঁছে দেব তোমাকে।' এক সেকেন্ড থেমে আবার সে বলল, 'ভারি লোভনীয় একটা দাঁও মারছ তোমরা।'

মুখোশের ভেতর নিঃশব্দে হাসল রানা। 'হ্যাঁ।'

ক্যাপটেনের পাশে এসে দাঁড়াল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ঢোলা ইউনিফর্ম পরা একজন স্টুয়ার্ড। হাতে একটা ট্রে। কেন যেন ঠোঁট টিপে হাসছে সে।

শেষ ব্যাগটা প্লেনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল, সেই সাথে সিঁড়ির দিকে এগোল রোনাল্ড হার্ডি, নিচে তার আর কোন কাজ নেই। 'এক সেকেন্ড, রোনাল্ড,' বলল আমপালা, দু'গজ পিছনে রয়েছে সে। দীর্ঘদেহী রোনাল্ড দাঁড়িয়ে পড়ল, ঘুরল খানিকটা, হ্যান্ডগানটা সহ ডান হাত শরীরের পাশে শিথিল হয়ে রয়েছে। তাকাতেই দেখল আমপালার মেশিন-পিস্তল ওর বুক লক্ষ্য করে ধরা। চমকে পিছুতে শুরু করল রোনাল্ড, প্রতিবাদ করার জন্যে মুখ খুলল।

সেভেন পয়েন্ট সিক্স-টু ক্যালিবারের বুলেট তাকে তিন গজ দূরে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলল, টারমাকে পড়ার আগেই প্রাণপাখি উড়ে গেছে। পরমুহূর্তে আমপালার বুলেট ফুটো করে বেরিয়ে গেল জ্যাক হার্ডির হৃৎপিণ্ড। লোকটা মারা গেল নিঃশব্দে, মোজার ভেতর বিস্ফারিত চোখ নিয়ে।

শুধু যদি রোনাল্ডের লোকেরা লক্ষ্য করত যে তাদের অ্যান্টিস্টান-গ্রেনেডের গগলস সাদা রাবার দিয়ে তৈরি, বাকি সবার মত কালো রাবার দিয়ে নয়, কে জানে, তাহলে হয়তো সময় থাকতে সাবধান হতে পারত ওরা। আমপালার গুলি শেষ হলো, অমনি শুরু হলো তার লোকদের গুলিবর্ষণ। মুখোশ পরা সব লোককে একই রকম দেখায়, কাজেই রোনাল্ডের লোকদের যাতে আলাদাভাবে চেনা যায় তার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিল আমপালা। রাবার গগলস নিজ হাতে বিলি করেছে সে, নিজের একজন লোককেও সাদা রাবার মোড়া গগলস দেয়নি।

একসাথে গর্জে উঠল অনেকগুলো রাইফেল আর পিস্তল। আমপালার লোকেরা আগে থেকেই তৈরি ছিল, একজনের লক্ষ্যও ব্যর্থ হলো না। রোনাল্ড হার্ডি আর তার স্যাঙাতরা চোখের পলকে মারা পড়ল সবাই, কিন্তু আর কারও গায়ে সামান্য আঁচড়টিও লাগল না। সৈনিক আর পুলিসদের মধ্যে একটা আলোড়ন উঠল, আহত বিস্ময়ে একসাথে কথা বলে উঠল সবাই। তাদের কেউ কেউ সাবধানের মার নেই ভেবে ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ল টারমাকের ওপর। কিন্তু শুরু হতে না হতে আবার থেমে গেল গুলিবর্ষণ।

গুলির আওয়াজ শুনে হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল রানার, ককপিটের জানালা দিয়ে নিচে তাকাতেই পঁচিশটা লাশ দেখতে পেল ও। 'জেসাস!' পিয়ানোকে আরেকবার ধাক্কা দিয়ে ছুটল ও, ফিরোজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার কাঁধের ওপর দিয়ে নিচে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটছে জানো কিছু?'

সাদা হয়ে গেছে ফিরোজার চেহারা। 'কি জানি, বলতে পারি না। কিন্তু

দেখেছি সবই। সৈনিকরা নয়। হঠাৎ নিজেদের মধ্যে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল আমাদের লোকেরা। তবে···প্রথমে রোনাল্ডকে গুলি করল দেখলাম আমপালা।'

আইল ধরে আবার ছুটল রানা, ক্যানভাস ব্যাগগুলোকে লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। জিম্মিরা জানালার সামনে ভিড় জমিয়েছে। প্লেনের পিছন দিক থেকে সা'দুল্লার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কি হলো? কি হলো? কি ঘটছে?' মোশে ফেরেলের ঘুম ভাঙছে, তাকে ছেড়ে আসতে পারছে না সে।

দরজার কাছে এসে চেঁচিয়ে জবাব দিল রানা, 'তেমন কিছু না। কি হয়েছে আমি বুঝতে পারছি। আমাদের ভয়ের কিছু নেই।' আমপালাকেও বিশ্বাস করে না, কিন্তু জানে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওকে আর ক্রুদের তার দরকার হবে।

সিঁড়ির দিকে এগোল রানা, দরজার কাছে আসতেই মুখোমুখি হলো আমপালার সাথে। তার হাতের মেশিন-পিস্তল নিচের দিকে মুখ করা।

রানা জানতে চাইল, 'ওদের সবাইকে, আমপালা? রোনাল্ড আর তার সব লোক?'

হাঁপাচ্ছে আমপালা। 'তাছাড়া কি আশা করো তুমি?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে। 'সবাইকে ভাগ দিলে আমার পোষাবে না। তাছাড়া, বেঈমানী করে পরে কেউ আমাকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিক, সেটা নিশ্চয়ই আমি চাইতে পারি না। জড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছি—যা!'

'সত্যি, তুমি একটা নির্মম বাস্টার্ড। এরকম ঠাণ্ডা মাথায়!' যদিও, রোনাল্ডের জন্যে রানার কোন দুঃখ হলো না।

'অবশ্যই আমি নির্মম। দুনিয়ার সেরা লোকদের নিয়ে দুনিয়ার সেরা দাঁওটা মারছি না আমি? রোনাল্ড আর তার লোকজন, ওরা তো ছিঁচকে। কাজ ফুরালেই ওদেরকে সরিয়ে দিতে হয়।' জিম্মিদের দিকে তাকাল সে, চিৎকার করে বলল, 'তোমরা এবার কেটে পড়তে পারো। কুইক।'

তাড়া খেয়ে ক্লান্ত জিম্মিরা হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। টারমাকে নেমে ছুটল তারা, সৈনিক আর পুলিসদের পাঁচিলটা দেবে গিয়ে গ্রাস করল তাদের, ছেঁকে ধরল রিপোর্টাররা।

সিঁড়ির মাথা থেকে ভারী গলায় নিজের লোকদের নির্দেশ দিল আমপালা, 'মেয়েলোকদের ওপরে তোলো। সবাই উঠে এসো প্লেনে।'

চার হাজার ফিট ওপরে উঠে দিক পরিবর্তন করল জাম্বো জেট, এখনও বিরতিহীন উঠে যাচ্ছে। ঘর ঘর করে উঠল রেডিও, '···ক্লাইম্ব টু ফ্লাইট লেভেল থ্রী-থ্রী-জিরো।'

'এর মানে কি? কি বলতে চাইছে?' জিজ্ঞেস করল আমপালা। একটা লীয়ার জেটের আংশিক মালিক সে, অথচ প্লেন সম্পর্কে একেবারেই কিছু জানে না—নিজেকে তার ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল। অপারেশনের কঠিন পর্যায়গুলো নিরাপদে পেরিয়ে আসা গেছে, তবু এখন তাকে অতিরিক্ত সাবধান থাকতে হবে, কারণ আকাশ পথটুকু পাড়ি দিতে অন্য লোকের ওপর নির্ভর করতে হবে তাকে।

'এর মানে হলো তেত্রিশ হাজার ফিট ওপর দিয়ে উড়ে যাবার ক্লীয়ারেন্স দেয়া

হলো,' বলল রানা। সামনের জটিল ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলগুলোর দিকে একবার চোখ বুলাল ও।

'সারাটা পথ?' জিজ্ঞেস করল আমপালা।

'হ্যাঁ, সারাটা পথ, যদি না বিশেষ কোন কারণে...'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ক্যাপটেন। 'অন্তত এই বিষয়ে আমাকে কথা বলতে দিলে খুশি হব আমি। না, সারাটা পথ আমরা তেত্রিশ হাজার ফিট উপরে থেকে উড়ে যাব না। বাতাসের মতিগতি এপথে বিশেষ সুবিধের নয়, আটলান্টিক আর ভূমধ্য সাগরের ওপর দিয়ে যেতে হবে কিনা, তাই অবস্থা বুঝে বেশ কয়েকবারই আরও ওপরে উঠতে হতে পারে আমাদের।'

এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল আমপালা। তারপর ক্যাপটেনের কাঁধে একটা হাত রেখে ঝুঁকে পড়ল, তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে সিসিলিতে আমরা পৌঁছুব কখন?'

জবাব দেয়ার সময় আমপালার দিকে তাকাল না ক্যাপটেন। 'সকাল পাঁচটার দিকে। স্থানীয় সময়। এখন থেকে সাত ঘণ্টা পর।'

মন খুঁত খুঁত করতে লাগল আমপালার। 'সিসিলিতে পৌঁছুতে এত সময় লাগবে কেন?'

'লাগত না, কিন্তু ঘুর পথে যেতে হবে।'

'ঘুর পথে যেতে হবে?' তীক্ষ্ণ, সতর্ক হলো আমপালার দৃষ্টি। 'তারমানে?'

'রেডিওর খবর শোনোনি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপটেন। 'ফ্রান্স, আর সুইজারল্যান্ড আমাদের এই ফ্লাইটকে তাদের ওপর দিয়ে যেতে দিতে রাজি হয়নি। রাজি হলেও আমরা যেতাম না। কারণ, ইসরায়েল দেশ দুটোকে অনুরোধ করেছে ওদের আকাশ-সীমা লংঘন করলেই সেভেন-ফরটি-সেভেনকে ফাইটার প্লেন দিয়ে ঘিরে ফেলে যেন নামাবার ব্যবস্থা করা হয়।'

'এটা রেডিওর খবর?'

জবাব না দিয়ে রেডিও অন করল ক্যাপটেন। হাইজ্যাক সম্পর্কেই বলা হচ্ছে। দু'মিনিট অপেক্ষা করতে হলো, তারপরই খবর পাঠক জানাল, 'ইসরায়েল সরকার ফ্রান্স আর সুইজারল্যান্ডকে অনুরোধ করেছে...'

খবরটা যে ভুয়া নয়, নিজের কানেই শুনল আমপালা। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' তাকে আশ্বস্ত করল ক্যাপটেন, 'জিব্রালটারের ওপর দিয়ে গেলে কোন বিপদ হবে না।'

'কিন্তু মোশে ফেরেলের মত জিম্মি রয়েছে আমাদের হাতে, তবু ওরা ঝুঁকি নেবে?' জানতে চাইল আমপালা। 'ব্যাপারটা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।'

'বোধগম্য তো তোমাদেরই হবার কথা,' বলল ক্যাপটেন, 'কারণ একমাত্র তোমরাই জানো ক্যানভাসের ভেতর কি আছে। একজন ইনফরমেশন সেক্রেটারির চেয়ে ওগুলোর মূল্য বেশি কিনা, তোমরাই বলতে পারবে।'

তাই তো! ব্যাপারটা এই প্রথম উপলব্ধি করল আমপালা। এক হাজার মিলিয়ন ডলার! একজন ইনফরমেশন সেক্রেটারির দাম কি এক হাজার মিলিয়ন ডলার হতে

পারে? বিশেষ করে ইসরায়েলিদের কাছে, যারা বেনিয়ার জাত, কঠোর বাস্তববাদী? উঁহুঁ, মনে হয় না। আবার সে প্রশ্ন করল, 'ঘুর পথে গেলে সিসিলিতে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে বললে?'

'সাত ঘণ্টা। স্থানীয় সময় পাঁচটার দিকে পৌঁছুব আমরা।'

ঘড়ির দিকে তাকাল আমপালা। সন্ধে সাতটা পাঁচ। ঘড়ির কাঁটা তিন ঘণ্টা এগিয়ে রাখল সে। তারপর রানাকে বলল, 'ককপিট থেকে নোড়ো না, খালেদ। লক্ষ রাখবে সব যেন ঠিক থাকে।'

পিয়ানোকে নিয়ে প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টে ফিরে এল আমপালা। ক্যাপটেনের অনুরোধে তার লোকেরা অনেকেই সীট বেল্ট বেঁধে জিম্মিদের মাঝখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে, কেউ এখনও মুখোশ খোলেনি। ভারী মেঘের ভেতর দিয়ে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে জেট, পরপর কয়েকটা ঝাঁকি খেল ওরা। একটা সীটে বসল আমপালা, ইঙ্গিতে পাশের সীটে বসতে বলল পিয়ানোকে। তারপর ফিসফিস শুরু হলো দু'জনে।

'তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই,' বলল আমপালা, 'তোমার সময় মত, কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে না পারে, দু'জায়গায় ফিট করবে ডিনামাইট। ল্যান্ড করার ঠিক আধ ঘণ্টা আগে টাইমিং ডিভাইস অন করবে। টাইম সেট করবে দু'ঘণ্টা।'

'সিসিলিতে কার্গো খালাস করতে কতক্ষণ লাগবে আমাদের?' জানতে চাইল পিয়ানো।

'বিশ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা,' বলল আমপালা। 'বাকি থাকবে এক ঘণ্টা। এই এক ঘণ্টায় অনেক দূর চলে যাবে ওরা। আমি চাই, সাগরের ওপর কোথাও বিস্ফোরিত হোক প্লেন, সবাই যাতে ধরে নেয় সাগরে ডুবে গেছে সব সোনা, উদ্ধার করা সম্ভব নয়।'

'এক ঘণ্টা সময় বেশি হয়ে যাচ্ছে,' বলল পিয়ানো। 'সিসিলি থেকে এক ঘণ্টায় অনেক বেশি দূরে চলে যাবে প্লেন, সাগর পেরিয়ে কোন এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবে। আর মাটির ওপর ফাটলে সোনার খোঁজ পড়বে।'

চিন্তিত দেখাল আমপালাকে। এক সময় মাথা দোলাল সে। 'তুমি ঠিকই বলেছ। ঠিক আছে টাইম ফিক্স করবে দেড় ঘণ্টায়। ফিক্স করার পর আধ ঘণ্টা লাগবে সিসিলিতে পৌঁছুতে, আধ ঘণ্টা লাগবে কার্গো খালাস করতে, তারপর বাকি আধ ঘণ্টায় সাগর এলাকার ভেতর যতদূর যেতে পারে যাক।'

ফ্লাইট লেভেলে উঠে পড়ল প্লেন। আমপালার লোকেরা জিম্মিদের চোখে কালো কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিল, তারপর নিজেদের মুখোশ খুলে ফেলল। প্লেনের পিছন দিকে চলে এল আমপালা। দেখল, ঢোলা ইউনিফর্ম পরা স্টুয়ার্ড সা'দুন্নাকে কফি আর চকলেট পরিবেশন করছে। পাশেই একটা সীটে আধশোয়া অবস্থায় ঘুমিয়ে রয়েছে মোশে ফেরেল। 'কি অবস্থা ওর?' জানতে চাইল আমপালা। 'ঘুম ভাঙবে কখন?'

'একবার ভেঙেছিল,' বলল সা'দুন্না। 'আধঘণ্টার মধ্যে ঘুমের লেশও থাকবে না চোখে।'

'ভেরি গুড,' বলল আমপালা। 'ইসরায়েলিরা বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে পারে, রেডিওতে তখন ওকে আমাদের দরকার হবে।' স্টুয়ার্ড ফিরে যাচ্ছিল, তাকে ডাকল সে, 'ওহে। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ আর লোক পায়নি, তোমার মত হাফ সাইজের এক হাফ-বুড়ো পাটখড়িকে গছিয়ে দিয়েছে। তা, আমাকেও একটু খাতির-যত্ন করো। জানো, এই অপারেশনের প্রায় সবটুকু কৃতিত্ব আমার?' সা'দুল্লার দিকে তাকাল সে, যেন কোন প্রতিবাদ আশা করছে।

'নো, ইয়েস,' ঘন ঘন ঢোক গিলে বলল স্টুয়ার্ড, 'আই মীন, ইয়েস, নো।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল আমপালা। 'সার্কাসের লোক নাকি হে? জোকার? যাও, আগে আমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এসো, তারপর আমার লোকদের খেতে দেবে।'

স্টুয়ার্ড পালিয়ে বাঁচল।

চল্লিশ মিনিট পর আবার প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টে ঢুকল আমপালা। ফিরোজাকে খুঁজছে। দেখল, ওর নির্দেশ অমান্য করে ককপিট থেকে বেরিয়ে এসেছে খালেদ, পাশে ফিরোজাকে নিয়ে বসে আছে সীটে। দু'জনে পরস্পরের দিকে ঝুঁকে কথা বলছে নিচু গলায়।

'ফিরোজা!' কঠিন সুরে ডাকল আমপালা।

চমকে উঠল ফিরোজা, সিধে হয়ে বসল।

'আমাকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে একটা চুমো খাবে না, ফিরোজা?' চেহারা বদলে গেছে আমপালার, হাসছে সে।

'হ্যাঁ, মানে...' উঠে দাঁড়াল ফিরোজা, আমপালার এই হাসির অর্থ জানা আছে ওর। ইচ্ছে পূরণ না করা হলে সবার সামনেই গায়ে হাত তুলবে সে। রানার মাথার ওপর দিয়ে আমপালার দিকে ঝুঁকল সে, চুমো খেল তার গালে।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ফিরোজার পাঁজরের কাছে খানিকটা মাংসসহ চামড়া দু'আঙুলে সজোরে চিমটে ধরল আমপালা, নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। 'কেমন বোধ করছ, ফিরোজা?' ব্যথায় চোখে পানি এসে গেল ফিরোজার, কিন্তু ভয়ে টুঁ শব্দটিও করল না সে। তার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আর খানিক পর ওকে আমাদের দরকার হবে না। ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল ফিরোজা।

তাকে ছেড়ে দিল আমপালা। তাকাল রানার দিকে। 'তোমাকে আগেও বলেছি, খালেদ, কিন্তু ফিরোজার কাছ থেকে দূরে সরে থাকছ না তুমি। কাজটা কিন্তু ভাল করছ না।'

এই মুহূর্তে লোকটার সাথে লাগার কোন ইচ্ছে নেই রানার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, সোজা এগিয়ে গিয়ে ককপিটে ঢুকল।

লন্ডন থেকে টেক-অফ করার পাঁচ ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট পর এক ঝাঁক ফাইটার প্লেনকে দেখতে পেল ক্যাপটেন। জাম্বোর দক্ষিণে রয়েছে ওগুলো, দু'হাজার ফিট নিচে। শুধু আলোর ফোঁটা দেখা গেল, কিন্তু ওগুলো যে ফাইটার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফোঁটাগুলো ক্রমশ বড় হচ্ছে আকারে। পাশে দাঁড়ানো রানার দিকে

না তাকিয়েই কথা বলল ক্যাপটেন, 'দেখতে পাচ্ছ?'

ককপিটের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল রানা, মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ।'

'কি ওগুলো?' দ্রুত জানতে চাইল আমপালা।

'ফাইটার প্লেন,' বলল রানা। 'তাড়াতাড়ি যাও, মোশে ফেরেলকে নিয়ে এসো।'

'ওগুলো ইসরায়েলি ফাইটার বুঝলে কিভাবে?' নড়ল না আমপালা।

'তাছাড়া আর কারা ফাইটার পাঠাবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'সোনা নিয়ে আর কার মাথা ব্যথা আছে?'

'ঠিক জানো, ওগুলো সৌদি এয়ারফোর্সের ফাইটার নয়?'

'আরে না,' বলল রানা। 'ওদের অত সাহস নেই যে অন্য দেশের ওপর দিয়ে আসবে। ইসরায়েলিরা সব পারে।'

উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে গেল আমপালা। খানিক পরই মোশে ফেরেলকে নিয়ে ফিরল সে। বেশ অনেকক্ষণ আগেই আমপালা তাকে জানিয়েছে কি রকম গাড্ডায় ফেলা হয়েছে তাকে।

তিন মিনিট পর কাছে এসে পড়ল ফাইটারগুলো। সৌদি এয়ারফোর্স পাঠায়নি এগুলোকে, গায়ে ইসরায়েলি এয়ারফোর্সের প্রতীক চিহ্ন আঁকা রয়েছে। বিপজ্জনক রকম কাছে চলে এসেছে ওগুলো, মার্কিং দেখতে কোন অসুবিধা হলো না। জাম্বো জেটকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে তিনটে ফাইটার।

তারপর এক সময় তিনটে ফাইটার একটা ঝাঁক বেঁধে জাম্বোর নাকের সামনে চলে এল। মাঝখানের দূরত্ব এখন সিকি মাইল। হঠাৎ তিনটে ফাইটারই একসাথে ডানা কাত করল, প্রথমে একদিকে, তারপর আরেক দিকে।

'ওরা বলছে, আমাদের পিছু নিয়ে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করো,' বলল রানা।

চোখ বাঁধা মোশে ফেরেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আমপালা, 'ওদের সাথে রেডিওতে কথা বলা যাবে তো?'

'অবশ্যই।' ক্যাপটেন তার রেডিও সেট অন করল। ফাইটার প্লেনগুলোর লীডারের সাথে যোগাযোগ করল সে। তারপর স্পীকারের মাউথপীস হুক থেকে খুলে বাড়িয়ে দিল আমপালার দিকে। সেটা নিয়ে মোশে ফেরেলের মুখের সামনে ধরল আমপালা।

রেডিওতে কি বলতে হবে, আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে মোশে ফেরেলকে। বলা হয়েছে, আদেশ অমান্য করলে দু'হাতের দশটা আঙুল এক এক করে ভাঙা হবে। মাউথপীস হাতে নিয়ে ঝাড়া চার মিনিট লীডার ফাইটারের পাইলটের সাথে কথা বলল ফেরেল। তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ। দেখা গেল, জাম্বোর সামনে থেকে দ্রুত ডান দিক সরে যাচ্ছে ফাইটারগুলো। দেখতে দেখতে তাদের আলো মিলিয়ে গেল অন্ধকার আকাশে।

আনন্দে আহ্লাদে আটখানা হলো আমপালা। একাই হাততালি দিল কিছুক্ষণ। তারপর মোশে ফেরেলকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ককপিট থেকে। যাবার আগে রানাকে বলে গেল, 'সব দিকে ভাল ভাবে খেয়াল রেখো।'

*

আমপালার ঘড়িতে পাঁচটা। ফিরোজার পাশের সীট থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ককপিটে ঢুকে জানালা দিয়ে চাঁদ আর তারা দেখল, তারপর খামচে ধরল ক্যাপটেনের কাঁধ। 'তুমি না বলেছিলে পাঁচটায় আমরা পৌঁছে যাব?'

ক্যাপটেন উত্তেজিত হলো না। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'এখুনি ল্যান্ড করব আমরা। বাতাসের কারণে দু'এক মিনিট দেরি হয়েছে।'

রেডিও ঘর ঘর করে উঠল, '...বি টু-থ্রী-ওয়ান...ইউ আর ক্লীয়ারড টু ডিসেন্ড টু-ফ্লাইট লেভেল টু-ওয়ান-জিরো অন অ্যাপ্রোচ পাথ টু সিসিলি...প্লীজ কল পাসিং টু-ফাইভ-জিরো।'

বিজয়ের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমপালার চেহারা।

'রজার।' ফ্ল্যাপসের অ্যাঙ্গেল বদল করল ক্যাপটেন, পিছিয়ে আনল থ্রটল। বিশাল প্লেন নামতে শুরু করল। আমপালার দিকে একবার তাকাল সে। 'পৌঁছে গেছি। সিসিলি এয়ারপোর্ট। একশো মাইল দূরে রয়েছি আর, পৌঁছতে দশ মিনিট লাগবে। খুশি?'

খুশি তো বটেই, কিন্তু ক্যাপটেনকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না আমপালা।

অলটিমিটারের কাঁটার দিক তাকিয়ে আছে ক্যাপটেন, দ্রুত নামছে সেটা। পঁচিশ হাজার ফিটের ঘর পেরিয়ে এল কাঁটা, আবার রেডিওতে কথা বলল সে, 'বি-টু-থ্রী-ওয়ান...পাসিং ফ্লাইট লেভেল টু-ফাইভ-জিরো...আউট।'

'তোমার ওপর দায়িত্ব থাকল, খালেদ,' বলে ককপিট থেকে বেরিয়ে এল আমপালা। সোজা ফিরোজার পাশের সীটে এসে বসল সে। সীটের ওপর পা তুলে দিয়ে বিড়ালের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে ফিরোজা। ঘুমাচ্ছে। তার জ্যাকেটের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে দিল আমপালা।

ধড়মড় করে উঠে বসল ফিরোজা।

'কাছে এসো,' বলে দু'হাতে ধরে ফিরোজাকে নিজের কোলে তুলে নিল আমপালা। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে, কি করবে ভেবে না পেয়ে মূর্তির মত বসে থাকল ফিরোজা। তার গালে গাল ঘষতে শুরু করল আমপালা। 'আর মাত্র ক'মিনিট ফিরোজা, আর মাত্র ক'মিনিট।' তাকে দু'হাত দিয়ে সজোরে আলিঙ্গন করল সে।

'আমার...আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে...' ককিয়ে উঠল ফিরোজা।

'খালেদ আমার শত্রু, তুমি জানো, তবু ওর সাথে এত মাখামাখি কেন তোমার?' খোঁচা খোঁচা দাড়ি দিয়ে ফিরোজার নরম গাল ঘষছে আমপালা। 'জানি, আমি তোমাকে সব কিছু দিতে পারি না। বুঝি, পুরুষ মানুষের সাথে মিশতে ইচ্ছে করে তোমার। কাজটা এতদিন অন্যায় হয়েছে আমার, তোমার শরীরের চাহিদার কথা আমার ভাবা উচিত ছিল। এখন থেকে আর সে সমস্যা থাকবে না। কথা দিচ্ছি। তবে, তারা হবে আমার লোক, আমি বেছে দেব। যাদের সাথে মিশলে আমার কোন আপত্তি নেই। আরেকটা কথা। যার সাথেই মিশতে দিই, তুমি আমার ছিলে, আমার আছ, আমারই থাকবে। কারও সাথে পালাবে, সেটি আমি

হতে দেব না। মনে আছে, তোমাকে আমি চল্লিশ হাজার ডলার দিয়ে কিনেছিলাম? এখন তোমার দাম চল্লিশ লাখ ডলার···না, আরও বেশি, আরও অনেক বেশি···'

এই অত্যাচার থেকে বাঁচার একটাই উপায়, সেটাই ব্যবহার করল ফিরোজা। বলল, 'তোমার ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে, আমপালা। তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব আমি, বলো? যদি সে চেষ্টা কখনও ভুল করে করি, আমাকে তুমি সামলে রেখো। আমপালা, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

খুশি মনে ককপিটে ফিরে এল আমপালা। নেমে এসেছে প্লেন, মাটি থেকে আর মাত্র বারো হাজার ফিট ওপরে রয়েছে ওরা। জানালা দিয়ে শুধু মেঘ দেখা গেল।

আরও কয়েক মিনিট কাটল। মেঘের ভেতর থেকে নেমে এল প্লেন। শহরের নিওনসাইন ঝলমল করে উঠল ওদের নিচে।

'গিয়ার ডাউন,' নেভিগেটরকে বলল ক্যাপটেন।

'গিয়ার ইজ কামিং ডাউন।'

একটা ঝাঁকি খেল প্লেন। খোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে আন্ডারক্যারিজ।

'স্ট্যান্ড বাই ফর ফ্ল্যাপস।' একটা বোতামে চাপ দিল ক্যাপটেন, কেবিন ওয়ার্নিং লাইট জ্বলে উঠল। আমপালাকে বলল, 'তোমার সঙ্গীদের বলো সবাই যেন বেল্ট বেঁধে নেয়।'

চার মিনিট পর ল্যান্ড করল ওরা। নিখুঁত ল্যান্ডিং।

টার্মিনাল বিল্ডিঙ থেকে বেশ খানিকটা দূরে, কিন্তু সরাসরি সামনে থামল জাম্বো। বড় বড় হরফে বিল্ডিঙের মাথায় লেখা রয়েছে—সিসিলি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। তলপেটের ভেতর অদ্ভুত একটা ফাঁকা ফাঁকা অনুভূতি হলো রানার। বিপদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাই জানে, কি আছে আমপালার মনে।

টারমাকে প্রচুর লোকজন দেখা গেল। বেশির ভাগই পুলিস আর সৈনিক। কিন্তু জাম্বোর কাছ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, টার্মিনাল ভবনের কাছাকাছি। খুঁটিয়ে দেখতে হলো না আমপালাকে, একবার নজর বুলাতেই সিসিলি সিকিউরিটি পুলিসের ইউনিফর্ম চিনতে পারল।

ককপিট থেকে বেরিয়ে এল সে। এই প্রথম রানাকে কিছু বলল না।

আমপালার পিছু পিছু ককপিট থেকে বেরিয়ে এল রানাও। আরেকটু হলে স্টুয়ার্ডের সাথে ধাক্কা খেত সে। মোশে ফেরেলকে কফি পরিবেশন করে ককপিটের দিকে যাচ্ছে লোকটা।

প্লেনের দরজার দিকে এগোল রানা, আমপালাকে পাশ কাটাল।

'খালেদ।' পিছু ডাকল আমপালা। 'কোথায় চললে?'

'নিচে,' বলল রানা, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, আমপালার হাতের মেশিন-পিস্তলটা ওর বুক লক্ষ্য করে ধরা।

'মানে?' যেন আকাশ থেকে পড়ল ও।

'মানে প্লেন থেকে তোমরা—তুমি, স্না'দুল্লা, মোশে ফেরেল আর ক্রুরা কেউ নামতে পারবে না।'

'কি বলছ তুমি!' চারদিকে তাকাল রানা। আমপালার লোকেরা সবাই সীট

ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, হাতের অস্ত্র রানার দিকে তাক করা।

নির্মল, পবিত্র হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমপালার চেহারা। 'একটু সময় দাও, প্লীজ। সব ব্যাখ্যা করছি। পিয়ানো, কাজ শুরু করে দাও। আমি আছি, আর একজন থাকুক, বাকি সবাইকে সোনা খালাসের কাজে লাগাও। তারপর তুমি নেমে যাও, আমার কন্ট্যাক্টের সাথে দেখা করো, বলো, একটু পরেই আসছি আমি।'

আগে থেকেই বলা ছিল সব, আমপালার লোকেরা কাজ শুরু করে দিল। ইতোমধ্যে সিঁড়ি নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্যানভাস ব্যাগ চেইন ধরে নেমে যেতে শুরু করল। খানিক পর চলে গেল পিয়ানো, আমপালার কন্ট্যাক্টের সাথে কথা বলবে।

প্লেনের পিছন থেকে বেরিয়ে এল সা'দুল্লা, অস্ত্রের মুখে তাকেও রানার পাশে দাঁড় করাল আমপালা। কেবিনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, সেই যে ঢুকেছে স্টুয়ার্ড, আর বেরুচ্ছে না।

আমপালার ইঙ্গিতে তার সঙ্গী এগিয়ে এসে নিরস্ত্র করল ওদের দু'জনকে। একটা সীটে বসল আমপালা, মুখে হাসি ধরে না। সিগার ধরাল সে। তারপর শুরু করল, 'আসল কথা, খালেদ, ভাগাভাগির মধ্যে আমি কখনও ছিলাম না, কোনদিন থাকবও না। যা খাই, একাই খাই, কাউকে বখরা দিই না। তুমি বোকা, জানতাম, কিন্তু এতটা বোকা তো জানতাম না। সিসিলিতে একবার পৌঁছুতে পারলে আমি যে কাউকে ভাগ দেব না, এটা তোমার মত জিনিয়াসের বুঝতে পারা উচিত ছিল।'

ওদের কাছ থেকে দশ হাত দূরে একটা সীটে একা বসে আছে ফিরোজা, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। রানা কিন্তু ভুলেও সেদিকে তাকাল না।

'তবে একথা ঠিক, তোমার পরিকল্পনা ছাড়া এত বড় একটা কাজ সারতে পারতাম না,' আবার বলল আমপালা, কথা বলতে ভাল লাগছে তার, দারুণ উপভোগ করছে। 'স্বীকার করি, তোমার তুলনা হয় না। বাড়ির কাছে একশো টন সোনা রয়েছে, জানতামই তো না। সেজন্যেই, বুঝলে, তোমাকে প্রাণে মারছি না।'

'ধন্যবাদ,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। কালো হয়ে গেছে মুখ।

'সোনা খালাসের কাজ শেষ হলেই,' বলল আমপালা। 'আমরা সবাই নেমে যাব।' নিজের লোকদের দিকে তাকাল সে। দ্রুত কাজ করছে তারা। 'তোমাদেরকে নিয়ে আবার আকাশে উঠবে প্লেন। যেখানে খুশি যেতে পারবে তোমরা। কি জানো, তোমার প্রতি আমি বেশ অনেকটা কৃতজ্ঞ, কারণটা তো আগেই বললাম। তাই সিসিলিতে তোমাদেরকে নামাতে চাই না। নামালে পুলিস তোমাকে গ্রেফতার করবে, টরচার করবে, বলা যায় না, ইংল্যান্ডের চাপের মুখে লন্ডনে ফেরতও পাঠাতে পারে। তোমার ওপর এত অত্যাচার আমার সহ্য হবে না। তাই মুক্ত করে দিলাম তোমাকে, যেখানে খুশি চলে যাও তুমি। আমিও সোনা নিয়ে চলে যাই যেখানে খুশি।'

'তুমি কি আশা করছ, আমি হাততালি দেব?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি এইভাবে বিশ্বাস…'

'প্রাণে বেঁচে যাচ্ছ, সেটাকে ছোট করে দেখো না, খালেদ।'

ককপিট থেকে হাসি মুখে বেরিয়ে এল স্টুয়ার্ড। তার ইউনিফর্মের ভেতর আরও একজন লোক অনায়াসে ঢুকে যাবে। সরাসরি আমপালার সামনে থামল সে, জানতে চাইল, 'কফি, স্যার?'

'না।'

ফিরোজার দিকে এগোল স্টুয়ার্ড।

হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল সা'দুল্লা, প্রচণ্ড রাগে হাত ছুঁড়ল বাতাসে। 'সবকিছুর জন্যে তুমিই দায়ী, খালেদ! আমি আগেই বলেছিলাম…আমি জানতাম…তোমার বোকামির জন্যেই এমনটা হলো। একশো টন সোনা, গেল তো!'

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা, চোখ বুজল, বলল, 'কে জানত আমপালা আমাদের সাথে বেঈমানী করবে।'

'ছি ছি, এ-কথা বোলো না, খালেদ,' অভিমানের সুরে প্রতিবাদ জানাল আমপালা। 'একে তুমি বেঈমানী বলতে পারো না, আমি ঠকতে চাইনি, ব্যস।'

কথা বলতে বলতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেল, সোনা খালাসের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। 'এত দেরি করছে কেন পিয়ানো?' বলে সীট ছাড়ল আমপালা। মেশিনগানধারী লোকটাকে পাহারায় রেখে জানালার সামনে ঝুঁকে পড়ল সে। দেখল, তার লোকেরা প্লেন থেকে নামিয়ে কাছাকাছিই এক জায়গায় জড়ো করছে ব্যাগগুলো। সৈনিক আর পুলিসরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। পিয়ানোকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভাবল, নিশ্চয়ই টার্মিনাল বিল্ডিঙের ভেতর কন্ট্যাক্টের সাথে খোশগল্প করছে ও। ফিরোজাকে পিছু নিতে ইশারা করে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে সে।

'এক মিনিট, আমপালা,' পিছন থেকে ডাকল রানা।

'আবার কি?' ঘুরে দাঁড়াল আমপালা। ফিরোজা তার সীট থেকে নড়েনি।

'তোমার এই বেঈমানী আমি কিন্তু ভুলব না,' বলল রানা। 'শোধ নেব। দেখো, এজন্যে পস্তাতে হবে তোমার।'

'অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ! প্রাণে বাঁচিয়ে দিলাম সেজন্যে ধন্যবাদ দেবে, তা না…' নিজের পথে রওনা হলো সে।

আবার পিছু ডাকা হলো তাকে। এইমাত্র রেডিওতে কথা বলে ককপিটের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে ক্যাপটেন। 'এই যে, শুনছেন?' আবার ঘুরল আমপালা। 'কার হুকুমে ককপিট থেকে বেরিয়েছ তুমি?' জানতে চাইল সে।

'রি-ফুয়েলিং দরকার,' জবাব না দিয়ে বলল ক্যাপটেন। 'আর জানতে চাই, এরপর কোথায় যাব আমরা?'

'ফুয়েল যা আছে তাতে আরও এক ঘণ্টা উড়বে প্লেন,' বলল আমপালা। 'কোথায় যাবে? এক ঘণ্টার মধ্যে যে জাহান্নামে যাওয়া যায়।' প্রচণ্ড আক্রোশের সাথে ফিরোজার দিকে ফিরল সে। 'এখনও বসে আছ কি মনে করে?'

'তুমি চলে গেলে গার্ড একা হয়ে যাবে না?' হাতের পিস্তলটা দেখাল ফিরোজা। 'তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমিও ওদেরকে পাহারা দিই।'

আর মাত্র কয়েকটা ব্যাগ, তারপরই সোনা খালাসের কাজ শেষ হয়ে যাবে। 'ঠিক আছে, একসাথেই নামি চলো।'

সাত মিনিট পর আবার সিঁড়ির দিকে এগোল আমপালা। একবারও পিছন দিকে না ফিরে প্লেন থেকে বেরিয়ে গেল সে। তাকে অনুসরণ করল গার্ড। অন্যান্য লোকেরা আগেই শেষ ব্যাগটা নিয়ে নেমে গেছে। গার্ডের পিছু নিল ফিরোজা, অনেকটা পিছনে রয়েছে সে।

গার্ড সিঁড়িতে পৌঁছে গেছে, রানাকে পাশ কাটাল ফিরোজা। 'সিঁড়ির সব ক'টা ধাপ নেমো না,' নিচু গলায় বলল রানা। 'ফিরে এসো।'

'ডেঁড়িয়ে আচেন কেন, স্যার, বসুন না?' ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাপটেনকে বলল স্টুয়ার্ড।

ভুরু কুঁচকে স্টুয়ার্ডের দিকে তাকাল ফিরোজা, তারপর ফিরল রানার দিকে। 'খালেদ, এটা কি ভাষা?'

'বাংলা,' বলল রানা, ক্যাপটেনের দিকে তাকাল, 'সলিল, দরজাটা বন্ধ করে দে।' ফিরোজার দিকে তাকাল ও। 'তোমার নামারই দরকার নেই। এসো, মজা দেখে যাও।' বলে জানালার দিকে ফিরল ও, নিচে টারমাকের দিকে তাকাল।

বন্ধ হয়ে গেল প্লেনের দরজা। সবাই ভিড় করল জানালায়।

সিঁড়ি বেয়ে লাইন দিয়ে নেমে যাচ্ছে লোকগুলো। তাদের পিছনে আমপালা, সবশেষে তার আরও একজন সশস্ত্র সঙ্গী। টারমাকে নেমে এদিক ওদিক তাকাল আমপালা। তারপর সৈনিক আর পুলিসদের পাঁচিল লক্ষ্য করে একাই এগোল দ্রুত। মাঝখানের দূরত্ব অর্ধেকও পেরোয়নি আমপালা, হাঁটার গতি মন্থর হয়ে এল। এই প্রথম তার সন্দেহ জাগল। স্পট লাইটের আলোয় বড় বেশি উজ্জ্বল এয়ারপোর্ট সাইন—বড় বড় হরফের রঙ এতই তাজা আর কাঁচা যে কয়েকটা অক্ষরের নিচের অংশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রঙ বোর্ডের গা বেয়ে সড়সড় করে নামছে। টনক নড়তে লাগল। সাফল্যের আনন্দ পরিণত হচ্ছে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নে। একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পাঁচ সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল, তারপর মুঠো করা হাত বাতাসে ছুঁড়তে শুরু করে উন্মাদের মত নাচতে লাগল। তার চিৎকার প্লেন থেকে পরিষ্কার শুনতে পেল ওরা, 'ফাঁকি! ফাঁকি! সিসিলি নয়! আমাকে ফাঁকি দিয়েছে কুত্তার বাচ্চারা! সিসিলি নয়, রিয়াদ!' মেশিনগানটা কাঁধ থেকে নামাতে গেল সে, কিন্তু সৈনিক আর পুলিসের পাঁচিল ইতোমধ্যে কাছে চলে এসেছে।

গুরুগম্ভীর আদেশ এল অ্যামপ্লিফায়ারে, 'হল্ট! অস্ত্র ফেলে দিয়ে সারেন্ডার করো!' কিন্তু কেউ আদেশ মানল না দেখে হঠাৎ পাঁচিলটা পড়ে গেল। শুয়েই গুলি শুরু করল ওরা।

আমপালার তিনজন লোক মারা পড়ল গুলি খেয়ে। বাকিরা সবাই অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করল। দেড় মিনিটের মধ্যে হাতকড়া পরানোর কাজ শেষ হলো। আমপালা সামান্য আহত হয়েছে মাত্র, তার কোমরে রশি দিয়ে তোলা হলো প্রিজন ভ্যানে। তখনও সে চিৎকার করছে, 'ফাঁকি, ফাঁকি! ফিরোজা···ফিরোজা কোথায়!' একশো টন সোনা হাতছাড়া হওয়ার সত্যি যদি তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে,

তাহলে এক অর্থে প্রাণে বেঁচে গেল সে। কারণ সুস্থ বলে প্রমাণিত হলে ইসরায়েলের প্রচলিত আইনে এ অপরাধের জন্য তার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কথা।

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে সিধে হলো ক্যাপটেন সলিল সেন, একটা হাত চোঙের মত করে মুখের সামনে ধরল, তারপর স্লোগান দিল, 'থ্রী চিয়ার্স ফর মাসুদ রানা···।' ককপিটের ভেতর থেকে ক্রুরা গগন বিদারী গর্জন তুলল, 'হিপ হিপ হুররে।'

গিলটি মিয়ার দিকে তাকাল রানা, 'কিছু পেয়েছ?'

'ডিনামেট, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া। 'দু'খানে। ফেটিয়ে দিয়ে মারতে চেয়েছিল। তার কেটে লিয়েচি।'

'মাসুদ রানা?' বড় বড় চোখ করে রানার দিকে তাকিয়ে আছে ফিরোজা। 'আমি তো এসবের কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমি সৌদি ইন্টেলিজেন্সের একজন সিক্রেট এজেন্ট,' মুখ হাঁড়ি করে বলল সা'দুল্লা, 'প্লেনটা যে আমারই দেশে, রিয়াদে পৌচেছে আমাকেও তা বলা হয়নি।'

'এই যা, ভুলে গেছি!' দাঁত দিয়ে জিভ কাটল সলিল, 'রানা, লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাঈফ আল-ইসলাম রেডিওতে রয়েছেন, তোর সাথে কথা বলতে চান। উত্তেজনায় একেবারে ফেটে পড়ছেন ভদ্রলোক।'

ঝট করে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, 'আগে বলবি তো!' দ্রুত ককপিটের দিকে এগোল ও, দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরোজার দিকে তাকাল, বলল, 'কিছু জানতে চাইলে ওকে ধরো, ও সব জানে।' ককপিটের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

'ওর নাম খালেদ নয়?' সলিলকে জিজ্ঞেস করল ফিরোজা।

'ও মাসুদ রানা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সেরা রত্নদের একজন,' বলল সলিল।

'মাসুদ রানা, মাসুদ রানা···' নামটা বারবার উচ্চারণ করছে ফিরোজা, যেন মুখস্থ করে নিচ্ছে। 'আর আপনি?'

নিজের আর গিলটি মিয়ার পরিচয় দিল সলিল, বলল, 'খালেদের পরিচয় নিয়ে রানা লন্ডনে আসার পর থেকেই ওর সাথে আছি আমরা, কারও চোখে ধরা পড়িনি, এই যা।'

'সব কথা ব্যাখ্যা করে বলবেন, প্লীজ? সিসিলিতে যাওয়ার কথা আমাদের, রিয়াদে এলাম কিভাবে?'

'দু'তিন জায়গায় টেলিফোন করে সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল রানা।' শুরু করল সলিল। 'ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের রানা জানাল, ডাকাত দলে তার নিজের কিছু লোক আছে, তাদের নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে চায় সে, সোনা নিয়ে সোজা চলে যেতে চায় তেল আবিব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে, যদি তাদের প্রত্যেককে মোটা টাকা পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। টোপটা বিনা দ্বিধায় গিলল ব্রিটিশরা। ইসরায়েলি দূতাবাসে ফোন করল রানা, প্রত্যেককে এক লাখ ডলার পুরস্কার দিতে রাজি হলো তারা, বলল, তেল আবিব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টকে

সিসিলি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মত করে সাজানো কোন সমস্যাই নয়।'

বোকা বোকা দেখাল ফিরোজাকে। 'কিন্তু আমরা তো এসেছি রিয়াদে...?'

'ব্রিটিশরা যাতে সহযোগিতা করে সেজন্যেই টোপ হিসেবে প্রস্তাবটা দিয়েছিল রানা,' বলল সলিল। 'তার আগেই সৌদি দূতাবাসের সাথে কথা বলে ও। সৌদিদের জন্যে ব্যাপারটা তেমন কঠিন হয়নি, শুধু এয়ারপোর্টটাকে আধ ঘণ্টার জন্যে সিসিলি ইন্টারন্যাশনালের মত করে সাজাতে হয়েছে, সিসিলি সিকিউরিটি পুলিসের কিছু ইউনিফর্ম বানাতে হয়েছে আর ফাইটার তিনটের মার্কিং বদলাতে হয়েছে।'

'তার মানে? ফাইটারগুলো...?'

'ইসরায়েলি এয়ারফোর্সের ছিল না, ছিল সৌদি এয়ারফোর্সের। গোটা ব্যাপারটাই আমাদের নিরাপত্তার জন্যে করা হয়েছিল।'

'কিন্তু পাইলট হিসেবে আপনি কিভাবে...?'

'শুধু আমি একা নই,' বলল সলিল, 'ক্রুদের সবাই আমরা বাংলাদেশী। হিথরো থেকে রানাকে বলা হয়েছিল, পেশাদার পাইলটরা কেউ তোমাদেরকে নিয়ে যেতে রাজি হচ্ছে না। রানা তখন বলল, ভলানটিয়ার চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করো। তাই করল ওরা। ভলানটিয়ারদের তালিকা থেকে আমাদেরকে বেছে নিয়েছে রানা। আমার সাথে যোগাযোগ করে আগেই ব্রিফিং করে রেখেছিল ও।'

'কফি, না চা লেবেন?' ঘুরে ঘুরে সবাইকে এই একই প্রশ্ন করছে গিলটি মিয়া। 'ডেঁড়িয়ে কেন, একটা সীট লিয়ে বসে পড়ুন না।'

'এখন এই প্লেন নিয়ে কি করব আমরা?' প্রশ্নটা এল এবার সা'দুল্লার কাছ থেকে। 'ব্রিটিশ সরকার সোনা ফেরত চাইলেই বা কি বলা হবে?'

'কিছু উত্তম-মধ্যম দেয়ার জন্যে আমপালাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে,' বলল সলিল। 'খানিকক্ষণের মধ্যে আবার এই প্লেনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে তাকে। ইসরায়েলি কিছু বন্দী গুপ্তচর আছে রিয়াদে, তাদের কেউ কেউ প্লেন চালাতে জানে। তারাই মোশে ফেরেল, আমপালা আর তার লোকদের নিয়ে তেল আবিব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যাবে। ব্রিটিশ সরকারকে তোমরা বলবে, প্লেনে এক ছটাক সোনাও তোমরা পাওনি। সোনা ডাকাতি হয়েছে, এই ব্যাপারটা গোপন রেখেছে ওরা। কাজেই তোমাদের কথা বিশ্বাস না করলেও, হৈ চৈ করতে পারবে না। তাছাড়া, কোন্ যুক্তিতে করবে? সোনাটা তো তোমাদেরই, ওরা জানে।'

'অনেক প্যাঁচ!' বলে উঠল ফিরোজা।

ককপিট থেকে বেরিয়ে এল রানা। 'হোটেল হিলটনে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের। ফিরোজা, তোমার ব্যাপারে কি স্থির হয়েছে, সলিল বলেছে?'

'আমার ব্যাপারে...না তো!'

'সৌদি সরকার তোমার সহযোগিতার জন্যে তোমাকে একলাখ ডলার পুরস্কার দেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে,' বলল রানা। 'তোমার মাকে ক্যাম্প থেকে আনাবার ব্যবস্থা আমিই করব। তারপর ইউরোপের যে-কোন শহরে, বা আমেরিকায়, যেখানে খুশি মা-বেটিতে থাকতে পারবে। অবশ্য আরেকটা প্রস্তাব

আছে আমার…' ফিরোজার মত মেয়েকে রানা এজেন্সীতে দরকার।

'কি প্রস্তাব?' সাগ্রহে জানতে চাইল ফিরোজা।

'সেটা পরে একসময় বলব,' গম্ভীর দেখাল রানাকে।

'আমাকে এক লাখ ডলার দিল, আর তোমাদের?' জানতে চাইল ফিরোজা। 'এত বিপদ মাথায় নিয়ে…'

'আমরা কর্তব্য পালন করেছি…অফিশিয়াল ডিউটি।' হাসল রানা, 'মাস গেলে বেতন পাব। চলো, এইবার নেমে পড়া যাক।'